মৌমাছিতন্ত্র

আকন্দদাস

সাহিত্যং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

ছাগল-তাড়ানো বৃষ্টি নামলেই আমার স্বপ্নগুলি ভ্যা ভ্যা করে দৌড় মারে। আমি কী হতে পারতুম? নেপোলিয়ন হলে চলে যেতুম দক্ষিণ ফ্রান্সের দ্রাক্ষাকুঞ্জে, সেখানে রৌদ্রস্নান করতুম জোসেফাইনের সঙ্গে। গামা হলে বাস করতুম মার্কিন মুল্লুকে, ফাইটিং এরেনায় মহম্মদ আলীর সঙ্গে লড়তে লড়তে দৃষ্টিবিনিময় করতুম হাজার ডলার ছাড়পত্রধারিণীদের সঙ্গে। হ্যাঁ, ওদেশের মেয়েরা সত্যিকারের মরদের কদর বোঝে, আমাদের দেশের সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাদের মতো অঞ্চলধারীদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ বর্ষণ করে না। যদি আমি সাংবাদিক হতুম তবে দিবসে মালিকের পিতার প্রশস্তি ও রজনীতে বাদশা-জাদীর কেচ্ছা লিখে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিতুম। এবং মোটরে চড়ে পার্ক স্ট্রীটের কোনো বার-কাম-রেস্তোরাঁর নীলাভ আলোয় ঝিমোতে ঝিমোতে ড্রু পিয়ার্সনের মতো হোয়াইট হাউসে কোনো সিঁধেল চুরির নিউজ স্কুপ করতুম। আর অধ্যাপক হলে? পনের মিনিট পরে ক্লাসে যেতুম, রোল করতুম দশ মিনিট ধরে এবং তারপর রংপুর কলেজের জগদীশবাবুর মতো 'আইজ আর হয় না' বলে বেরিয়ে আসতুম। যদি নাছোড়বান্দা কোনো ছাত্র থাকতো তবে রেকর্ডে পিন্ লাগিয়ে মিনিট পনের বক্‌বকম্ শুনিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে বেরিয়ে এসে অধ্যক্ষ বা উপাচার্যের ঘরে ঢুকে পড়তুম। দেখুন তিনি, কতটা খেটে মরছি! তাঁর প্রতি কথায় প্রচুর বেগ ও প্রচুরতর আবেগসহযোগে সায় দিয়ে অনতিবিলম্বে বেরিয়ে আসতুম। বাড়িতে ততক্ষণে জন পঁচিশেক ছাপোষা জীব পরীক্ষা-বৈতরণী পার হবার আশায় হাঁ করে বসে আছে। এইভাবে সার্থক শিক্ষাব্রত উদ্‌যাপন করে যখন রিটায়ার করতুম তখন নিজের বাড়িতে স্বোপার্জিত খাটে শুয়ে শুয়ে টি. ভি. দেখতুম—উপুড় হয়ে খাতা দেখার খেসারত হিসেবে পাওয়া স্পণ্ডিলাইটিসের ব্যথাটাও তখন কম বলে মনে হতো। নিদেনপক্ষে চম্বলের সুন্দর সিং কি হতে পারতুম না? আঃ, ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগছে, আমি তাহলে এই ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টিতে সানফ্রানসিস্‌কোর সান্‌সেট্ ডিস্ট্রিক্টে কোনো বেজমেন্ট হোটেলে বসে লাঞ্চ সারতুম প্যাট্রিসিয়া হার্স্টের সঙ্গে।

অর্থাৎ সব কিছুতেই ভ্যানগার্ড হতে পারতুম। কিন্তু পোড়া কপাল আমার, হলুম শুধু হাজব্যাণ্ড ও ভ্যাগাবণ্ড। কাশীদাসের পৌত্র মুকুন্দদাসের পুত্র আকন্দদাস। আগের কথা আগে বলি, পরের কথা পরে। বলহরি

আচার্য ঠিকুজি করতে গিয়ে পেলেন, নামের আদ্য অক্ষর 'আ'। তিনি 'আনন্দ' রাখতে পারতেন, কিন্তু বাবার নামের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে রাখলেন 'আকন্দ'। আমার সেই ঠিকুজির নামটাই শেষ পর্যন্ত হয়ে গেলো আসল নাম। আমার জীবনের সর্বনাশের সেদিন থেকে শুরু। শূর্পণখার নাক কেটে যেমন লক্ষ্মণ লঙ্কাকাণ্ডের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তেমনি সাদা কাগজে অক্ষর কেটে কেটে আকন্দের চিতাগ্নি জ্বালিয়ে রেখে গেলেন বলহরি আচার্য। রবীন্দ্রনাথ খ্যাতির বিড়ম্বনার কথা লিখেছেন, কিন্তু লেখেননি কেন নামের বিড়ম্বনার কথা? একদিনের কটূক্তি পাড়ার দুই পার্টির কেডারদের রক্তারক্তির মতোই আজও মনে ন্যাপাম্ বোমা ছুঁড়ে দেয়। ভরদুপুরে পেয়ারা খেতে গিয়ে সুন্দর ঠাকুরমার কাছে ধরা পড়ে গেলুম; দ্বিতীয় পক্ষ যে শুধু পাতে বসে খায় না, সে যে তৃতীয় পক্ষের মতো কাঁধে চড়েও বেড়ায় সেদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলুম। সুন্দর ঠাকুর্দা কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বিরক্ত হয়ে বললেন, চেঁচাচ্ছ কেন?

দ্বিতীয় পক্ষ হুংকার ছাড়লেন: চোর ধরেছি।

—কে?

—মুকুন্দের ছেলে আকন্দ।

সুন্দর ঠাকুর্দার বোধহয় আবার নিদ্রাকর্ষণ হয়েছিলো। তিনি জড়ানো কণ্ঠে বললেন: আকন্দ? তোমার শিবপুজোর জন্য রেখে দাও।

সুন্দর ঠাকুরমা অরক্ষণীয়ার 'পোড়াকাঠের' মতো দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলেন: হ্যাঁ, রেখে দিচ্ছি তোমার ছেরান্দের জন্য। রক্তচোষা মাকড়শার তিলে জলডুমুরের কাঠ আর আকন্দের বাসি জঞ্জাল ছাড়া আর কী কাজে লাগ্‌বে শুনি?

বলেই আমার পিঠে দমাদম কিল মারতে লাগলেন। রাগে ফুলে-ওঠা কণ্ঠনালী থেকে মাঝে মাঝে গর্জন উঠতে লাগলো: যেমন নাম, তেমনি চরিত্র! অপদার্থ কোথাকার!

সুন্দর ঠাকুর্দার প্রতি তিনি যে কান্তাজনোচিত মধুবর্ষণ করেছিলেন তার মানে বুঝবার বয়স তখনও আমার হয়নি। পরে বুঝেছিলুম। সুন্দর ঠাকুর্দা তিনটি কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। মাসারম্ভে উকিলদাদার মনি-অর্ডার রিসিভ করা, দিবানিদ্রায় বিশ্রাম নেওয়া এবং বৎসরান্তে একটি সন্তানের জনক হওয়া। এই তিনটি কর্তব্যে তিনি কখনও অবহেলা করেছেন, এমন অপবাদ তাঁর পরম শত্রুও দিতে পারবেন না। কিন্তু এহো বাহ্য। কবিগুরুর ভাগ্য ছিলো ভালো, তিনি নব-নিদাঘে সুখালসা পসারিণীর নাম জপ করতে করতে শুভ্রফেননিভ শয্যা পাতার স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমার কৈশোর-জীবনের তপ্ত মধ্যাহ্নে আকন্দ নামের মালা পরে 'অপদার্থ' মন্ত্র জপ করতে করতে ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন আমি দেখেছিলুম,

তাতে এমন কি কোনো 'শিখরিদশনা'ও ধরা দেননি। তারপর থেকে স্বর্গের --না, না—নরকের সিঁড়ি বেয়ে আমি ধাপে ধাপে নিচে নামতে লাগলুম। আকন্দ শব্দটির সঙ্গে গন্ধবর্ণহীন বৃক্ষজন্মের নিষ্ফলতার অভিশাপ চিরদিনের জন্য জড়িয়ে গেলো।

আমাদের গ্রামের স্বামী ভূমানন্দ সাধু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে অনেকে সাধুজী বলে ডাকতেন। তাই আকন্দ নামটিকে পঙ্ক থেকে উদ্ধার করবার ইচ্ছায় পূর্বভাগে সাধু শব্দ একদিন ব্যবহার করতে শুরু করে দিলুম। চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে যদি জগাই-মাধাই উদ্ধার পেয়ে থাকেন, তবে সাধু শব্দের সান্নিধ্যে অপদার্থ আকন্দ উদ্ধার পাবে না? তাছাড়া, একটা গোপন বাসনা পোষণ করতুম। যত নিষ্কর্মাই হই না কেন, মন্ত্রী হতে তো কোনো বাধা নেই। তার জন্য পবিত্র কন্‌স্টিটিউশানে নির্দিষ্ট কোয়ালিফিকেশানের কোনো ধারা নেই। মন্ত্রী হলে নামের আদ্যভাগের সাধু শব্দটি কাজে লাগবে। সাধুর সততা দ্রৌপদীর শাড়ির মতোই অফুরন্ত। আর যদি নির্বাচনে হেরে যাই, তবে সাধু আকন্দদাস বাবাজী নাম নিয়ে আশ্রম খুলবো। আমাদের দেশে আর যারই অভাব থাক আশ্রমের শিষ্যা, বিয়ের কনে আর ডিমপাড়নেওয়ালী মশার কোনো অভাব নেই।

কিন্তু তাতেও বাদ সাধলেন রবীন্দ্রনাথ। জীবিত অবস্থায় নয়, মৃত অবস্থায়। অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে আনন্দ-নিলয়ে গিয়েছি। দেখলুম, সেখানে চার শ্রেণীর লোক থাকেন—কবিপ্রিয়, শান্তিপ্রিয়, সুপ্রিয় ও আত্মপ্রিয়। কবিপ্রিয়রা এক-পায়ে দাঁড়িয়ে-থাকা তালগাছের মতো—সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাঁরা কবিগুরুকে দেখেছেন—তিনি কখন উঠতেন, কখন বসতেন, কখন খেতেন, কখন ঘুমুতেন, কখন লিখতেন সব তাঁদের নখ-দর্পণে। তাঁরা শুক্তির মতো কবি-ঐতিহ্যের মুক্তো নিজেদের খোলসের মধ্যে ধরে আছেন। তাঁদের ব্যক্তিত্বের সমুন্নত শিখরে ঘোড়েল গিরগিটি ছাড়া আর কারও পক্ষে আরোহণ করা কঠিন। শান্তিপ্রিয়রা একদা জাঁদরেল কর্মকাণ্ডে জেনারেল ছিলেন—এখন অবসর নিয়ে কাঁকর-বিছানো রাঙামাটিতে 'কুঁড়েঘর' বানিয়ে বসবাস করছেন। এঁরা মেলামেশা করেন কম, কথা বলেন আরও কম, নির্জনে থাকতে ভালোবাসেন। 'এখন আনন্দ-নিলয়ে থাকি' একথা বলার মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক আরাম আছে বলে এবং বোধহয় কবিগুরুর মতো দীর্ঘজীবী হবার আশায় তাঁরা কলকাতা ছেড়ে বীরভূমের রুক্ষ মাটিতে ডেরা বেঁধেছেন। শান্তিপ্রিয়রা বায়ুভুক্‌ মাত্র। সকাল-বিকেল নির্বাক হাঁটেন এবং মুক্তবায়ু সেবন করেন। এঁরা হাল আমলের শালবীথি—অন্তেবাসী, যখন তখন যে-কেউ তাঁদের পত্রচ্ছায়ায় হুট করে ঢুকে পড়ুক—এ তাঁরা পছন্দ করেন না। পথে-ঘাটে নিঃশব্দ হাস্যবিনিময় চলতে পারে, কিন্তু তার বেশি নৈব নৈব চ। সুপ্রিয়রা ষড়ানন মণ্ডলের পরিপাটি বাগানের ল্যাংড়া আমের গাছ।

ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে ; কাঁচা আম খেতে চান—খান, পাকা পাড়তে চান—পাড়ুন। কোনো বাধা নেই, প্রতিরোধ নেই, সহিংস সংগ্রাম নেই। এঁদের বিদ্যাসাগরী চটি, কোঁচানো ধুতি, ঢোলা পাঞ্জাবি, স্মিত হাসি কখনও মলিন হয় না। নিন্দুক দুনিয়ার প্রতি এঁদের একমাত্র বাণী—'ক্ষম ক্ষেমংকরে'। এঁরা গুরুদেবকে দেখেননি, কিন্তু পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনার মতো তাঁর ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছেন। আর আছেন আত্মপ্রিয়র দল—তাঁরা পোস্ট-ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স সেণ্ট্রাল রিক্রুট। তাঁদের কারও এক হাজার পেপার, কারও চল্লিশ জন রিসার্চ স্কলার, কারও খান তিরিশেক সারগর্ভ পুঁথি। এঁদের স্বাস্থ্য যত ক্ষীণ, আত্মপ্রত্যয় তত বেশি। মুখে অনর্গল বাক্যস্রোত, বর্ষার কোপাইয়ের মতো নিন্দার ঘোলাজল তাতে অব্যাহত। এঁরা হলেন খোয়াইয়ের বেঁটে-খাটো খেজুর গাছের মতো—বিদ্যার অজস্র ফল ফলে আছে, পেকে পেকে ঝরে যাচ্ছে। কিন্তু কুড়িয়ে নেবার লোক নেই। কিন্তু সাবধান—এঁদের ঘাঁটাবেন না, ফলে হাত পেঁছোবার আগেই কাঁটার খোঁচায় রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে। আজ মহর্ষিপুত্র বেঁচে থাকলে বোধহয় ব্রহ্মডাঙ্গা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিতেন।

তিন দিন পর আমাদের ফিরে আসার কথা। পথে একজনের আত্মপ্রিয়র সঙ্গে দেখা। তিনি আমার বন্ধুর পরিচিত। শুনে তিনি বললেন : সে কি আজকেই ফিরে যাবেন কেন ? সন্ধ্যায় প্রহসনটা দেখে যান।

আমি কখনও আনন্দ -নিলয়ে অভিনয় দেখিনি। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম : কি নাম প্রহসনের ?

তিনি রহস্যময় হাসি হেসে বললেন : গোড়ায় গলদ।

যথাসময়ে নাট্য-সদনে গিয়ে দেখলুম, সেমিনার হচ্ছে। বিষয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আমি একটু অবাক হলুম। প্রহসন কোথায় ?

প্রথমে উঠলেন একজন কলকাতাবাসী প্রধান কবি-অধ্যাপক। তিনি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ শুরু করলেন। প্রারম্ভে একজন কবিপ্রিয় বক্তা সম্বন্ধে যে সমস্ত সদুক্তিকর্ণামৃত শোনালেন, তাতে মনে আশা জেগে উঠলো। আজ বিনি পয়সায় কিছু জ্ঞানার্জন করা যাবে।

মিনিট বাইশ পর আত্মপ্রিয় ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন : বুঝলেন কিছু ?

আমি বললুম : বাষট্টি বার—

তিনি চটে উঠলেন : আমি ডবল ডক্‌টরেট—ক্যাল এট লণ্ড। আমি একবারে কিছু বুঝলুম না, আর আপনি বাষট্টি বার বুঝলেন ?

আমি একটু হেসে বললুম : বাইশ মিনিটে তিনি বাষট্টিটি কোটেশান ঝেড়েছেন। আত্মপ্রিয় আত্মপ্রসাদের ভঙ্গিতে বললেন : এখন বুঝতে পারছেন, কেন প্রহসন বলেছিলুম ?

—তাতো বুঝলুম, কিন্তু গোড়ায় গলদ বলেছিলেন কেন ?

—আরে মশাই, আমি যখন হর্ষবর্ধন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলুম তখন এমন সেমিনার করেছি যা আজও লোকে ভুলতে পারেনি। সেমিনার করা কি সোজা কথা? তার জন্য ঠিকমত প্ল্যানিং করা চাই।

ততক্ষণে বক্তার অমৃতভাষণ শেষ হয়েছে, চতুর্দিকে রব উঠেছে 'সাধু, সাধু'। এমন অসাধু বক্তৃতা জীবনে আমি কখনও শুনিনি। ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলুম সাধু শব্দের আসল অর্থ তাহলে অসৎ, অসাধু। সেই ধারণা পরিবর্তন করার তেমন কারণ আজও ঘটেনি।

আত্মপ্রিয় ইতিহাসের অধ্যাপক, গবেষণা করতে ভালোবাসেন। তিনি চলতে চলতে বললেন: সাধু রব আনন্দ-নিলয়ে কবে চালু হয়েছে জানেন? যেদিন চন্দ্রনাথ বসু ঠাট্টা করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ভাই হাততালি' সেদিন থেকে এখানে হাততালি দেওয়া ট্যাবু হয়ে গেছে, চালু হয়েছে সাধু শব্দের হাম্বারব।

ইচ্ছা ছিলো বলি, সাধুবাদ জানানো এদেশের বহুকালের রীতি। কিন্তু আত্মপ্রিয়র 'ক্যাল এট লণ্ডের' কথা মনে থাকায় বুঝলুম তাঁকে আর ঘাঁটানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই 'সাধু' শব্দের আসল অর্থ যে 'অসাধু' একথা গর্ভবতী গাভীর মতো রোমন্থন করতে করতে গেস্ট হাউসে ফিরে গেলুম।

আর বাকি রইলো কড়চা শব্দটি। সুকুমার পাণির চাতুরীতে নীবীমোচন হয় কিনা জয়দেব বলতে পারতেন, কিন্তু তাতে সম্ভবতঃ আমার পূর্বপুরুষ গোবিন্দদাসের কাছা খোলা যে যায় একথা আমরা সবাই জানি। গোবিন্দদাসের কড়চা বিলকুল ফল্‌স্‌, ডাহা মিথ্যা; সুতরাং সুধী পাঠক, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন 'সাধু আকন্দদাসের কড়চার' অর্থ 'এক অসৎ অপদার্থের মিথ্যা গল্প'।

এই পর্যন্ত লিখেছি, হঠাৎ আমার ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠলো—ন হন্যতে, ন হন্যতে। আকন্দ, তুমি কি সুসাইড ক্লাবের মেম্বার হয়েছো? জানো না কি, আত্মহনন মহাপাপ? সেই ভেতরের ডাকে বুকটা কেমন যেন কেঁপে উঠলো। পাপকে কে না ভয় করে, বলুন? অবশ্য পুষ্পকরথের উইং কমাণ্ডার রাবণ, গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া আণ্ডারটেকিংএর পারচেজ অফিসার নটরাজন ও আমাদের পাশের বাড়ির হাত-টান-ওয়ালা কিচেন ম্যানেজার সত্যভূষণ ছাড়া। সুতরাং আমাকে এবার ভোল পাল্‌টাতে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের ঢঙে বলতে হচ্ছে, এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলেছি তা যেমন সত্য তেমনি তার উল্টো কথাটাও সত্য। পদ্ম জন্মায় পঙ্ক, তবু সে ফুলের বংশে স্বমহিমায় পঙ্কজ হয়েই বিরাজ করে। কিছু কিছু লোকের কর্মে ও আচরণে সাধু শব্দের গায়ে ধুলো লাগলেও তার ধর্মসংগত অর্থ চিরকালই থাকবে সজ্জন। সজ্জন সংসর্গে থাকাই যেখানে শাস্ত্রের নির্দেশ, সেখানে অভদ্ররীতির বশবর্তী হয়ে সাধু শব্দের কদর্থ করতে যাবেন কেন? আর আকন্দ? স্বীকার করছি, ওটি বর্ণভিত্তিক পুষ্পসমাজে নৈকষ্য কুলীন নয়—তার নামগোত্র

বটানিস্টের কৌতূহল জাগ্রত করতে পারে, ফ্লাওয়ার শোর অরগেনাইজার হর্টিকালচারিস্টের নয়। তবু আকন্দ পূত, পবিত্র—রুদ্রপূজার একমাত্র পুষ্পার্ঘ্য। সেকথা আর কেউ না বুঝুন, মেথরের কবি সত্যেন দত্ত বুঝেছিলেন –

স্ফটিকের মত শুভ্র ছিলাম আদিম পুষ্পবনে,
নীল হ'য়ে গেছি নীলকণ্ঠের কণ্ঠ-আলিঙ্গনে।
বিষাদের বিষ ভখিয়া পেয়েছি গরলের নীলরুচি,
স্থাণুর ধেয়ানে পেলব এ তনু হয়েছে পাথরকুচি।
রুদ্র নিদাঘে খর বৈশাখে রুদ্রেরি পূজা করি,
আধ-নিমীলিত পাপড়ি আমার ঢুলু ঢুলু আঁখি স্মরি'।
নীলকণ্ঠের কণ্ঠ ঘিরিয়া সর্পের আনাগোনা,
আমি তারি সনে আছি একাসনে পেয়েছি প্রসাদকণা।

অতএব এই অধম আকন্দদাস বেওয়ারিস ফেলনা বস্তু নয়—স্বয়ং ধূর্জটির প্রসাদপুষ্ট ধুস্তুরসখা অর্কমন্দার। আমি সজ্জন, দাসানুদাস—হাসতে জানি, হাসাতে জানি। সুতরাং সহৃদয় পাঠক, আমার কড়চায় আপনারা পাবেন এক সাত-আগুনে-পোড়া মানুষের অভিজ্ঞতার সকৌতুক বিবরণ। শুধু অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, রেগে গেলে আমি আমার আরাধ্য দেবতার মতোই রুদ্রচণ্ড এবং সতীর্থ দ্বিজিহ্বদের প্রকৃতি অনুযায়ী দংশনপ্রিয়। এই সবিনয় নিবেদন-টুকু রেখে আমার আসরে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি—

কড়চার সরস কথা অমৃত সমান।
দাসজা আকন্দ কহে শুন গুণবান্‌॥

●●

স্মৃতিগুলো রুপোলি মাছের মতো। হঠাৎ-হঠাৎ মনের ওপরতলায় ভেসে ওঠে। এই বাহান্ন বছরের জীবনের চৈতন্যের লাবণ্যপ্রভাত ঠিক কোন্ সময় এসেছিলো আজ আর মনে নেই। কিন্তু সে-কথা মনে না থাক্, আজ মনে পড়ছে এক চৈত্রদিনের কথা। একটা রুপোলি মাছ ঘাই মেরে জানান দিয়ে গেলো। স্মৃতির কোঠায় হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। আমি এই মুহূর্তে ফিরে যাচ্ছি অনেক দিনের আগের এক চৌকাঠে।

আমার বয়স তখন সাত। আকন্দদাস নামে একটি ছোট্ট ছেলে। কারও নজরে পড়ে না। চেহারায় জৌলুস নেই, শরীরে বৃদ্ধি নেই। হাফ প্যান্ট পরি, খালি গায়ে থাকি, দশটা বাজলে ছেঁড়া জামা গায়ে চড়িয়ে স্কুলে যাই। আত্মীয়-স্বজন পাড়াপড়শীরা ভাবতো, আমি নিতান্তই অতি সাধারণ, ভিড়ের হাটে লেপটে-থাকা অকিঞ্চিৎকর একজন। বড়ো স্কুলে সবেমাত্র ভর্তি হয়েছি, লেখাপড়ায় তেমন তুখোড় কিনা তার প্রমাণ তখনও মেলেনি।

কিন্তু আমি ছিলুম আমার বাবার ছোট ছেলে। তিনি আমাকে ভালো-বাসতেন খুব। সময় পেলে আমাকে কাছে টেনে নিতেন, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতেন। বলতেন, মানুষ হবি তো? আমি কিছু বুঝতুম না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতুম।

—দে তো, পেটে একটু হাত বুলিয়ে দে।

বাবা ছিলেন মোটা মানুষ। মস্তবড়ো ছিলো ভুঁড়ি। আমি একটু হাত বুলিয়ে দিয়েই বলতুম, বাবা, যাই?

আমি তখন ডাংগুলি খেলায় ভয়ঙ্কর মেতে উঠেছি। দিনরাত খেলি। বাবার কাছে বেশিক্ষণ বসতে ভালো লাগতো না। আড়চোখে তাকিয়ে দেখতুম বাবা ঘুমিয়ে পড়লেন কিনা। তাঁর নাক একটু ডেকে উঠলেই পালিয়ে যেতুম। সত্যি, বাবারা না থাকলে কী ভালোই না হতো! আমরা যেমন খুশি ঘুরে বেড়াতে পারতুম।

বাবা আমাকে কখনও বকতেন না। বাড়িতে থাকতেনই বা ক'দিন! তিনি ছিলেন বড় উকিলের মুহুরী। অসহযোগ আন্দোলনের সময় উকিলবাবু আদালত ছেড়েছিলেন, বাবাও বাড়ি এসে বসলেন। মাস ছয়েক পর উকিলবাবু আবার আদালতে ফিরে গেলেন। দেশপ্রেমের গোঁজামিল দিয়ে জীবনের সুদ কষায় তিনি ছিলেন ধুরন্ধর চাটার্ড একাউণ্টেন্ট। কিন্তু বাবা আর গেলেন না। তিনি নীতির ঢেঁকিতে পাড় দিতেই জানতেন, যুদ্ধকালীন সৈনিকদের মতো বুদ্ধিমত্তার সংগে পশ্চাদপসারণ করতে অর্থাৎ পা তুলে নিতে জানতেন না। সামান্য কিছু জমিজমা যা ছিলো, তাও ঠাকুর্দার আমল থেকেই ছিলো বন্ধক। বাবা তাই জীবিকার জন্য নিজের পথ বেছে নিলেন। জমি জরিপ করা, ছোটো-খাটো বাড়িঘর তোলা, কোর্টকাছারিতে মামলার তদারকি করা। তাতে যে সামান্য কিছু আয় হতো তাতে আমাদের দশ ভাইবোনের পেট ভরতো না। তাই আমরা না খেয়ে ও আধপেটা খেয়ে বড়ো হয়েছি। কখনও ভালো জিনিস খেতে পাইনি।

মন্দের ভালো, দাদারা সবাই লেখাপড়ায় ছিলেন খুব ভালো। বরাবর ফার্স্ট হতেন। বাবা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও যখন সন্তানদের পেট ভরাতে পারতেন না তখন ওই দাদাদের মুখ চেয়েই শেষ পর্যন্ত একেবারে ভেঙে

পড়েননি। কোনো একদিন ভালো সময় আসবে এই আশাতেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন। তবু সবদিন আমাদের খাওয়া জোটেনি।

সেদিন চৈত্রসংক্রান্তি। ফলার করার দিন। আমি মনে মনে এই দিনের অপেক্ষায় ছিলুম। চিঁড়ে, দই, কলা, জিলিপি, চমচম—কথাগুলি মনে পড়তেই সকাল থেকে আমার সে কী উত্তেজনা! কোথায়ও বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারছি না। এঘর থেকে ওঘর, ঘর থেকে উঠোন, উঠোন থেকে খিড়কির দরজা ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্যান্টের দড়ি মাঝে মাঝে খুলে যাচ্ছে, আবার বেঁধে নিচ্ছি। হঠাৎ মনে পড়লো, কই, বাবা তো এখনও ফিরলেন না!

পায়ে পায়ে রান্নাঘরের দরজায় এলুম। উঁকি মেরে দেখলুম, মা কড়াইয়ে কচুর শাক চাড়িয়েছেন। বরাবর দেখেছি, ঘরে যখন চাল বাড়ন্ত তখন মা বন-বাদাড় থেকে কচুর শাক কেটে এনে সেদ্ধ করে রাখতেন।

কান্না আমার বুকে উথলে উঠলো। ছলো ছলো চোখে বললুম, মা, বাবা কখন ফিরবেন?

মা বিষণ্ণ চোখ দুটি তুলে তাকালেন। কোনো উত্তর দিলেন না।

এমন সময় ঠাকুরমা তাঁর ঘর থেকে বললেন, মুকুন্দ, তুই এলি? সাড়া দিচ্ছিস্ না কেন?

মা তবু নিরুত্তর। কি বলবেন তিনি? বাবার আজ সাতদিন দেখা নেই। কোথায় গেছেন, কেমন আছেন কে জানে! কিন্তু ঠাক্‌মা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছেন। আধপাগলা বুড়ী। চোদ্দটি সন্তানের মধ্যে তেরোটি গেছে। একমাত্র বাবা বেঁচে আছেন। আজকাল আর তাঁর মাথার ঠিক নেই।

প্রহরের পর প্রহর এগিয়ে চললো। তবু বাবার দেখা নেই। দাদাদিদিরা সব বুঝেন। তারা চুপচাপ যে যার মতো এদিক ওদিক বসে আছেন। কারো মুখে রা নেই। শুধু থেকে থেকে ঠাক্‌মার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিলো: ও মুকুন্দ, তুই এলি?

আমার তখন খিদে সর্বগ্রাসী। পেটে যেন আগুন জ্বলছে। কিন্তু কি খাবো? না, কচুর শাক আজ কিছুতেই খাবো না! জানি, মা তাঁর ছোট ছেলের জন্য খানিকটা পান্তাভাত ঢেকে রেখে দিয়েছেন। তিনি জানেন খিদে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। না, আজ সংক্রান্তির দিন পান্তা ভাত খাবো না। চিঁড়ে-দই খাবো, জিলিপি-চমচম খাবো। এক আশ্চর্য জেদ আমাকে পেয়ে বসলো। কিন্তু বাবার তখনও দেখা নেই।

পায়ে-পায়ে ঠাক্‌মার ঘরের কাছে এলুম। দরজার ভেতরে ছায়া পড়তেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, কী মুকুন্দ, এলি?

—না, আমি আকন্দ।

—কিছু খেয়েছিস্ দাদু?

—না, ঠাক্‌মা। বড্ড খিদে পেয়েছে।

ঠাক্‌মা লাঠি ভর দিয়ে উঠে এলেন। চাল্‌সে চোখে আমাকে একটু দেখে বললেন, চান্ তো এখনও করিসনি।

আমি ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। না, আজ আর কারো কথা শুনবো না। সবাই আমার শত্রু।

—যা, দাদুভাই, বড়াদিঘিতে চান করে আয়। আসবার সময় শত্তুর কেটে আসিস্। মুকুন্দ ততক্ষণে এসে পড়বে।

আমি চল্‌তেই ঠাক্‌মা ডাকলেন: শোন্, একবার?

কাছে আসতেই নিচু গলায় বললেন: শত্তুর যখন কাট্‌বি, তখন মনে মনে বল্‌বি, ঠাকুর, খিদে আমার শত্তুর। তাকে কেটে গেলুম।

নাতি ক্ষুধার্ত। সে ছট্‌ফট্ করছে। আশি বছরের অথর্ব ঠাক্‌মা কী করতে পারেন? নাতির মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দেবার শক্তি আজ আর নেই। তাই শত্তুর কাটার নামে ক্ষুধা কাটার প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে করতে পারেন শুধু। অক্ষম মানুষের শেষ ভরসা ভগবান। অবশ্য একথা বুঝবার মতো বয়স সেদিন আমার হয়নি।

বড়াদিঘিতে অনেকক্ষণ ডুব দিয়ে দিয়ে চান্ করলুম। ডুবে ডুবে জল খেয়ে পেট ভরালুম। এক সময় দিঘি থেকে উঠে এসে চলে এলুম তেমাথায়। ঠোঙা থেকে বার করলুম খৈ-এর ছাতু। তারপর সেই ছাতু দিয়ে পথের ওপর শত্রু বানালুম। নিচু হয়ে কাঠি দিয়ে শত্রু কাটলুম। সবশেষে পেছন দিকে একবারও না তাকিয়ে চলতে শুরু করলুম বাড়ির দিকে।

বাড়ি ফিরে আসতেই মাথা আবার গরম হয়ে উঠলো। বাবা এখনও দেখা নেই। রাগে আমি সারা বাড়ি দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগলুম। মাথায় প্রায় খুন চেপে বসেছে। এটা ভাঙ্‌ছি, ওটা ছুঁড়ে মারছি। দেয়ালে টাঙানো ছিলো একটা পুরনো আমলের ঘড়ি। ঢিল ছুঁড়ে ওটাকে দিলুম ভেঙে। বাবার বেতের চেয়ারটা আছড়ে ফেলে দিলুম। দাদাদিদিরা কোথায় ছিলেন জানি না, কিন্তু মা দেখেও দেখলেন না। উনি বরাবরই কম কথা বলেন। আজ যেন একেবারে নির্বাক হয়ে গেছেন।

আমার দাপাদাপির শব্দ পেয়ে ঠাক্‌মা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে আকন্দ, চান্ করেছিস? শত্তুর কেটেছিস্?

—হ্যাঁগো ডাইনি বুড়ী, তোমার মুকুন্দকে কেটে দিয়ে এলুম।

হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেলো। চীৎকার নয়, যেন মর্মান্তিক হাহাকার! আমার এতখানি বয়স হয়েছে, এখনও সে-ধ্বনি কান থেকে মুছে যায়নি। মানুষের আর্তনাদ যে এত মর্মান্তিক হতে পারে, আগে কখনো ভাবতে পারিনি।

ঠাক্‌মার গোঙানোর আর শেষ নেই। তিনি বলে চলেছেন: এ কী করলি,

আকন্দ! আমার শিবরাত্রির সল্‌তে তাকে সংক্রান্তির দিনে এমন করে কাটলি?

সেই চীৎকার শুনে মা দেয়খো হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর সে কী মারমূর্তি! যেন আমাকে খুনই করে ফেলবেন। আশে-পাশের বাড়ি থেকেও কাকা কাকীরা চলে এসেছেন। একজন আমাকে ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি ততক্ষণে খিড়কির দরজা দিয়ে সুপুরি বাগানে পালিয়ে গেছি। আমার নাগাল পাবে কে?

সারা বিকেল বাগানের আলো-ছায়ায় ঘুরে বেড়ালুম। ঝিলের পাশে আম গাছের তলায় এক-পায়ে দাঁড়িয়ে-থাকা বকের দিকে ঢিল ছুঁড়লুম। কাঠ-বিড়ালীর পেছনে ছুটলুম। উচ্চিংড়ে ধরবার জন্যে লাফালাফি করলুম খানিকক্ষণ। এক সময় ক্লান্তি বোধ হলো। সুপুরি গাছে হেলান দিয়ে ঝিমোতে লাগলুম। দুপুরের সেই মর্মান্তিক খিদে ততক্ষণে মরে গেছে।

বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ গায়ে হাত। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, সেজদি। আমার চেয়ে সাড়ে তিন বছরের বড়ো দিদি।

—আয়, বাড়ি আয়।

আমি চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বললুম: বাবা বাড়ি ফিরেছেন রে?

—হ্যাঁ।

—মুড়ি-মুড়কি জিলিপি-চম্‌চম্‌ এনেছেন?

—এনেছিলেন, কিন্তু সাঁকো থেকে নামবার সময় আছাড় খেয়ে সব ফেলে দিয়েছেন।

লোভে আমার চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠেছিলো, কিন্তু সেজদির কথায় তা আবার স্তিমিত হয়ে গেলো। সেজদি মেয়ে, বুঝলো আমার মনে দুঃখ। সান্ত্বনা দিয়ে বললো, রাগ করিস্‌ না। সামনের বছর সব হবেখন। জানিস্‌, মা বাবাকে বকেছেন?

—কী বলেছেন?

—সংক্রান্তির দিন ছেলেমেয়েদের খেতে দেবার মুরোদ নেই, বাপ হওয়া কেন?

সেদিন কথাগুলির মানে আমি বুঝিনি। শুধু বুঝেছিলুম, এ এক সাংঘাতিক বকুনি। শুনলুম, মা ছোটবোন বুলুকে নিয়ে সেই যে শুয়েছেন, আর ওঠেননি। সেজদি বাবার কাদামাখা কাপড়চোপড় ছাড়িয়ে নেওয়ার পর বাবা দক্ষিণের জানালায় বসে চোখের জল ফেলছেন। সমস্ত বাড়ির আবহাওয়া যে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে, তা বুঝতে আমার কষ্ট হলো না। আজকের মতো খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ।

সেজদির আঁচলের তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ি ফিরলুম। সন্ধ্যা তখন উতরে গেছে। সেজদি মশারির একদিক তুলে আমাকে শুইয়ে দিলো। চিবুক

ধরে একটু আদর করলো। তারপর মশারি গুঁজে দিয়ে ধীর পায়ে বাবার কাছে চলে গেলো।

মা হাতের উপর মাথা রেখে মেঝেতে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে ছোট বোনটা কঁকিয়ে উঠছে। মা ওকে বুকের কাছে টেনে নিচ্ছেন। বাবা জানালার কাছে কালো পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। সেজদি তাঁর হাঁটুর ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। বাবা হাত রাখলেন সেজদির চুলে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। খট্ করে শব্দ হতেই ঘুম ভেঙে গেলো। টিম টিম করে হারিকেন জ্বলছে। অন্ধকার তখনও কাটেনি। মায়ের হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ। তিনি বাবার বিছানার মশারিটা তুলে কাপটা বাবার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, ধরো, খেয়ে নাও।

বাবা বিছানায় বসেছিলেন। বোধহয় সারারাত ঘুমোননি। মায়ের কথায় তিনি সাড়া দিলেন না। মা একটু ইতস্ততঃ করলেন, তারপর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মশারির ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

মশারিতে একটা বড়ো ফুটো ছিলো। সেই ফুটো দিয়ে আমি স্পষ্ট দেখলুম, মা বাবার মুখের কাছে কাপটা ধরে একটু একটু করে খাইয়ে দিচ্ছেন। বাঁ হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন বাবার মাথায় ঘাড়ে পিঠে! যেমনভাবে তিনি আমাকে আদর করেন তেমনিভাবে।

আমার বাবার ছিলো হাঁপানি। কিছুতেই সারছিলো না। কবরেজ মশাই বাবাকে চায়ের কড়া লিকার খেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই থেকে মা শেষ রাত্তিরে উঠে বাবাকে চা করে দিতেন। বাবা বিছানায় বসে রসিয়ে রসিয়ে খেতেন।

বাবার চা খাওয়া হয়ে গেলো। মায়ের রুক্ষ চুলে একবার হাত রাখলেন তিনি। টিপে টিপে দেখলেন মায়ের হাড়-বের-হওয়া কণ্ঠদেশ; মা একবার বাবার দিকে তাকিয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সেই শেষ রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেমন যেন ভালো-লাগার একটা আস্বাদ আমি অনুভব করলুম। আমার মা ভালো, বাবা ভালো। তাঁদের চেয়ে বেশি ভালো আমি আর কাউকে বাসি না। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা একবারও আমার মনে পড়লো না।

কথাগুলি ভাবতে ভাবতে আবার আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। স্বপ্নে দেখলুম, আমার বাবা-মা আমাকে আদর করে খাইয়ে দিচ্ছেন একরাশ চমচম্।

কিন্তু দোহাই পাঠক, আকন্দের এই স্বপ্নসম্ভব চমচমের গল্প শুনে আপনি চনমনে হয়ে উঠবেন না। এই ভালোবাসার চমচমগুলি অন্ততঃ থাক্ দরিদ্র পিতামাতার অধম সন্তানের জন্য। তার গদ্যময় ক্ষুধার রাজ্যে

পূর্ণিমার চাঁদ তো সব সময়ই ঝলসানো রুটি। তবু যদি তার কৈশোরের হৃদয়ের বৃন্তে গুচ্ছ গুচ্ছ চমচমের ফল একদিনের জন্যও ধরে থাকে তবে তারই স্বপ্নজড়িমা নিয়ে তাকে বাঁচতে দিন। শ্রমজীবীর প্রাণকান্ত সুকান্ত একটি মোরগের কাহিনী লিখলেও একটি মুরগীর ঠ্যাংও কখনও খাননি, এমন কথা হলপ করে বলতে পারি না। তাঁর রানার যেভাবে ছুটেছে, তাতে বার্তাকু না হোক ডাহুক বস্তাবন্দী করে আনবেই। হাত বাড়িয়ে রক্ত দিলে একটা ঠ্যাং মিললেও মিলতে পারে—কিন্তু সাবধান, লক্ষ্মীছাড়াদের নিয়ে মনোপলি বিজনেসের বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্তে যোগ দিলে আপনি আস্ত থাকবেন না। কিংবা ক্ষয়ক্রান্তকে ছেড়ে আরও ওপরে অয়স্কান্তের দিকে দৃষ্টি দিন। ভরাডুবির নোআ নেহুরুর টেবিল থেকে তুলে নিন একটা বার্ডসাই—ধোঁয়ার রিং ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিজের ভবিষ্যতের স্কাইহোম তৈরী করে ফেলুন। নাঃ, আপনি বড্ড ভীরু; মুরগীর ঠ্যাং কিংবা বার্ডসাই কোনোটাই আপনার জুটবে না। ভুল করছেন, তাতে নিদেনপক্ষে জেলের ফার্স্ট ক্লাশ সেলে বসে দুর্ভিক্ষের করাল বীভৎস কাহিনী লিখে ভারত আবিষ্কারের পরম গৌরব অর্জন করতে পারতেন। আপনার কপালে আছে কাঁঠাল—নির্ভেজাল কাঁঠাল—না, না, খাজা কিংবা গলা নয়—শুধু মাত্র ভুতি। শুনুন তবে সেই কাঁঠালের ভুতি খাওয়ার কাহিনী।

স্কুলে আমার সহপাঠী ছিলো সদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী। তার নামে ও চরিত্রে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক ছিলো না। তার কচি অধরে সব সময় ছড়িয়ে থাকতো নবোঢ়ার মতো একটা খুশি-খুশি ভাব। তার মূলে ছিলেন পিতৃদেব গুরুপ্রসন্ন চক্রবর্তী। তাঁর দুটি দুরপনেয় খ্যাতি ছিলো—সন্তানপ্রীতি ও ভোজনপ্রীতি। পুত নামক নরকের ভয়ে কিনা জানি না, তিনি সদাপ্রসন্নর আবদার রক্ষায় ছিলেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের মতোই উদারহস্ত। তাই পেন্সিলে ভাঙা শিস্ নিয়ে আমরা আর সকলে যখন ক্লাশে যেতুম, তখন সদার হাতে শোভা পেতো ব্লুবার্ড। টিফিনে তেলেভাজা নয়, আলুভাজা সহযোগে লুচি সেবনে ব্যস্ত থাকতো শ্রীমান্। শ্রাবণের আকাশের মতো ব্যাজার মুখে বসে থাকা ছাড়া আমাদের উপায় থাকতো না। আমরা ছিলুম হাঁসখালির বাসিন্দা, ও ছিলো ধানশালির।

একদিন বাজার থেকে ফিরছি—কালীমোহনের দোকানের সামনে দেখলুম গুরুপ্রসন্ন চক্রবর্তী। আলোচনার বিষয় সুপুত্র সদাপ্রসন্ন। পুত্রগর্বে গর্বিত পিতা বলছেন: ছেলেটা সেকেণ্ড হয়ে গেছে। ঠিকমতো দুধ খাওয়াতে পারিনি কিনা। এবার থেকে দেখছি দুধের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিতে হবে।

এই অধম বরাবর ফার্স্ট হতো। আমার বাবা দুধ দূরে থাক্ পিটুলি গোলাও খাওয়াতে পারতেন না। গুরুপ্রসন্নবাবুর কথা শুনে সেই অল্প

বয়সেই মনে হয়েছিলো, এবার থেকে আমার পরাজয়ের পালা শুরু হবে। আমার বাবা যে কানাকড়ির মনসবদার। দুধেল গাই ভুলেও মুকুন্দদাসের পাড়া মাড়ায় না।

দিন দুই পরে সদাপ্রসন্ন ক্লাশে এলো ঘড়ি পরে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেও আমার আশ মিটলো না। বুকের মধ্যে কোথায় যেন খোঁচা থেকে থেকে সেদিন অনুভব না করে পারলুম না।

কিন্তু সেই খোঁচা আরও গুরুতর হয়ে উঠলো যখন সদাপ্রসন্ন মোক্ষম মন্তব্যটি জুড়ে দিলো : তোর বাবা তোকে যতটা ভালোবাসেন, আমার বাবা আমাকে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

বিধাতাপুরুষ কালা নাহলে সেকথা শুনে নিশ্চয়ই সেদিন মনে মনে হেসেছিলেন। ভোজনরসিক গুরুপ্রসন্নর অবস্থা ছিল বেশ সচ্ছল। কিন্তু নিজের পেটের দায় মেটাতে গিয়ে তাঁর সচ্ছলতায় ধ্বস ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছিলো। কিন্তু তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি কোমরে ব্যারোমিটার লাগিয়ে খেয়ে চলেছেন! এই ব্যারোমিটার ছিলো তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার। এবং সেটা ছিলো টরেসেল্লির চেয়েও যুগান্তকারী আবিষ্কার। কোমরে খুব ঢিলে করে তাগা বাঁধতেন—তাতে ছিলো একটা চাবি। খেতে খেতে যতক্ষণ না তাগাটি কোমরে বসে যাবে এবং চাবিটি খাড়া হয়ে উঠবে ততক্ষণ তাঁর দক্ষিণহস্তের ক্রিয়া চলতো নীরবে। ব্রাহ্মণ, তার ওপর ভোজনপ্রিয়। সুতরাং ভোজনপর্বে গুরুপ্রসন্নর বাগ্‌যন্ত্রের সক্রিয়তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ভাগাড়ে মড়া পড়লে তার খবর যেমন ঠিক পেঁছে যায় শকুনের কাছে তেমনি শিষ্যবাড়ির শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের খবর পেঁছে যেতো গুরুপ্রসন্নর কানে। ফলে যথাসময়ে অর্থাৎ যথাসময়ের অনেক আগেই পেঁছে যেতেন যথাস্থানে। ডান পায়ের বৃহৎ বড়ো আঙুলটি উঁচিয়ে পদধূলি বিতরণান্তে তাদের পরকালের ব্যবস্থা করে নিজের ইহকালের দিকে মনোনিবেশ করতেন। জল দিতে এলে হা-হা করে উঠতেন : জল দিও না হে! জল খেয়ে পেট ভরাই নিজের বাড়িতে, পরের বাড়িতে শাস্ত্রসম্মত ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় জল খাবো কেন?

তখন আমাদের ম্যাট্রিক ক্লাশ চলছে। স্কুলে যাচ্ছি, পথে সদাপ্রসন্নর সঙ্গে দেখা। হাতের ব্যাগে আধসের ওজনের দশটি ফজলি আম। রোগাটে সদা আমের ভারে প্রায় ন্যুব্জদেহ। তবু হাসিমুখে বললো : নতুন উঠেছে, বাবা খেতে চেয়েছেন। আজ আর সীতানাথবাবুর ক্লাশটা করা হবে না। জানিস্‌তো বাবাকে আমি কত ভালোবাসি।

এরপর ম্যাট্রিক পাশ করে চলে এলুম কলকাতায়। সদাপ্রসন্নদের কোনো খবর রাখতুম না। তবে জনশ্রুতি শুনেছিলুম ওদের অবস্থা আর আগের মতো নেই। গুরুপ্রসন্নর জঠরাগ্নি তো ছিলোই, তার সঙ্গে কাস্টোডিয়ান ব্যাঙ্কের লালবাতির আগুন মিলে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে।

প্রাক্‌টিক্যাল ক্লাশ সেরে আশুতোষ কলেজ থেকে ফিরছি। সন্ধ্যা হয় হয়। বালিগঞ্জ টার্মিনাসে ট্রাম থেকে নেমে দ্রুত বাটার দোকানের পাশ দিয়ে ফার্ন রোডে ভাড়াটে বাড়িতে যাচ্ছি। তখন দেশ জুড়ে চলেছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। পথে ঘাটে সর্বত্র শুধু মর্মান্তিক হাহাকার। চালের হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট শাওয়ালেসের কৃপায় দু'বেলা অন্ততঃ ভাত জুটছে আমাদের। মেজদা ছিলেন ওখানে টেলিফোন অপারেটর। চলতে চলতে হঠাৎ দ্বৈতকণ্ঠের চিৎকার শুনলুম। চমকে গিয়ে তাকিয়ে দেখি, টেম্পোরারি পার্কের গায়ে ডাস্টবিনে পড়ে-থাকা একটা কাঁঠালের ভূতি নিয়ে জোয়ান-বুড়োর কাড়াকাড়ি। মুখে অশ্রাব্য খিস্তি। আমার সমস্ত শরীর ঘিন্ ঘিন্ করে উঠলো। কলেজে যাওয়ার সময় দেখেছিলুম একটা কুকুর তৃপ্তির সঙ্গে চাটছে ওটা।

আব্‌ছা অন্ধকারে ভালো করে ঠাহর করতে গিয়ে চমকে উঠলুম। আরে, এ যে ভোজনরসিক গুরুপ্রসন্ন ও তাঁর পিতৃভক্ত পুত্র সদাপ্রসন্ন। আমি আর দাঁড়ালুম না। পা চালিয়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবলুম, ঈশ্বর জন্মমুহূর্তে যে আগুন জঠরে দিয়েছেন, তার চেয়ে বড়ো সত্য সংসারে আর নেই। তার কঠোর উত্তাপে পুত্রস্নেহ পিতৃভক্তির সরসতা গরিবের বন্ধু পার্টিগুলির নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতির মতো উবে যায় অনতিবিলম্বে।

হঠাৎ নিজের কথা মনে পড়লো। আমার শৈশবের স্বপ্নসম্ভব চম্‌চমগুলি কি বাঁচানো যাবে? না কি ওদের জায়গা হবে ওই কাঁঠালের ভূতির সঙ্গে ডাস্টবিনের মধ্যে? সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললুম: ভগবান, তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।

বুদ্ধিমান পাঠক, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সেই সন্ধ্যায় মৃত্যু হলো আমার বন্ধু স্বপ্নসুন্দর দাসের।

● ●

খিদে নিয়ে সব মানুষই পৃথিবীতে আসে। ক্ষীরমোহনে কারো পরিতৃপ্তি, কারো বা শাকান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি। ভালো হোক্ মন্দ হোক্ কিছু যাদের জোটে, জঠরবিহিত প্রাত্যহিক হোমে তাদের আহিতাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে না। জীবন তাদের কাছে হয় কুমুদ কহ্লার, নয় সোঁদাল ফুল। আমি অর্কমন্দার— ছেলেবেলা থেকে আমার জ্বলন্ত পাকযন্ত্রে অগ্নিষ্টোম চলেছে অহোরাত্র।

পেটে ছুঁচোর কীর্তন। তাই সংসারে আসার পর আমাকে প্রথম দীক্ষা দিয়েছে অমল সুধা নয়, প্রখর ক্ষুধা। বুঝেছি পেটে খেলে পিঠে সইবে, নিরম্বু উপবাসের পুণ্য আমার জন্য নয়। আর ফুল? আমার দুনিয়াদারির প্রথম ইয়ার ভুখা ভগবান যতদিন না তুষ্ট হবেন ততদিন পুষ্পাসবে আমার মসনব সুরভিত হবে না।

ছেলেবেলা থেকে খাই খাই বাই-এর সঙ্গে আর একটা বাই আমাকে পেয়ে বসেছিলো। সেটা ভয়। পেছন ফিরে তাকালে আজো যেন দেখতে পাই একটা আদিগন্তহীন ভয়ংকরের রাজ্য। সেখানে শুধু অন্ধকার, ভূত-প্রেত দৈত্য-দানার ছায়াবাজি। মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে জন্মের আলোয় এসেছি দিন দশটায়, কিন্তু আকৈশোর সূর্যাণীর চেয়ে তমিস্রার সঙ্গে আমার সম্ভাষণ হয়েছে বেশি। তার বিনিময়ে পেয়েছি আতঙ্ক আর ভয়। বাল্যে সূর্যাস্তের আগে থেকে বুক ধড়ফড় করতো, বেলাশেষে সুপুরি পাতায় যে আলোর ঝালর উড়ছে তা চোখেই পড়তো না। নিজের ভেতরে যেন কালো মুখোশ-পরা কোনো এক রঘু ডাকাতের পদধ্বনি শুনতে পেতুম। সে আসছে সর্বস্ব লুঠ করে নিতে। আমাকে নিয়ে শ্মশানের মড়ার খুলির মতো গেন্ডুয়া খেলতে। আমি ত্রাসে সেঁটিয়ে যেতুম।

বয়স তখন ছয় থেকে সাতে পা দিয়েছি। সকালে পড়ি, দুপুরে পাঠশালায় যাই, বিকেলে ডাংগুলি খেলি। কিন্তু দিনের আলো নিভে যাওয়ার আগেই বাড়ি ফিরে আসি। ইস্কুল থেকে ফিরে এসে পান্তা ভাত খাই। রাতে কোনোদিন কিছু জোটে, কোনোদিন জোটে না। ছোট বোন বুলু সবে হয়েছে, মা তাকে ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়ে রেখে সংসারের কাজ সারেন। ছোট ছেলের বায়নাক্কা শুনবার মতো অবসর তাঁর নেই। কালি-পড়া লণ্ঠন জ্বালিয়ে পড়তে বসি—আমি ও ছোড়দি খুশি। ও মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মুখস্থ করে—দিনের আলো নিভে এলো সুয্যি ডোবে ডোবে। প্রায় রোজই ওটা ওর কবিতা পড়ার সময়। আমি মিশ্রযোগে হাত পাকাই। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ হয়ে গেছে, ছোট ছোট সরল অংকও সড়গড় হয়ে গেছে।

সেদিন ছোড়দি পড়তে বসেনি। ওর জ্বর। আমি একাই বসেছি, মনোযোগ দিয়ে অঙ্ক কষে চলেছি। গোটা পাঁচেক হয়ে যাওয়ার পর মুখ তুলে সামনের জানালার দিকে তাকিয়েছি। দেখি সেখানে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে নাগেদের বাড়ির সোনাবৌদি। স্পষ্ট দেখলুম, তার নাকের নথ। বরাবর যেমন দেখেছি, তেমনি দু'চোখে হাসির ঝিলিক।

বললুম: এই রাত্রে একা এসেছো, সোনাবৌদি?

উত্তর নেই। ভাবলুম, ঠিক দেখেছি তো! চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে আবার জানালায় তাকালুম। না, কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ মনে হলো, সোনাবৌদি আসবে কোথা থেকে? সেতো পরশু মারা গেছে কলেরায়।

প্রীতীশ আমার চেয়ে এক বছরের বড়ো। কিন্তু জানতো অনেক বেশি। সে একদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলো, আগুন আর লোহা ছুঁলে ভূতেরা পালিয়ে যায়। ও দুটো বস্তুকে নাকি ভূতেরা যমের মতো ভয় করে।

জানালায় কাউকে আর দেখতে না পেয়ে আমি চিৎকার করে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিলুম জ্বলন্ত লণ্ঠনের চিমনিটা। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হওয়ার পর দেখলুম, মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি। আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। বড়দা, ফুলদা, রাঙাদা, সেজদি, ছোড়দি, সুন্দর ঠাকুরমা, কনকবৌদি, মাতঙ্গিনী কাকীমা।

মা আমার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : কি হয়েছিলো রে ?

আস্তে আস্তে ক্লান্ত স্বরে বললুম : সোনাবৌদি কোথায় গেলো, মা ?

—তাকে কোথায় দেখ্লি ?

—জানালায় দাঁড়িয়ে হাসছিলো।

সকলে নিঃশব্দে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। সুন্দর ঠাকুরমা চাপাগলায় বললেন : শরতের বৌ আকুকে বড্ড ভালো বাসতো, বোধহয় ভুলতে পারেনি। তাই একবার দেখতে এসেছিলো। এ কাল-ভালোবাসা ছেলেটার সইলে হয়। তা বৌমা, তুমি একবার মালী-বেটিকে ডেকে পাঠাও। একটু ঝাড়ফুঁক করে যাক। আর আকুর হাতে একটা জালকাঠি পরিয়ে দাও।

জালকাঠি একটা কেটে দেওয়া হলো মাছ ধরার জাল থেকে। গাঁয়ে-গঞ্জে গৃহস্থের বাড়িতে জাল একটা থাকেই—নদী-নালা পুকুরের দেশ, মাছেরও অভাব নেই। শহুরে বাবুরা রোজ সকালে থলে হাতে বাজারে যায়, কুচো চিংড়ি খোঁজে—বাবুয়ানার দৌড় মাঝে মধ্যে কাটা পোনা পর্যন্ত। গাঁয়ের লোকেরা রোজ মাছ খায় না, অতিথি-সৎকারে যাতে গলদ না ঘটে তা-ই প্রতি ঘরে জাল রাখার ব্যবস্থা।

আমার হাতে জালকাঠি পরিয়ে দেওয়া হলো। হাতের তেলোতে ইয়া বড়ো বড়ো ফোস্কা, অসহ্য যন্ত্রণা। কে যেন খাব্‌লা খাব্‌লা নুন মাখিয়ে রেখেছে। পোড়া ঘায়ের ওটাই সহজ গরীবী ব্যবস্থা। বার্নলের বিলাসিতার খবর তখনও গাঁয়ে-গঞ্জে গিয়ে পৌঁছোয়নি।

মালী-বেটি এলো। ও মেয়ে-ওঝা। মায়ের কোলে শুয়ে-থাকা আমার চারপাশে দণ্ডী কাটলো পাঁচবার। তারপর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অনর্গল অশ্রুত কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করলো মিনিট দশেক। আমার হাতের চেটোয় ফুঁ দিলো কয়েকবার। তারপর উজ্জ্বল চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো : বৌ-রানী, আপনার ছেলের দোষ কেটে গেছে।

বৌ-রানী চোখ মুছতে মুছতে আঁচলের খুঁট থেকে একটি দু'আনি বার করে

দিলেন। তখনকার দিনে দু'আনা অনেক পয়সা। মালী-বেটি ছিলো আমাদের অঞ্চলের ডাকসাইটে ওস্তাদ, ওর রেটটা ছিলো বেশ হাই।

এই আমার অন্ধকারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তার অপরূপ রূপ আমি দেখিনি, দেখেছি তার ভয়াল রূপ। তারপর থেকে আমার কাছে অন্ধকার মানে ভয়, ভয় মানে অন্ধকার। তারা রাত্রিচর। তাই আমি কোনোদিনই রাত ভালোবাসি না। ওটা রুদ্ধ কান্নার নিকষ কালো সমুদ্র। সৃষ্টির বামমুখ।

সেই বছরেরই মাঘ ফাল্গুন মাস। শীতটা মনে পড়ছে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলো। একটু বেলা করে ডবল কাঁথা ছেড়ে উঠেছিলুম। উঠেই শুনলুম, ঠাক্‌মার অবস্থা খারাপ। তাঁকে তুলসীতলায় নামিয়ে রাখা হবে।..

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখেছি ঠাক্‌মা আধ-পাগ্‌লা বুড়ী। সারাদিন বক্ বক্ করেন, জিনিসপত্র ভাঙচুর করেন। কোনোদিন খান, কোনোদিন খান না। ওঁর দিকে নজর দেবার কথা কখনো মনে হয়নি, ভালোবাসা তো দূরের কথা। ঠাক্‌মাকে উত্তর শিয়রে শুইয়ে দিলেন দাদারা। বাবা কাঁদো-কাঁদো মুখে বসে রইলেন মাথার কাছে।

একবার ঢিল ছুঁড়ে একটা কাঠবিড়ালী মেরেছিলুম। ওর মাথাটা একেবারে থেঁতলে গিয়েছিলো। চিৎ হয়ে গাছের গোড়ায় পড়েছিলো। ঠোঁটটা একটু একটু নড়ছিলো, বুকটা কাঁপছিলো থেকে থেকে। তারপর এক সময় স্তব্ধ হয়ে গেলো। বুঝলুম, ওটা মরে গেছে। মৃত্যুর সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। এর আগে মৃত্যু আমি কখনও দেখিনি।

ঠাক্‌মার চোখ বন্ধ। ঠোঁট কাঁপছে। বাবা একটু একটু করে গঙ্গাজল খাইয়ে দিচ্ছেন। সবটা গলা দিয়ে নাবছিলো না, ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো। পেটটা ওঠা-নামা করছিলো হাপরের মতো। গুরুজনেরা বলাবলি করছিলেন, ঠাক্‌মার নাকি নাভিশ্বাস উঠেছে। ওঁর শেষ হয়ে যেতে দেরি নেই। ঠাক্‌মার ছেলের বয়সী ভাই মণিদা সুর করে গীতা পাঠ করছিলেন।

এমন সময় এলেন রাঙা ঠাকুর্দা। বললেন: সময় না হলে কারো যাওয়ার উপায় নেই। জন্মযন্ত্রণার মতো মরণযন্ত্রণা কারো এড়িয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। আজ শনিবার, বিকেল পাঁচটা দশে অমাবস্যা লাগবে। রাত্তিরের আগে তারকগঙ্গাদি গঙ্গাযাত্রা করবেন না। তোরা ওকে কোঠাবাড়ির দক্ষিণের ঘরে সরিয়ে নিস্ বিকেলের দিকে।

সাত বছরের ছেলের পক্ষে কথাগুলি বোঝা শক্ত। এইটুকু বুঝলুম, ঠাক্‌মা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। মনে পড়ছে, গত দু'বছরের মধ্যে পাগ্‌লী বুড়ীর ঘরে কখনও ঢুকিনি। চৌকাঠ মাড়িয়েছি মাত্র। ঘরে ঢুকলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করতেন। হঠাৎ হঠাৎ ডেকে বলতেন: চান্ করেছিস্? বাতাসা খাবি?

—ছুঁড়ে দাও।

—না। কাছে আয়।

বুড়ীকে কাঁচকলা দেখিয়ে পালিয়ে যেতুম। তখন শুরু হতো বখ্‌তিয়ার খিলজীর বক্‌বকানি। কখনও দু'পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসতেন।

আজ সেই ঘর শূন্য। পায়ে পায়ে ঘরের ভেতর চলে গেলুম। একপাশে ছেঁড়া মাদুর পাতা, তার পাশে তেলচিটে বালিশ। দড়িতে ঝুলছে একটা আধ-ময়লা থান ধুতি। এক কোণে কলাই-ওঠা থালার ওপর খান দুই বাসি রুটি। কাৎ হয়ে পড়ে আছে কাঁসার গেলাসটা। পুব দিকের বেড়ার পাশে পর পর পাঁচটি আদ্যিকালের কৌটো। বহু পরিচিত লাঠিটা বেড়ার গায়ে ঠেস দেওয়া আছে। চারটে কৌটো খালি। শেষেরটায় ঝাঁকুনি দিতেই ঝন্‌ঝন্ শব্দ হলো। খুলে দেখি গোটা দশেক বাতাসা। ভেতরে এক টুকরো কাগজ। এযে আমার হাতে লেখা আমারই নাম! মনে পড়লো, ঠাক্‌মা আমার একটা পুরনো খাতা একদিন চেয়ে নিয়েছিলেন।

মনটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোঁটা জল। কেন জানি না, ঠাক্‌মাকে বড়ো বেশি ভালোবাসতে ইচ্ছে করলো। হঠাৎ বাতাসাগুলো বার করে নিয়ে কড়মড় শব্দে খেয়ে ফেললুম। শুনেছিলুম, ঈশ্বর আকাশে থাকেন। সেদিকে তাকিয়ে বললুম: ঠাকুর, আমার ঠাক্‌মার সঙ্গে দেখা হলে বলে দিও, ওঁর সব বাতাসা খেয়ে নিয়েছি। একটাও ফেলে দিইনি।

ততদিনে জেনে গেছি, মৃত্যুর দেবতা যম। তিনি দূত পাঠিয়ে পৃথিবী থেকে মানুষকে নিয়ে যান। ছবিতে দেখেছি ওঁদের ভয়ংকর চেহারা। তাহলে কি আমার ঠাক্‌মাকে নিতে ওঁরা এসে গেছেন? মানুষ কি ওঁদের দেখতে পায়? আমি কেন দেখতে পাচ্ছি না!

রোদ পড়ার আগেই পোড়ো পাকাবাড়িটার দক্ষিণের ঘরটা পরিষ্কার করা হলো। ওখানকার যারা স্থায়ী বাসিন্দা ছিলো তারা হলো বিরক্ত। ডজন-খানেক বাদুড় গেলো উড়ে, অজস্র চামচিকে উড়ে বেড়াতে লাগলো চার দেয়ালে। একটি গোখ্‌রো সাপ মিনিট দুই ফণার নাচন দেখিয়ে দুটি সন্তান-সহ বীরদর্পে ঘর বদল করলো। যেন শাসিয়ে গেলো যথাসময়ে পুনরাভিসার ঘটবে। উঁকি মেরে দেখি, ঘরটায় দিনের বেলাতেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বহুকালের পুরনো জানালার খিলগুলো এমনভাবে এঁটে বসেছে যেন সূর্য-দেবকে চ্যালেঞ্জ করে বলছে, তফাৎ যাও। সাত বছর বয়সেই আমার মনে হলো, এমন ঘর না হলে যমরাজাকে মানায় না। ওঁর সিংহাসন ওখানে তৈরি হয়েই আছে।

গা-টা কেমন ছম্‌ছম্ করে উঠলো। ঠাক্‌মাকে স্থানান্তরিত করার আগেই পালিয়ে এলুম। একেবারে ডবল কাঁথার ভেতরে। ছোড়দি আমার

আড়াই বছরের বড়ো, কিন্তু ওর বোধ ও বুদ্ধি বরাবরই ডবল প্রমোশান পেয়ে বসে আছে। আমি ভয় পেয়েছি ভেবে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলো। খাওয়ার বালাই ছিলো না। ঠাকুমার অবস্থা বুঝে সকাল দশটার মধ্যে আধসেদ্ধ ছোলার ডাল ও পুঁটি মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খাইয়ে দিয়েছিলেন এক দূর-সম্পর্কের ঠানদি। এক শ্রেণীর মহিলা সংসারে থাকেন যাদের বাস্তববুদ্ধি বেশ প্রখর। আমাদের সংসারে যখন ঘন ঘন কচুর শাক সেদ্ধ খাওয়ার পালা চলছিলো তখন বোধহয় তাঁর নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা। কিন্তু আজ? অকস্মাৎ তাঁর সামাজিক কর্তব্যবোধ জেগে উঠলো। কিন্তু ছোলার ডালই তো যথেষ্ট ছিলো। আবার পুঁটি মাছ খাওয়ানো কেন? তেরোদিন অনিবার্য নিরামিশ ভোজনের কষ্টকরতাকে বোধহয় লাঘব করে দেওয়ার একটু চেষ্টা। পরে দেখেছি, আসন্নবিধবাকে জোর করে মাছ খাইয়ে দেওয়ার জবরদস্তি প্রয়াস। আশা বোধ হয়, পরবর্তী বৈধব্যদশায় মাঝে মাঝে মাছের ঢেঁকুর উঠবে। এর চেয়ে অমানবিক সহমর্মিতা সংসারে আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। বরং রবীন্দ্রনাথের বরদাসুন্দরীর আচরণ সরল ও স্বাভাবিক। স্বামী গুরুচরণের মৃত্যুর সময় সে নিজেই কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা এবং চিংড়ি মাছের ঝালচচ্চড়ি দিয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পান্তাভাত খাচ্ছিল। তার এই স্বচ্ছন্দ আত্মরতির মধ্যে আর যাই থাক্ শাস্ত্রের নামে ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। কিন্তু এতো আমার আজকের ভাবনা। সেদিন কিন্তু পুঁটি মাছ খেতে ভালোই লেগেছিলো। কতদিন মাছ খাইনি!

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। ছোড়দি কিন্তু জেগেই ছিলো। হঠাৎ 'হরি বোল' 'হরি বোল' শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো। ছোড়দিকে আঁকড়ে ধরে বললুম: কিসের শব্দ রে?

—ঠাকুমাকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে।

ভয়ে আমি শিউরে উঠলুম। কল্পনায় ভেসে উঠলো যমরাজার দাঁতালো হাসি। ওঁর দূতেরা বোধহয় আজ বকশিস্ পাবে। কাঁথা সরিয়ে জানালার দিকে তাকালুম। বাইরে ঠাকুমার কালো পাথরের থালার মতো মিশমিশে অন্ধকার। পেঁপে গাছটার মরা ডালে দুলছে প্রেতেরা। আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলো। মাথা পর্যন্ত কাঁথা টেনে নিয়ে কাঁপতে লাগলুম। ছোড়দি আমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললো: লক্ষ্মী ভাই আমার, ঘুমো—ঘুমো।

বাইরে তখনো শোনা যাচ্ছে রোমহর্ষক হরিধ্বনি। রাত্রির অঢেল অন্ধকারে ভয়ের মন্ত্র জপ করতে করতে মৃত্যুকে প্রথম চিনে নিলুম। মৃত্যুর রং নীল নয়, কালো।

ছয় মাসের মধ্যে আবার ঘটলো দুর্ঘটনা। মাসখানেকের ওপর বাবার জ্বর। তিনি হাড্ডিসার হয়ে গেছেন। অসুখটার নাম শুনলুম টাইফয়েড। মায়ের

চলেছে দিনে খাটুনি, রাত্রে জাগরণ। সেদিন তেইশে শ্রাবণ। আমার সবেধন নীলমণি প্যান্টটা ভিজে, ইস্কুলে যাইনি। গামছা পরে ছিপ ফেলে বসেছিলুম খিড়কির পুকুরে। ছোড়দি কাঁদতে কাঁদতে এসে বললো : আকুরে, বাবা চলে গেছেন।

বেলা তখন এগারোটা। আমার চোখের সামনে থেকে দপ্ করে পৃথিবীর সব আলো নিভে গেলো। চারিদিকে শুধু বাদুড়ে অন্ধকার, ভুতুড়ে ছায়ানট, ভয়ার্ত মুখোশ। মৃত্যু আর একবার আমার কাছে এলো কৃষ্ণকায় ময়াল সাপের মতো।

দিন যায়, বয়স বাড়ে। দশ বছরে পা দিয়ে আমি কতকটা সেয়ানা হয়ে উঠেছি। বাবা থাকতেই মেজদা গিয়েছেন কলকাতায় মায়ের রুলি বিক্রি করে। এখন চাকরী করেন হিজ মাস্টার ভয়েসে। মাসে মাইনে তিরিশ। সেজদা পড়েন বিদ্যাসাগরে। দুজনের জন্য পনের টাকা রেখে বাড়িতে পাঠান বাকিটা। দুটাকা চালের মণ, এখন আমাদের খাওয়ার কষ্ট নেই।

আমি তখন মনি-অর্ডারের খোঁজ করতে পোস্ট আপিসে যাই, দুর্গা পুজোর পাঁঠা বলির নেমন্তন খেতে ভিন্ গাঁয়ে যাই। ফুটবল খেলা দেখা নেশা হয়ে গেছে। একদিন খেলা দেখে বাড়ি ফিরতে দেরি হলো খুব। সুপুরি বাগানের মধ্য দিয়ে পথ চিনে চিনে আসছিলুম। হঠাৎ একটা আওয়াজ। বিশ গজ দূরে অন্ধকারে কি যেন সব নড়ে উঠলো। আমি চমকে গিয়ে বললুম : কে?

একটা কালো ছায়া দুভাগ হয়ে দুপাশে ছিট্কে পড়লো। চৈত্রমাসের ঝরা পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে চলার আওয়াজ। আমি আবার হাঁক দিতেই একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ। এগিয়ে গেলুম।

বড়দা আসছিলেন আমার পেছনে পেছনে। আমার চিৎকার শুনে লাফ মেরে চোর ধরে ফেলেছেন। আর কেউ নয়, লোমশ ভট্টাচার্য। ওর আসল নাম পরেশ, কিন্তু গায়ে বড়ো বড়ো লোম ছিলো বলে লোকে ডাকতো লোমশ ভট্টাচার্য বলে। বললেন, কি করছিলেন ওখানে?

উত্তর নেই।

—বলুন, কি চুরি করছিলেন?

তখনও তিনি নির্বাক্।

—চলুন, চৌকিদারকে ডেকে আপনাকে পুলিশের হাতে [illegible]

এমন সময় একটু দূরে ডুমুর গাছের তলায় কিসে[illegible] আওয়াজ। কে যেন আস্তে আস্তে পালাবার চেষ্টা [illegible]।

অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। তব[illegible] কচুলে বাব[illegible] দে[illegible] মনে হলো ডুরে শাড়ি পরে কে যেন আলো-ছায়ার [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible] কতকটা সোনাবৌদির মতো। আমার বুক ঢিপ্ঢিপ্ [illegible] লাগলো। [illegible]

বড়দার গা ঘে'ষে দাঁড়িয়ে রইলুম। হাতের জালকাঠিটা বাঁ-হাত দিয়ে চেপে ধরলুম।

বড়দা আমার হাত ধরে ডুমুর গাছের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছে যেতেই মুখে দু'হাত চেপে ডুক্রে কে'দে উঠলো মেয়েটি। বড়দা অবাক হয়ে বললেন: এ কী, কুসুম তুই?

আমিও অবাক। কুসুম—মানে আমাদের কুসুমদি? গ্রামের রজনী প্রামাণিকের বিধবা মেয়ে। আমার চেয়ে বছর সাতেকের বড়ো। এই বন-বাদাড়ে কি করছেন তিনি? আমাকে বড্ড ভালোবাসেন—কতদিন ডেকে কাঁচা আম সরষে-বাটা দিয়ে মেখে খাইয়েছেন।

বড়দা ঝড়ের আগের ঝাউ গাছের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। নিবাত নিষ্কম্প। এক লহমায় কুসুমদি বড়দার দু'পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন: বড়বাবু, আমাকে বাঁচান।

একবার কট্মট্ করে লোমশ ভট্টাচার্যের দিকে তাকালেন বড়দা। কড়া গলায় বললেন: পালাবেন না। তাহলে রক্ষে নেই।

তারপর কুসুমদিকে বললেন: আয়।

আমরা বাড়ির দিকে রওনা হলুম। পেছনে ভীরু বিড়ালীর মতো লঘুপায়ে কুসুমদি। কই, ওর আঁচলে তো কিছু নেই! কী চুরি করলেন ওরা? আমি ভেবে কোনো কূল-কিনারা পেলুম না।

বাইরের উঠোন পেরিয়ে বড়দা বললেন: যা, বাড়ি চলে যা। এর পরে আর কোনোদিন ঘরের বাইরে যাবি তো বিছুটি দিয়ে পেটাবো।

আমার চোখ ছলছল করে উঠলো। ওরা চুরি করতে এলেও কিছু চুরি করেনি। লোমশ ভট্টাচার্যকে আমার ভালো লাগতো না। কিন্তু কুসুমদি? ওর যেমন লক্ষ্মী লক্ষ্মী চেহারা, তেমনি শান্ত স্বভাব। তবে বড়দা ওকে মারবেন বললেন কেন? বড়দার ওপর বড়ো রাগ হলো। পড়তে বসেও গুম হয়ে বসে রইলুম খানিকক্ষণ।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে দেখি মেয়ে-মহলে জটলা। মা, মাতঙ্গিনী কাকীমা, ছোট ঠান্‌দি, রাঙা ঠাকুরমা, কনকবৌদি। নিচু গলায় উত্তেজিত আলোচনা। আমি কাছে যেতেই সব চুপচাপ। মা তাড়া দিয়ে বললেন: যা, যা, পড়তে যা। শুধু মেয়েদের কাছে ঘুর্ঘুর্ করছিস্ কেন?

সবারই মুখ গম্ভীর, শুধু কনকবৌদির মুখে চাপা হাসি।

সেজদি, ছোড়দির কাছে গেলুম। ওরা চুপচাপ বসে আছে কিংবা এটা ওটা করছে। মুখ দেখে মনে হলো, ওরা সব জানে। আমার অভিমান উথলে উঠলো। দিদিরা তো আমার বেশি বড়ো নয়! ওরা সব বুঝলো, আর আমি কিছু বুঝলুম না। তবে কি আমি হাবা?

আমার দিকে তাকিয়ে সেজদি কাছে ডাকলো। বললো: পড়বি না?

আমি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।
—শোন্ ভাই, ছোটদের সব কথা জানতে নেই।
—তুই জানলি কেন? জান্‌লি কি করে?
—মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি বোঝে। ওদের বেশি বুঝতে হয়।

সেজদির মুখে এক অনাবিল শান্তশ্রী। ও কখনও মিথ্যে কথা বলে না। ছোড়দি ঘর ঝাঁট দিয়ে চলেছে। ওর কাজে কখনও ক্লান্তি নেই। একটা সংসারকে এই বয়সেই আগ্‌লে রাখতে পারে। এই মানিকজোড় দিদি না থাকলে আমি বোধহয় বাঁচতুম না। বছর সাতেকের ছোটবোন বুলু তখন মেঝেয় বসে পুতুল খেলছিলো। ওর চিবুক ছুঁয়ে আদর করলুম। বাবা যখন মারা যান ওর এক বছর বয়স। ওতো বাবাকে দেখেনি। সবাই আমার বড়ো, একমাত্র ওই আমার ছোট। তাই ওকে আমি বেশি ভালোবাসতুম। আমি যখন থাকবো না, তখনও যেন ও তার ছোড়দার ভালোবাসায় অবিশ্বাস না করে। বুলু বেঁচে থাকুক, এই আমার আবাল্যের কামনা।

পেয়ারাতলা দিয়ে প্রীতীশের কাছে যাচ্ছি। নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে কনকবৌদি ডাকলেন: শোনো।

ঘরে ঢুকতেই চোখে ঝিলিক মেরে বললেন: হ্যাঁগো, কুট্টি ঠাকুরপো, কাল নাকি এক জোড়া প্রেমিক ধরেছো?

—প্রেমিক?

কনকবৌদি হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন। এই তো সেদিন মাস্টারমশাই ইতিহাসের বই থেকে পড়ালেন পৃথিবরাজ-সংযুক্তার কাহিনী। বইতে বোধহয় এক জায়গায় প্রেমিক কথাটি ছিলো। আমি একটা পথ খুঁজে পেলুম।

—কুসুমদি কি মালা পরিয়ে দিয়েছিলো? যেমন সংযুক্তা দিয়েছিলো পৃথিবরাজের গলায়?

—মালা?

বৌদি হাসিতে ফেটে পড়লেন। কী সে হাসির দমক! নিজেকে সামলাতে পারছেন না।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম: প্রেম কাকে বলে, বৌদি?

হাসি চাপতে গিয়ে কনকবৌদি বিষম খেলেন। শেষে মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপলেন। ভুরু নাচিয়ে শুধোলেন: জানতে ইচ্ছে করে?

সরল বিশ্বাসে বললুম: হ্যাঁ।

কনকবৌদির মুখে আবার উচ্ছল হাসি। ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন: জান্‌বে, ভাই, জান্‌বে। বয়স আরেকটু বাড়ুক। তখন দুনিয়ার সব মেয়ের সঙ্গেই প্রেম করতে ইচ্ছে করবে। তদ্দিন সবুর করতে পারবে না, কুট্টি ঠাকুরপো?

আমার এই বৌদিটির সব ভালো। এমন প্রাণোচ্ছল মাধুর্যের খনি সংসারে

মেলা ভার। শুধু মাঝে মাঝে কেমন যেন শক্ত কথা বলে, রহস্যময় হাসি হাসে। তবু ছোট-বড়ো কাউকে কনকবৌদির কাছ থেকে খালি হাতে ফিরে যেতে হয় না। তিনি লক্ষ্মীর ঝাঁপি।

ঘর থেকে বেরোতেই প্রীতীশ খপ্ করে হাত ধরে ফেললো। বললো: চল্।

—কোথায়?

—বিচারসভায়।

—কোন্খানে বসবে?

—বাইরের আটচালা ঘরে।

—ছোটদের ঢুকতে দেবে না।

—সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। পেছনের বেড়ায় দুটো ফুটো করা হয়ে গেছে।

—ধরা পড়লে মার খাবো।

প্রীতীশ হাতে মোচড় দিয়ে বললো: তুই বড্ড ভীরু! আয় আমার সঙ্গে।

আমার এই ভাইটি মাত্র এক বছরের বড়ো। রক্তের সম্পর্ক দূরের, কিন্তু বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাছের। যেমন সাহস তেমনি বুদ্ধি। ভালো খেলে, উত্তম অভিনয় করে। আমি বরাবর ওর ছায়ানুচর।

যেতে যেতে বললুম: হ্যাঁ রে, কার বিচার? কে চুরি করেছে?

—লোমশ ভট্টাচার্যের।

আমি থমকে দাঁড়ালুম। কনকবৌদির কথা মনে পড়লো। তাহলে প্রেমিকের বিচার! কিন্তু প্রেম কি, কোথায় তার অপরাধ—তা-ই যখন জানিনা, তখন বিচারের কী বুঝবো? তবু থামলুম না, পায়ে পায়ে এগিয়ে চললুম। বোধহয় কনকবৌদির শেষ কথাটা অবচেতন মনে প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। আমারও নাকি একদিন দুনিয়ার সব মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে ইচ্ছে করবে!

আটচালা ঘরের ফুটোতে চোখ রেখে দেখলুম, তক্তপোশের ওপর গম্ভীর মুখে বসে আছেন সুরেনদাদু, চৌধুরীকাকা, চক্রবর্তীমশাই। এঁরা গ্রামের মাথা। এক কোণে উবু হয়ে বসে আছে বুড়ো রজনী প্রামাণিক। দরজার কাছে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে লোমশ ভট্টাচার্য। কুসুমদিকে দেখলুম না।

সুরেনদাদু এক সময় গম্ভীর মুখে বললেন: তাহলে তুমি, পরেশ, স্বীকার করছো তিন মাস ধরে চলছে তোমার এই লীলাখেলা?

লোমশ ভট্টাচার্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

—মেয়েটাকে জপালে কি করে?

—এক জোড়া ডুরে শাড়ি, দুটো সেমিজ আর এক শিশি আলতা আমি ওকে দিয়েছি।

—টাকা ?

—দেবো বলেছি, এখনও দিইনি।

সুরেনদাদু একটু ভাবলেন। তারপর ভারি গলায় বললেন : তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান। তোমার অপরাধ জঘন্য, অমার্জনীয়। তোমাকে জরিমানা দিতে হবে। দুকানি জমি তুমি মেয়েটার নামে লিখে দেবে, আর নগদ পাঁচশো টাকা। আর যদি ওর চরম ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে আরও দু'কানি জমি। কি হে, তোমরাও একমত তো ?

চৌধুরীকাকা ও চক্রবর্তীমশাই সায় দিলেন। লোমশ ভট্টাচার্য একটু ওজর আপত্তি তুলতেই চৌধুরীকাকা হুংকার ছাড়লেন : কালই জমি রেজেস্ট্রি করবে আর পাঁচশ টাকা আমার কাছে রেখে যাবে। একচুল নড়চড় হলে পরশু সন্ধেবেলায় কুসুমের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। আমার হুকুম।

জমিদারবংশের একমাত্র সন্তান চৌধুরীকাকা। ধনসম্পদ তলানিতে এসে ঠেকেছে, কিন্তু চেহারায় জৌলুস ও দাপট কিছুমাত্র কমেনি। তাঁর হুংকার শুনে লোমশ 'আজ্ঞে' 'আজ্ঞে' বলতে বলতে বেরিয়ে গেলো।

এইবার মুখ খুললেন চক্রবর্তীমশাই : ওহে রজনী, মেয়েকে সামলে রাখতে পারো না, কেমন বাপ তুমি ? নাপিতের ছেলে হলেও তুমি তো এখন দীক্ষিত বৈষ্ণব। আগামী সপ্তাহে কারো সঙ্গে মেয়ের কণ্ঠিবদলের ব্যবস্থা করবে।

সকলে গাত্রোত্থান করলেন। আমরাও পালিয়ে এলুম। অপরাধ একটা হয়েছে বুঝলুম, কিন্তু অপরাধটি কি মাথায় ঢুকলো না। কনকবৌদি যে প্রেমের কথা বললেন, তা কি অপরাধ ? তাহলে বড়ো হয়ে আমি প্রেম করবো কি করে ? অপরাধের জন্য জরিমানা করা হলো, কিন্তু বিয়ের কথা উঠলো কেন ? আমার বোধ ও বুদ্ধি ঘুরপাক খেতে লাগলো।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে শুনি, আগের রাত্রিতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন কুসুমদি। তিনি চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছেন।

মাথার মধ্যে গুবরে পোকাগুলি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। না, না, রাত্রি ভালো নয়—অন্ধকার ভালো নয়। ওরা ভয় ডেকে আনে, মৃত্যুর আসন পাতে, অপরাধের গুহা তৈরি করে। ভূত, যমদূত, রঘু ডাকাত, সিঁধেল চোর, মানুষনামধারী বিষপতঙ্গ তার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তাই দিনান্ত আমার চোখে বিভীষিকা। ছেলেবেলা থেকে আমার একমাত্র প্রার্থনা : আলো, আমার আলো।

● ●

ইস্কুলে প্রতি সপ্তাহে একটি করে ঘণ্টা থাকতো। সেটি ছিলো গল্পের ক্লাশ। এর আকর্ষণ ছিলো সব ছেলের কাছে সমান। কেউ রাস্তায় আছাড় খেতো না, কারো মাথা ধরতো না, বাবার নামে বাঁ-হাতে লেখা কোনো হাফ-ছুটির দরখাস্ত পেশ করতো না কোনো ছেলে। ক্লাশের সবগুলি বেঞ্চ থাকতো ভর্তি। সবাই চুপচাপ অপেক্ষা করতো, মনিটর নিরাময় সরকারকে বেত হাতে ঘুরতে হতো না সারা ঘর। টিচার আসতেন কোনোদিন লম্বু মহারাজ, কোনো দিন গোলপণ্ডিত। ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি ছাত্ররা মাস্টারমশাইদের নিজস্ব স্টাইলে নামকরণ করে থাকে। এই ব্যাপারে ক রো কারো মাথা ছিলো বেশ সাফ। নতুন টিচার আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যে নামকরণ-অনুষ্ঠান সমাপ্ত এবং বাকি পাঁচ মিনিটে ক্লাশের আদিগন্ত সর্বত্র প্রচারিত। তারপর দিন দুয়েকের মধ্যে সারা স্কুলে তিনি প্রতিষ্ঠিত হতেন নতুন নামের মহিমায়। তাঁর আসল নাম হয়ে যেতো অচল আধুলি। সেই ট্র্যাডিশন এখনও চলছে।

রাজেন চক্রবর্তী মশায় আছেন অনেক দিন থেকে। আমার দাদারাও পড়েছেন তাঁর কাছে। তিনি কেরানির কাজ করতেন, ড্রিল করাতেন, হাতের লেখা শেখাতেন। তাঁর হ্যাণ্ডরাইটিং ছিলো মুক্তোর মতো। লেখার ছিরি একটু এদিক-ওদিক হলে দেখিয়ে দিতেন কিংবা কান মলে দিতেন। তাই হাতের লেখার সুনাম ছিলো আমাদের স্কুলের ছেলেদের। একই হাতের লেখার উত্তর ভেবে একবার বিশ্ববিদ্যালয় দুবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খুব লম্বা, তাই কোনো এক কালিদাসের কালে কোনো এক রসিক ছাত্র তাঁর নাম দিয়েছিলো লম্বু মহারাজ। কিন্তু সবাই শ্রদ্ধা করতো। আমার মাথা ওঁর কোমর পেরোয়নি, কিন্তু ভালোবাসা দিয়ে তিনি আমাকে টেনে নিয়েছিলেন তাঁর বুক অবধি।

তিনি কোনো সময়েই এক ঢঙে পড়াতেন না, গল্প বলতেন না। নিত্য নতুন পদ্ধতি ছিলো তাঁর। আমি ক্লাসের ফার্স্ট বয়। একদিন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—দি ব্লু, দি ফ্রেস্, দি এভার ফ্রি—বল্ তো, এ কিসের বর্ণনা ?

কথাগুলি কার কোন্ কবিতার লাইন আমি জানতুম না। শব্দগুলি অর্থ মনে মনে ভেবে নিয়ে আমি বললুম—এ বর্ণনা সমুদ্রের হতে পারে, আকাশেরও হতে পারে।

—গুড্। এ সমুদ্রের বর্ণনা। তবে সমুদ্রের সঙ্গে আকাশের অনেক মিল আছে। কথাগুলি মনে রাখিস্।

নিত্য আকাশ দেখি, সমুদ্রও দেখেছি বার দশেক। মনে মনে মিলিয়ে

দেখেছি, লম্বু মহারাজের কথাগুলি কত সত্য তা মনে মনে উপলব্ধি করেছি। কবি সকলে হয় না, কেউ কেউ হয়। কিন্তু বিধাতা পুরুষ অল্পবিস্তর কবিমন সকলকে দিয়েছেন।

—সমুদ্রের গল্প বলুন, স্যার। কলম্বাসের গল্প বলুন।

—না, সে গল্প তোরা শুনবি ইতিহাসের ক্লাশে। এই ক্লাশ অন্য গল্পের।

—সেই অন্য গল্প শুরু করুন, স্যার।

—তোরা কন্যাকুমারীর নাম শুনেছিস্? সমুদ্রের ধারের মন্দির।

সন্তোষ উঠে দাঁড়িয়ে বললো : হ্যাঁ, স্যার, দক্ষিণ ভারতে। স্বামীজীর লেখায় পড়েছি।

—ধন্যবাদ।

আমি তখনও স্বামীজীর লেখা পড়িনি। কিন্তু সন্তোষ ওই বয়সেই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তো শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত, স্বামীজীর রচনা। পরে তিনি মহারাজ হয়েছেন। গার্হস্থ্য আশ্রমের দিনগুলির কথা তাঁর মনে আছে কিনা, কে জানে।

—শোন্ তবে কন্যাকুমারীর গল্প।

আমরা উৎসুক, উন্মুখ।

—দেবতাদের প্রয়োজনে একদিন কন্যাকুমারীর সৃষ্টি হয়েছিলো। শর্ত ছিলো, বিয়ে হলে দেবীর শক্তি চলে যাবে। একদিন শোনা গেলো শিবের সঙ্গে বিয়ে হবে তাঁর। দেবতারা প্রমাণ গুণলেন, বিবাহিতা কন্যাকুমারীর শক্তি চলে গেলে তাঁদের বিপদ থেকে ভবিষ্যতে রক্ষা করবে কে? তাঁকে চিরকুমারী রাখতেই হবে। নারদকে সব ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্য পাঠানো হলো। এদিকে বরবেশী শিবের প্রতীক্ষায় প্রতি পল গুণে চলেছেন কন্যাকুমারী। শিবের মতো বর চাওয়াটা প্রথাসিদ্ধ প্রার্থনা মাত্র, কিন্তু সেদিন কন্যাকুমারীর কাছে ছিলো জীবন-মরণ সত্য।

মাস্টারমশাই একটু থামলেন। আমাদের মনে তখন সাসপেন্স—কী হয়, কী হয়।

—কুমারী উমা শিবকে পেতে চেয়েছিলেন, মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন, তপস্যার গহণ গভীরতায় বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। আশুতোষ সন্তুষ্ট হলেন, দিলেন কুমারী-স্বপ্নকে সার্থক করার প্রতিশ্রুতি। দিন-ক্ষণ নির্দিষ্ট হলো। উমা সাজলেন, মনের মতো করে সাজলেন—চোখে আকুলতা, অধরে হাসি, বুকে আলোড়ন নিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন শুভ-ক্ষণের জন্য। বরবেশে শিবও যাত্রা করলেন যথাসময়ে, কিন্তু পথ আটকে দাঁড়ালেন নারদ—সকল রকমের নষ্টের কাণ্ডারী। ভোলানাথের মন ভোলাতে সময় লাগলো না, নারদের কথার ছলনায় প্রতীক্ষমানার কথা ভুলে গেলেন তিনি। যখন খেয়াল হলো তখন সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, উমার চোখের জলে

ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেছে। খবর এলো বিয়ে হবে না। কুমারীর হৃদয় বিদীর্ণ করে হাহাকার উঠলো, বেদনার বিপুল আঘাতে বুকের স্পন্দন হঠাৎ বেড়ে গিয়ে চিরদিনের জন্য থেমে গেলো। প্রেমিকা নারী পাষাণে রূপান্তরিতা হলেন। বিয়ের অন্ন ছড়িয়ে দেওয়া হলো চতুর্দিকে। এই ছড়ানো অন্নই হলো আজকের সমুদ্র সৈকতের শুভ্র সুন্দর বালুকারাশি, এই পাষাণী উমাই হলেন দেবী কন্যাকুমারী।

লম্বু মহারাজ থামলেন। তারপর সমস্ত ছাত্রদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন : দেবী কন্যাকুমারীর চোখ হীরের, সেই চোখ আজও জ্বলে। এই চোখের জ্যোতিতেই বিভ্রান্ত হয়ে পথ হারিয়েছিলেন এক পর্তুগীজ নাবিক। কন্যাকুমারীর গল্প যদি তোদের মনে থাকে, তবে আজও কেন দেবীর ফুলের অভিষেক হয়, বুঝতে পারবি।

ছুটির শেষে বাড়ি ফেরার সময় বারে বারে মনে পড়তে লাগলো কন্যা-কুমারীর কথা। ধর্ম কাকে বলে তখনও জানিনা, দেবীর এই গল্পে ধর্মের কোনো কথা আছে কিনা তাও বুঝতে পারিনি। তবু বুকের ভেতর যেন একটি অস্পষ্ট বেদনা অনুভব করলুম। আমার স্পর্শকাতর মনে কন্যাকুমারীর নিষ্ঠা যেন একটা ছাপ রেখে গেলো। সেই এগারো ছুঁই-ছুঁই বয়সে নিষ্ঠা কাকে বলে জেনে গিয়েছি। আমাদের শিক্ষাক্রমে আর যা কিছুরই অভাব থাক নীতিকথার অভাব নেই। পঞ্চতন্ত্র তো আমাদের পড়তেই হতো। সে রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, কন্যাকুমারীর পায়ে একগুচ্ছ ফুল রেখে প্রণাম করছি।

আরেক সপ্তাহে গল্পের ঘন্টায় লম্বু মহারাজ এলেন না। এলেন গোল পণ্ডিত। ভদ্রলোকের বয়স বেশি নয়। গ্র্যাজুয়েট কাব্যব্যাকরণতীর্থ। গোলাকৃতি মুখে একজোড়া সুচর্চিত গোঁফ। পরনে বিদ্যাসাগরী চটি। প্রথম দিনেই চিত্ত রায় জ্যামিতির কম্পাস দিয়ে একটি সার্কেল এঁকে দুটো চোখ ও একজোড়া গোঁফ বসিয়ে তলায় লিখে দিলো গোলপণ্ডিত। খাতাটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিভ্রমণ করে এলো প্রথম থেকে শেষ বেঞ্চ। পুরো স্কুলে নামমাহাত্ম্য প্রচার হতে পুরো দিনটাও লাগলো না। ইনিও ভালো শিক্ষক, যত্ন করে সংস্কৃত ও বাংলা শিখিয়েছিলেন।

রোল কল শেষ হতেই বীরেশ্বর বর্ধন উঠে দাঁড়িয়ে বললো : স্যার, আপনি শাক্ত না বৈষ্ণব ?

উনি মাছ-মাংস খান না আমরা সকলেই জানতুম। সকালে বিকেলে তিলকও কাটেন। তবু এ-প্রশ্ন কেন, প্রথমে বোঝা গেলো না।

—আমি দীক্ষিত বৈষ্ণব।

—তবে আপনার পকেটে মরা টিকটিকি কেন ?

চমকে গিয়ে গোলপণ্ডিত পকেটে হাত দিলেন। সত্যি একটা মরা টিকটিকি উঠে এলো। তাঁর চোখ ফেটে জল বেরোবার উপক্রম।

—স্যার, একটা বৈষ্ণবের গল্প যদি বলেন তবে মরা টিকটিকির কথা কাউকে বলবো না।

গোলপণ্ডিতের মুখে এক গাল হাসি। বললেন: ধর্মের গল্প তোরা ঠিক বুঝবি না। তবু বলছি, শোন্।

আমরা প্রতীক্ষা করে আছি। তিনি শুরু করলেন:

মীরার ভজন ভালো লাগে না এমন মানুষ ভূ-ভারতে নেই। আমার কিন্তু তার চেয়েও ভালো লাগে মীরার একটি গল্প। শৈশবে চেতনার প্রত্যুষে পিতমকে পেয়েছিলেন তিনি, তাঁর কাছে পালিয়ে যেতেন গভীর রাত্রিতে সকলের অজানায়—তাঁকে আকুল হয়ে বলতেন, মীরার প্রভু গিরিধরলাল, তোমার ভজন বিনা মানুষ গভীরতা হারিয়ে ফেলে। এই যে গোপালকৃষ্ণ—যাঁকে কখনো ভগবান, কখনো সন্তান, কখনো সখা, কখনো প্রিয় রূপে দেখেছেন বৈষ্ণব সমাজ তিনিই ছিলেন মীরার জীবনে একমাত্র সত্য। একদা এই পরম ভক্ত বৃন্দাবনে পরম ভাগবত জীব গোস্বামীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিলেন। গোস্বামীজী দেখা করতে অস্বীকার করলেন, বললেন, আমিতো প্রকৃতির সঙ্গে দেখা করতে পারিনে। মীরা শুনলেন, একটু হেসে ভাবের আবেগে বললেন—আমার কাছে আবার পুরুষ কে? সকলেই তো প্রকৃতি।

গল্পটি ছোট। শেষ হবেই বীরেশ্বর পণ্ডিত মশাইকে প্রণাম করে বললো: স্যার, মাফ করবেন। অন্যায় করেছি।

গোলপণ্ডিত হা-হা করে উঠলেন: কেন—কেন? অন্যায় কখন করলি?

—স্যার, আপনি যখন ক্লাশে আসছিলেন, তখন আমিই আপনার অলক্ষ্যে মরা টিকটিকিটা আপনার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

—কেন-কেন?

ওটা ওঁর মুদ্রাদোষ।

—যাতে আপনার কাছ থেকে একটা ভালো গল্প আদায় করে নিতে পারি। রাগ করবেন না, স্যার।

—গল্পের নেশা হয়েছিলো তো আমাকে এমনিতেই বলতে পারতিস্। রাগ? আমি একে বৈষ্ণব, তার ওপর মাস্টার। আমার কি রাগ করা চলেরে? ছাত্রের ওপর?

তাকিয়ে দেখি তাঁর মুখে আর কিছু নেই—শুধু নির্মল আনন্দ!

আমার মনটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো। উঠে গিয়ে পণ্ডিতমশায়কে প্রণাম করলুম।

—কেন—কেন? তুমি আবার কেন?

—স্যার, বৈষ্ণব হবো কিনা জানিনা। যদি মাস্টার হই, যেন আপনার মতো হই, এই আশীর্বাদ করুন।

পণ্ডিত মশায় মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু পরম আদরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

এক ছুটির দিনে চলে গেলুম মঠখোলায়। ওটা মাইল তিনেক দূরে একটা চৌরাস্তার মোড়। পর পর তিনটি পুরনো মন্দির। শিব, কালী, বিষ্ণুর। কে কবে মন্দিরগুলো বানিয়েছিলেন জানি না। স্থাপত্যশিল্পের 'আহা মরি' নিদর্শন না থাকলেও মন্দ নয়। দেখবার মতো এখনো কিছু আছে। পুজো হয়, নিষ্কর জমির স্বত্ব নিয়ে একটা পুরুতবংশ আছে। বিষ্ণু মন্দিরের পড়ো-পড়ো অবস্থা, কালী মন্দির কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে সগৌরবে বিরাজ করছে শিব মন্দির তার গম্বুজওয়ালা গড়ন নিয়ে। শিবরাত্রিতে ওখানে মেয়েদের খুব ভিড় হয়। আমিও অনেকবার গিয়েছি মায়ের সঙ্গে।

প্রথমেই ঢুকলুম শিব মন্দিরে। আদ্যিকালের মন্দিরের সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে ঘিয়ের বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি নিরাভরণ লিঙ্গমূর্তির দিকে। দেবতাকে খুঁজছি—কোথায় শ্মশানবাসী ভস্মাচ্ছাদিত সর্বত্যাগী শিবশঙ্কর? কিন্তু হায়, বালকের কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেবতা ধরা দিচ্ছেন না।

ছুটে গেলুম তারই পাশে বিরাট কালী মন্দিরে—প্রথমেই চোখে পড়লো তার বহিঃসৌষ্ঠব। দেয়ালে কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে এখানে সেখানে লালের ছোপ। অভ্যন্তরে নিরন্ধ্র অন্ধকার, তারই মধ্যে দেখা গেলো রণরঙ্গিণী শক্তির রক্ত-জিহ্বা আর লোহিতবর্ণ নুমুণ্ডমালা। আলো জেবলে দেখলুম দেয়ালে আঁকা ভয়ঙ্করীর ধ্বংসের সাধনার ইতিহাস—দেবীর চোখে উৎকট উল্লাস, পথে ঘাটে নরকঙ্কাল। আশেপাশে মাংসলোভী সারমেয় আর শৃগালের দল। কেমন একটা ভয়ে গা ছমছম করে উঠলো।

অন্যদিকে শ্বেতবর্ণের বিষ্ণু মন্দির। ভেতরে ত্রিভঙ্গ মুরলীমনোহর—কণ্ঠে তুলসীর মালা, কটিতে ধবলকমলের মেখলা। চোখের দৃষ্টিতে কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা, হাতের ভঙ্গিতে বরাভয়। শেজের আলোকে দেবতার সৌম্য সুপ্রসন্ন মূর্তি দেখে খুশি হয়ে ছুটে গেলুম পুরুত ঠাকুরের কাছে। আদর আবদার করে, সুরেনদাদুর ভাণ্ডার থেকে আফিং এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জানতে চাইলুম এই দেবতাদের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। কিন্তু ঠাকুর মশায়ের দৃষ্টি যতটা দেখা গেলো চালকলার দিকে ততটা দেবতাদের দিকে নয়।

আমার অভিমান হলো, চোখ জলে ভরে উঠলো। রাগ করে মন্দিরে আর না যাওয়ার সংকল্পও করে ফেললুম। আজ মর্মে মর্মে বুঝেছি, বালকের কৌতূহলকে অতৃপ্ত রাখার চেয়ে বড়ো অপরাধ আর নেই।

ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আমার মন ভালো নেই। কাল মনের শূন্য ঝুলি নিয়ে ফিরে এসেছি। আমাদের বাস পুরনো জমিদার বাড়িতে। ভ্রাতৃহীনা

ঠাকুরমার পিত্রালয়ে। এখন দিন আনি দিন খাই অবস্থা হলেও একদিনতো সবই ছিলো। সেরেস্তা, প্রজাকুল, পাইক বরকন্দাজ, দেউড়ি, পাহারাদার। কিন্তু আশ্চর্য, জমিদার চৌধুরীবংশ বা জামাইবংশ আমাদের কোনো কুলদেবতা ছিলো না। বাইরের মহলে জীর্ণ অবস্থায় সেরেস্তাখানার ভগ্নাবশেষ দেখেছি, কিন্তু কোনো মন্দির দেখিনি। দোল-দর্গোৎসব কোনো কালেই হতো না। কায়স্থ আন্দোলনের সময় ঠাকুর্দা পৈতে নিয়েছিলেন বলে কুলগুরু আমাদের পরিত্যাগ করেছিলেন। বিধবা হয়ে মাকে দীক্ষা নেওয়ার জন্য যেতে হয়েছিলো কলকাতায় মহানির্বাণ মঠে। তবে কি আমরা বংশগতভাবে ভক্তিহীন মন্ত্রহীন ব্রাত্য? আমার বাবাকে যতটা মনে পড়ে পুজো-আচ্চা করতে দেখিনি। দাদারাও তাই। ব্যতিক্রম শুধু মা। তিনি রামায়ণ মহাভারত সুর করে পড়তেন, বার্ষিক লক্ষ্মী ও সরস্বতী পুজো দিতেন, মাঝে মাঝে শনি ও সত্যনারায়ণের পুজোর ব্যবস্থা করতেন। নারায়ণকে তুলসী দিতেন সন্তানদের কল্যাণ-কামনায়।

মায়ের নির্দেশে প্যান্ট ছেড়ে আমি শনির পাঁচালী পড়েছি। উনি নাকি খুবই রাগী দেবতা। পাঁচালী পড়বার সময় ভয়ে বুক ধুক্‌ধুক্‌ করতো। কোনো অনাচার না হয় সেদিকে মা কড়া নজর রাখতেন। আর প্রসন্নমনে সুর করে পড়েছি লক্ষ্মীর পাঁচালী—

শারদ পূর্ণিমা নিশি নির্মল আকাশ।
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয় বাতাস॥
লক্ষ্মীদেবী বামে করি বসি নারায়ণ।
কহিতেছে নানা কথা সুখে আলাপন॥

একদিন স্কুলে গিয়ে শুনলুম, বন্ধুরা সব যাচ্ছে মেহেরের মেলায়। আমারও যেতে খুব ইচ্ছে করলো। মাকে এসে বললুম। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—আচ্ছা যাস্‌। তোর শীতলদার বাড়িতে গিয়ে উঠবি। সাবধানে থাকিস্‌। বলে একটা টাকা হাতে দিলেন। তার আগে দেখেছি, লোক ডেকে কিছু সুপুরি বিক্রি করেছেন।

ফুলদা অনিন্দ্য পড়ছিলেন। স্কটিশে পড়েন। বি.এ. পরীক্ষা আসন্ন। এখন বাড়িতে বসে পড়েছেন। মেঘনাদবধ, মার্চেন্ট অব ভিনিস। আর পাঠ্য বইয়ের তলায় লুকানো থাকতো আরও দুটো বই। একটার লেখকের নাম বানান করে পড়ে ফেলেছি—Marx. আর একটা নাম পড়তে গিয়ে কয়েকবার হোঁচট খেয়েছিলুম—Trotsky.

তিনি বললেন: মেহের যাচ্ছিস্‌ কেন? ধুলো খেতে?

—ওটা তো সিদ্ধপীঠ।

—সিদ্ধপীঠ কাকে বলে জানিস?

আমি বন্ধুদের মুখে কথাটা শুনেছি। তোতাপাখির মতো উচ্চারণ

করেছি। ওর মানে ভেবে দেখার প্রশ্ন মনে জাগেনি। বিমর্ষমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।

দু'দিন পরে মেলা থেকে ফিরে সরাসরি ফুলদার ঘরে ঢুকলুম। বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলে উঠলুম সিদ্ধপীঠ কথাটার মানে জেনে গেছি।

—কী, বল্‌ ?

—তাহলে একটা গল্প শোনো। বলছি—

ঘোর অমাবস্যা নিশীথে এই জনমানবহীন প্রান্তরে শক্তি সাধনা করেছিলেন সর্বানন্দ, শবাসনে বসে কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার থেকে সহস্রারে নিয়ে যাওয়ার তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধিলাভের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরাতন ভৃত্য পূর্ণদার আত্মাহুতির অবিস্মরণীয় কাহিনী। হয়তো শক্তির ডাক এসে পেঁৗছেছিলো এই অজ্ঞান অভাজনেরও মনে—শুনেছি এমনি করেই ভগবানের ডাক এসে পেঁৗছায় স্বভাবভক্তের হৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে—তাই অকিঞ্চন পূর্ণদারও পুজোর ফুল হাওয়ার বাসনা জেগেছিলো। পুণ্যতিথিতে সন্ধ্যার পরেই সে স্নান সেরে নিলো, পট্টবস্ত্র পরে ফেললো, কপালে সিঁদুরের তিলক কাটলো, হাতে নিলো রাঙা জবা। তারপর ধীরে ধীরে সাধন-পীঠের দিকে এগিয়ে গেলো, সাষ্টাঙ্গে আরাধ্যকে প্রণাম করতে গিয়ে মাথা ছোঁয়ালো মাটিতে। কিন্তু মুহূর্তমাত্র দেরী করলেন না সর্বানন্দ, হয়তো বারেকের জন্য হাতও কাঁপলো না এই কাপালিকের। শাণিত খড়্গের আঘাতে পূর্ণদার ধড়ের সঙ্গে মুণ্ডের চির-বিচ্ছেদ ঘটে গেলো। তারপর সেই শবের ওপর বসে তপস্যায় রত হলেন সাধক। আসন ছাড়তে প্ররোচিত করবার জন্য, ভয় দেখাবার জন্য, বারে বারে ভূত-প্রেত, জন্তু-জানোয়ার আসতে লাগলো—এমন কি সশরীরে স্বয়ং পূর্ণদা এসে তাঁকে ডাকতে শুরু করে দিলো। তবু শবাসন ছেড়ে উঠলেন না সর্বানন্দ, কারণ আত্মাহুতির আগে পূর্ণদা নিজেই এ উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলো। অবশেষে সিদ্ধিলাভ ঘটলো পরম তান্ত্রিকের।

গল্প শুনে ফুলদা খানিকক্ষণ হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মাকে ডেকে বললেন : ধর্মে আমাদের মতি নেই বলে তোমার তো বড্ড দুঃখ। ভেবেছিলুম, খাওয়ার সময় সামনে একটা মাথার খুলি নিয়ে বসবো। এক সময় মিশরে নাচগান পানের আসরে নরকঙ্কাল দেখানো হতো। মানুষের জীবনের শেষ পরিণতির রূপ দেখিয়ে আসক্তি ও ভোগের মধ্যে বৈরাগ্য সঞ্চারের জন্যই এ ধরনের ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, মাথার খুলি নিয়ে খেতে বসার আর দরকার নেই। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মেছে। তোমার ছোট ছেলে আকন্দ।

কথাগুলি শুনে মায়ের চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

বললেন : আক্কে আর ঠ্কিস্ না। ওই তো প্যাকাটির মতো চেহারা। বাঁচবে কিনা কে জানে।

মা থামলেন।

—আর আমার কথা বল্ছিস ? তোদের ঘরে আসার পর কী দিয়েছিস্ তোরা ? কী দিয়েছেন তোর বাপ-ঠাকুর্দা ? পেয়েছি তো শুধু অনাহার আর অনিদ্রা। আমার কপালই মন্দ, তা না হলে জন্ম দিয়েই মা মরে যাবেন কেন ? ভাইয়েরাই বা বাপের দেওয়া চার আনা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে কেন ? বিয়াল্লিশ বছরে কপাল পুড়েছে, তোর বাপ তো ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলেন। আমার বাকি জীবন কাট্বে কি নিয়ে ? শুধু ছেলেমেয়ের ধকল সয়ে ?

মা একটু হাসলেন। ফুলদার মুখে রা নেই।

—এই তো সেদিন কোথা থেকে একটা মুরগী ধরে নিয়ে এসে কেটে খেলি। কিছু বলিনি। তোদের ধর্ম তোদের। আমার ধর্ম আমার। মাঝে মাঝে সংস্কারের কথা বলিস্। ওটা কাটানো বড়ো শক্ত রে!

ফুলদা আস্তে বললেন : তোমাকে আঘাত করতে চাইনি, মা।

—তোরা আর কি আঘাত দিবি ? যা দেওয়ার তা দিয়েছে অদৃষ্ট। মাথার দিব্যি রইলো, ধর্ম নিয়ে আর কখনও খোঁটা দিস্নি। ওটা আমার শূন্য মনের আশ্রয়। ওই সত্য নিয়েই আমি ভবের লীলা সাঙ্গ করে যেতে চাই।

মা আমার বেশি লেখাপড়া করেননি। বাংলা লিখতে পড়তে পারতেন মাত্র। দিনে একবার অষ্টোত্তর শতনাম করতেন এবং রামায়ণ বা মহাভারত পড়তেন। তবে এত কথা ভাবতে শিখলেন কি করে ? আমি এইটে উঠতে যাচ্ছি, পরীক্ষায় কখনও দ্বিতীয় হইনি। কই, একটা কথাও তো আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারলুম না! মায়ের শেষ কথাগুলিরই বা অর্থ কি ? ধর্ম কি সত্য ? ধর্ম কি শূন্য মনের আশ্রয় ?

স্কুলে গিয়ে লম্বু মহারাজকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন : তুমি এখনো ছোট, বুঝবার বয়স হয়নি। বড়ো হলে সব বুঝবে। এখন পড়ো, ভেবো না।

● ●

মানুষ বিধাতার অযাচিত আশীর্বাদের মতো পায় দুটি জিনিস—মাতা ও মাতৃভূমি। আমার স্নেহময়ী মা আমাকে দিয়েছেন অনেক—আকাশ যেমন দেয় মাটিকে, মাটি যেমন দেয় গাছকে। যে শিশু সকাল-সন্ধ্যায় বাইরে খেলে বেড়ায়, সেও মাঝে মাঝে এসে ছুঁয়ে যায় মাকে। তাতে সে পায় নতুন করে খেলবার আশা ও ভরসা, সাহস ও শক্তি। আবাল্য মা আমার জীবনের অক্ষয় নিশানা। কিন্তু যে মাতৃভূমির চিন্ময় জঠরে আমি বড়ো হয়েছি, যার মাটি আর আকাশের দাক্ষিণ্য ছড়িয়ে আছে আমার জীবিত চেতনায় সেই মৃন্ময়ী মাকে কি কখনো ভুলতে পারি? আমার জন্মভূমি আজ স্মৃতিমাত্র। সেই স্মৃতির পথ বেয়ে যখন পেছন ফিরে তাকাই, তখন কত কথা মনে পড়ে!

বর্ণপরিচয়ে পড়েছি ষড়ঋতু বারো মাসে ক্রমে ক্রমে আসে। মাস্টার-মশাইরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এক এক ঋতুতে প্রকৃতির একেক রূপ। কিন্তু গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের রূপ ও অনুভবের কথাই শুধু মনে আছে। আমার প্রাক্-যৌবন জীবনের চেতনায় দাগ রেখে গেছে এরাই। শরৎকেও ঠিক ভুলতে পারিনি—যদিও তার সঙ্গে প্রগাঢ় ভালোবাসা কখনো হয়নি। বর্ষণ-ক্লান্ত নভোনীলে সাদা মেঘের ময়ূরপঙ্খী ভাসতে দেখেছি। কল্পনায় দেখেছি ওরই মধ্যে ঘুমিয়ে আছে রূপকথার রাজকন্যারা। বাড়ির উঠোনে শিউলি গাছের তলায় ঝরা ফুলের শুভ্র ফেনা ছড়িয়ে থাকতো। কোঁচড়ভরে ফুল কুড়িয়েছি, তার মৃদুমন্দ গন্ধে মন খুশি-খুশি হয়ে উঠেছে। নদীর ধারে কাশফুলের বনে ঘুরে বেড়িয়েছি—আহা, পেঁজা তুলোর মতো কী নরম নরম! কিন্তু শরতে আমার অধিবাস কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ও যেন ক্ষণিকের অতিথি, আজ আছে কাল নেই।

কিন্তু হেমন্ত আর বসন্ত নিয়ে আমি কখনো অশান্ত হইনি। ওরা কখন এসেছে' কখন গেছে টের পাইনি। দুর্গাপুজো লক্ষ্মীপুজোর সময় মাঝে মধ্যে কুয়াশা দেখেছি। মাঠের আল দিয়ে যেতে যেতে ভাঙা শামুক, মরা শালিখ, ছড়ানো ছিটানো খড়, ঢোঁড়া সাপের খোলস চোখে পড়েছে। বিকেলে ঘর-ফেরা পাখির ডানায় মিয়ানো আলোর বিষণ্ন আভাসও নজরে এসেছে। কিন্তু ঋতুমানীর সেই সূক্ষ্ম পরিবর্তনের টান কিশোর-বালকের হৃদয় পর্যন্ত গিয়ে পোঁছোয়নি। কার্তিক অঘ্রান হয় পেছিয়ে এসে শরতের মহোৎসবের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে রাখতো, নয় এগিয়ে গিয়ে শীতের বালাপোশের মধ্যে মুখ লুকিয়ে রাখতো। তাই হেমন্তিকার সঙ্গে আমার তেমন কিছু শুভদৃষ্টি বিনিময় হয়নি।

পঞ্জিকা মতে, ফাল্গুন-চৈত্র দুই মাস বসন্তকাল। হরিদাসী বৈষ্ণবীর মুখে গান শুনেছি—ফাল্গুনে পূর্ণিমা-নিশি, উদয় হৈল গৌরশশী। গৌরাঙ্গের জন্মতিথির সেই ফাল্গুন, সেই পূর্ণিমার রাত আমাকে বরাবর ফাঁকি দিয়ে গেছে। রক্তপলাশের রাঙা শিখা দেখেছি মাঘ থেকে—সরস্বতী পুজোর সময় থেকে। কিন্তু সেই পলাশে বন-বাদাড় লালে লাল হয়ে থাকতে থাকতে কখন্ মাঘ গড়িয়ে ফাল্গুনে পড়েছে, খেয়ালই হয়নি। আমাদের পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে রক্তাশোক ছিলো না, ছিলো না শিরীষ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কনকচাঁপা। তাই ফোটা ফুলের মেলা দেখে কখনও ভাবার সুযোগ পাইনি আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। ফুল ছিলো, কিন্তু সেগুলি বারমেসে ফুল। তাই হাওয়ায় ভাসতো না কোনো পুষ্পগন্ধ। এলোমেলো হাওয়া বইতো বিকেলের দিকে—তাই দখিন হাওয়ার পথের ভাষা আমার জানা ছিলো না। যৌবনদশা হলে হয়তো ফুলন্ত গাছের গান শুনতে পেতুম, বনে বনে ফাল্গুন লাগার খবর এসে পৌঁছোতো, জলে স্থলে জাদুকরের ভেরি শুনে জীবনে বান ডেকে আসতো। কিন্তু আমি ছিলুম কখনো বালক, কখনো কিশোর। আমার মনে কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরীর কোনো ডাক ছিলো না। মাঘ শেষ হতে না হতেই গরম হাওয়া শুরু হয়ে যেতো, রোদের তেজ বাড়তো অবিশ্বাস্য রকম, সবিতৃদেব সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলতেন সূর্যসেনার বর্শা হেনে। ঘাম শুরু হয়ে যেতো, ঘর্মক্লান্ত দিনরাত্রিগুলো অসহ্য মনে হতো। হাঁসফাঁস করতুম। মহকুমা শহরই বিজলী আলোর মুখ দেখেনি, গ্রাম গঞ্জ কোন্ ছার! ফাল্গুনের শুরু থেকে আষাঢ়ের শুভারম্ভ পর্যন্ত ছিলো আমাদের গ্রীষ্মকাল।

আজো মনে পড়ে চৈত্রের দিনে যখন চতুর্দিকে উত্তপ্ত হাওয়ার ছোবল তখনো ভদ্রাসনের অদূরে সুপুরি বাগানে, জলভরা পরিখার ধারে, আমগাছের তলায় শীতল-পাটি বিছিয়ে অলস মধ্যাহ্নের আমেজ উপভোগ করেছি। বুকভরে নিয়েছি আমের বোলের গন্ধ, চোখ মেলে দেখেছি লহরের অপরপাশে হিজলের ছায়ায় বালিহাঁসের ঝাঁক। কান খাড়া শুনেছি ডাহুকের ডাক, দৃষ্টি মেলে দেখেছি পানকৌড়ির ডুব-ডুব খেলা। কখনো হয়তো চোখে নেমেছে ঘুমের আবেশ, পাতা-ঝরানো হাওয়ার মৃদু স্পর্শে পেয়েছি নবনিদাঘের আস্বাদ। চারদিকে প্রকৃতির খেয়ালের খুশিতে সবুজের সমারোহ, মাথার ওপরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে অকৃপণ আকাশের সাবকাশ উঁকিঝুঁকি। গাছের গা বেয়ে উঠছে নাম্‌ছে গিরগিটি, ছায়াচ্ছন্ন পাতার আড়ালে ঘুমুচ্ছে টিয়ে পাখি—দোয়েল। বেতের ঝোপে, বাঁশের ঝাঁড়ে, ঘরের খড়ো চালে লাউডগা সাপের নির্ভয় বিচরণ দেখে প্রথম প্রথম শিউরে উঠতুম। নৈদে মালীর মেয়ে রোহিণীকে যখন পাট খেতে সাপে ছুবলে মারলো তখন সাতদিন অনেক ঘুরে বড়ো রাস্তা দিয়ে স্কুলে গেছি, মাঠ পেরিয়ে পথের দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করিনি। রোহিণী ডাঁশা মেয়ে, আর আমি হাড়-জিরজিরে আকন্দ। আমার জন্য একটা পুরো

ছোবলও লাগবে না। কিন্তু বয়স বাড়ার সংগে সংগে বুঝেছি—বনের জীব-জন্তুরও ভয় আছে, না ঘাঁটালে ওরা নিরীহই থাকে। আমার স্মৃতিতে অক্ষয় আছে একদিনের একটি দৃশ্য, সাপ আর বেজির লড়াই। জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছিলো কিংবদন্তী অনুযায়ী। মৃত সাপের মাথাটি পরীক্ষা করে বুঝলুম, ওটি ছিলো জাত গোখ্রো।

এক গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ। দৈনন্দিন রীতি অনুযায়ী শেষ পিরিয়ড ছিলো ভূগোলের। শিক্ষক বসিরউদ্দিন সাহেব। ছেলেরা এই সময়ে থাকতো ঘর্মাক্ত ক্ষুধার্ত। পৃথিবীর আকার গোল না চ্যাপ্টা, ভূত্বক কাকে বলে, হিমবাহ বলতে কী বোঝায়, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার পার্থক্য কোথায়, উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুর আবহাওয়া কেমন ইত্যাদি নীরস বিষয়ে মনঃসংযোগ করবার মতো মনের অবস্থা কারো থাকতো না। কিন্তু সবাই ভয় করতো বসিরউদ্দিন সাহেবকে। কেউ খাতায় হিজিবিজি আঁকলে তিনি এঁকে দিতেন ব্যাঙ, তলায় নাম সহ। পরের দিন থেকে ছাত্রটির নতুন নাম হয়ে যেতো ব্যাঙ। কেউ গুন্‌গুন্‌ করে সুর ভাঁজলে তিনি তাকে ডেকে আনতেন টেবিলের কাছে, বলতেন—শোনাও একটি ভাটিয়ালি। অর্থাৎ যার যাতে অন্যমনস্কতা তা হাতিয়ার করেই তাকে আঘাত। শাস্তিদানের এই পদ্ধতিটি ছিলো তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার। এর সুফল তিনি দেখেছিলেন।

সেদিন আমার পড়া শুনতে ভালো লাগ্‌ছিলো না। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলুম, বাইরে কম্পাউণ্ডে সারি সারি ঝাউগাছের মাথা দুল্‌ছে। যেন রোগতপ্ত পৃথিবীকে হাওয়া করছে গাছগুলো। ভালো লাগছিলো।

এমন সময় জলদগম্ভীর স্বরে আওয়াজ হলো: ওহে ফাস্টো বয়, লাস্টো বেঞ্চিতে বসে কী করা হচ্ছে?

পাশের ছেলে চিত্ত মজুমদার সোৎসাহে বলে উঠলো: স্যার, আকন্দ, কাব্যি লিখ্‌ছে।

বসিরউদ্দিন সাহেব মনিটরের দিকে তাকালেন। নিরাময় রাবণের মতো দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে নিয়ে নিলো খাতা। আমি লজ্জা ও ভয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলুম।

কাছে যেতেই আদেশ: মনিটর, উচ্চস্বরে পড়ো।

নিরাময় পড়তে শুরু করলো:

> দীর্ঘকায় ঝাউ দেয় হাওয়া ঝিরিঝিরি,
> মনের ময়ূর নাচে আনন্দ বিতরি॥

—হুঁ।

বলে সীতাহরণের স্টাইলে খাতাহরণ করে বসির সাহেব খস্‌খস্‌ করে কী লিখতে শুরু করে দিলেন। লেখা শেষ হলে আবার আদেশ: পড়ো

নিরাময় সর্দার-পড়ুয়া। বসির-সরকারের কমাণ্ডার-ইন-চীফ্‌। সরকারের

হুকুমনামা তার শিরোধার্য। সে যেন যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে পড়ে গেলো—

ওহে কপি, করছো বসে কথার আদ্যশ্রাদ্ধ,
তোমার জন্য রইলো জমা বেতের বরাদ্দ।
লিখছো যদি ধরলে কেন ঢ্যাঙাপারা ঝাউ,
ছিলো না কি ঘরের চালে নধরকান্তি লাউ?

সমস্বরে ছেলেরা চীৎকার করে উঠলো: কপি! কপি!

আমার চোখে তখন জল। যেন লক্ষ্মণের শক্তিশেল ঘটে গেছে। বেঞ্চ, দু'হাতে ধরে কাঁপতে লাগলুম। কবিকর্ম হয়ে গেলো বানরকর্ম। এই সেদিন বন্ধু রণেশ দাসকে গল্পটা করতেই তিনি বঙ্কিম স্টাইলে বললেন, বসির সাহেব ঠিকই বলেছিলেন। কপি ও কবি একজাতীয়—একজন কলা খায়, অন্যজন কলা খাওয়ায়।

স্কুল থেকে মন্থর পায়ে ফিরে এলুম। মনে জগদ্দল পাথর, চোখে রক্তের ছোপ। খেলতে গেলুম না। খিড়কির পুকুরের ধারে গাছের হেলানো ডালে পা ঝুলিয়ে বসে রইলুম। কলসী কাঁখে নিয়ে ঘাটে এলেন কনকবৌদি।

—কিগো কুট্টি, মুখ ভারি কেন?

আমি নিরুত্তর।

বৌদি কলসী মাটিতে রেখে এগিয়ে এলেন। হেলানো ডালটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমার চিবুক ধরে মুখটা ওপরে তুলে বললেন: আমার চোখের দিকে তাকাও তো ভাই। দেখি না হেসে পারো কিনা!

আমি ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেললুম।

কনকবৌদি অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর আদুরে গলায় বললেন: কী হয়েছে রে তোর?

বৌদি আদরের ছলে আমাকে কখনো কখনো তুই বলতেন।

—বৌদি আমি দেখতে খারাপ। কিন্তু তাই বলে আমি কি কপি?

—কে বলেছে?

—বসিরউদ্দিন সাহেব।

—কি করেছিলি?

—ক্লাশে বসে দু'ছত্র কবিতা লিখেছিলুম। কাল থেকে ছেলেরা আমাকে কপি বলে ডাকবে। আমি আর স্কুলে যাবো না, বৌঠান।

—পড়ার সময় কবিতা লিখতে গেলি কেন?

—অসহ্য গরমে ভূগোলের কর্কটক্রান্তি ছেড়ে এস্কিমোদের বরফের দেশে চলে যেতে ইচ্ছে করছিলো। জানালা দিয়ে দেখলুম ঝাউয়ের মাথায় পাখার বাতাস। আচ্ছা বৌদি, কবিতা লেখা কি অপরাধ?

বৌদি রহস্যময় হাসি হেসে বললেন: এইতো দেখছি, কচি খোকার মুখে

বোল ফুটেছে। কে বলে আকন্দে মকরন্দ নেই! কিন্তু ভাই কবিতা লেখা অপরাধ কিনা, এক কথায় রায় দিতে পারবো না। পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

বলে কলসী জলে ডোবালেন। শূন্যকুম্ভ ভক্‌ভক্‌ শব্দে ভরে উঠলো।

—কী পরীক্ষা চাও, বৌদি?

কুম্ভভরণী অপাঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: আমাকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারো?

আমি লাফিয়ে উঠলুম: পারবো, বৌঠান, পারবো! তুমি কলসী রেখে এসো, ফিরে এসে দেখবে আমার কবিতা একদম রেডি।

কনকবৌদি বোধহয় ইচ্ছে করেই একটু দেরি করে এলেন। হাতে এক গুচ্ছ বাসনপত্র। ওগুলি ঘাটে নামিয়ে হাত ধুলেন। না তাকিয়েই বললেন: কবির কি কাব্যচর্চা শেষ?

—হ্যাঁ। পড়বে?

—তুমি নিজেই পড়ো।

—শোনো বৌঠান—

কনকচাঁপা রইলে ছাপা পাতার আড়ালে,
পথিকবঁধু বুকের মধু লুটবে সকালে।
গন্ধরাশি হাওয়ায় ভাসি করছে হাহাকার,
মুগ্ধরবি ভক্তকবি জানায় নমস্কার॥

স্পষ্ট দেখলুম বৌঠানের দু'চোখ আনন্দে চিক্‌চিক্‌ করে উঠলো। তিনি ঘাট থেকে উঠে এসে আমার দু'গালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন: তুমি কপি নও, কবি। কুট্টি নও, কুট্টিম।

হঠাৎ বৌঠানের চোখের আলো নিভে গেলো।

—কী হলো, তোমার?

—কনকচাঁপা যে শুকিয়ে গেছে!

—তার মানে?

—সে তুমি বুঝবে না, ভাই।

আমাদের ওদিকে কুট্টি মানে ছোট। কিন্তু কুট্টিম মানে জানতুম না। বৌঠান কি আমাকে ঠাট্টা করলেন?

—কুট্টিম মানে কি, কনকবৌদি?

—আমি কিচ্ছু জানিনে, কুট্টি ঠাকুরপো। তোমার লম্বু মহারাজকে জিজ্ঞেস করে নিও।

—সে কি! তুমি যে ফার্স্ট ডিবিসনে ম্যাট্রিক পাশ করেছো!

—আমার সে চোতা কাগজখানা বাসনমাজার জলে নষ্ট হয়ে গেছে।

—মানে?

—আবার মানে! আমার কথার মাথামুণ্ডু নেই, ধরে নিও।

বাসনের পাঁজা তুলে নিয়ে কনকবৌদি পা বাড়ালেন। চলতে চলতে বললেন: রামায়ণ পড়েছো?

—পড়েছি। মাকে রোজ পড়ে শোনাই।

—তাহলে অশোকবনে বন্দিনী সীতাকে নিয়ে কবিতা লিখে আমাকে দেখিয়ো।

কথাটার অর্থ বুঝলুম। রেগে গিয়ে বললুম: আমি কবি হবো না, কপি হয়েই থাকবো। ল্যাজের আগুনে লঙ্কা পুড়িয়ে দেবো।

—না গো, বীরপুরুষ, না। বড়ো হয়ে তুমি সীতাকে উদ্ধার করে এনো।

কনকবৌদি দ্রুত পায়ে চলে গেলেন। তাঁর চোখে জল ছিলো কিনা কে জানে!

বৈশাখ মাসে যখন ঈশান কোণ থেকে ভূশণ্ডীর কাকের মতো কালো মেঘের পালক পরে খরবায়ু ধেয়ে আসতো তখন শিমুল ফেটে ফেটে গুচ্ছ গুচ্ছ তুলো আকাশে উড়তো। হারিয়ে যেতো। তেমনি আমার দীর্ঘায়ু গ্রীষ্মের চম্পাকলি কৃষ্ণকলি দিনরাত্রিগুলি হারিয়ে গেছে চিরদিনের মতো।

এবার বর্ষার কথা বলি।

দুরন্ত সূর্যতাপে মাঠঘাট ফেটে চৌচির। রোদজ্বলা আকাশে তখন সাপের নিঃশ্বাস। দিনান্তে অন্ধকারের ঢল নেমে আসার পরও মাটির উত্তাপ ঠাণ্ডা হতে সময় লাগতো। সেকালের নায়িকারা চন্দনলেপনে বিরহজ্বালা দূর করতেন। গ্রীষ্মমণ্ডলের বহ্নিজ্বালায় মন আইঢাই, শরীর হাঁসফাঁস করছে যখন, তখনকার ক্লান্তি দূর করতে পারে কোন্ স্নিগ্ধ শীতলতা? বৃষ্টি! বৃষ্টি! আকাশের সস্নেহ দাক্ষিণ্যের জন্য সকলের তখন শবরীর প্রতীক্ষা। আমাদের প্রত্যাসন্ন দয়িতা তখন দাদুরী।

কালিদাসের কালে হয়তো পঞ্জিকার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় আষাঢ়ের প্রথম দিবসেই নামতো বৃষ্টি। কিন্তু একাল বখাটে ছেলের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে চলে। তাই তৃষ্ণার্ত ভূতলের স্বর্গখণ্ডে ধারাবর্ষণ নামে হয় আগে, নয় পরে। হাল আমলের আবহাওয়াতত্ত্বে পাংচুয়েলিটি বলে কোনো কথা নেই রেলগাড়ির মর্জিমাফিক শুভযাত্রার মতো। এর ফল হয় বন্যা নয় খরা। কচিৎ গরবিনী ধনী ঘোমটা খোলেন আষাঢ়স্য প্রথম মিথুনলগ্নে। মধুমাধবী শিলাবৃষ্টি ছিলো এক অপ্রত্যাশিত উপহার—বরফকুচিতে রুচি ছিলো না আমার, কিন্তু অকালস্নানে ছিলো কী আনন্দ! কী আনন্দ! আমকাঁঠালের বাগানে ছুটে যেতুম, হুটোপুটি লুটোপুটি খেয়ে কুড়িয়ে চলতুম বৃন্তচ্যুত আমের অযাচিত সম্ভার। পাকা আমে পোকার গৃহবাস, কিন্তু কাঁচা আমে অঢেল অম্ল আস্বাদ। আমার সেই কিশোর বয়সের রসনার পক্ষে তা

ছিলো অমৃতির চেয়েও অমৃত। দিদিরা পা ছড়িয়ে যত্ন করে মাখতেন, আমি তীর্থের কাকের মতো পাশে বসে থাকতুম।

নামি নামি করে বৃষ্টি নামতো। প্রথমে নূপুর বাজিয়ে চলার মতো বৃষ্টি। তারপর মেঘের গহনকুঞ্জে বোধহয় বিরহিণী গোপকন্যারা চোখের জলের কম্পিটিশান চালাতেন। বর্ষা আসতো খালে বিলে মাঠে ঘাটে কালো মেয়ের কালো চোখে আর আকন্দ নামক একটি কীটদষ্ট ফুলের পাপড়িতে। সাঁতার শিখিনি কখনো—মার খেয়েছি, ডুবে ডুবে জল খেয়েছি, তবু না। দু'তিনটে নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে ঘুরে ফিরে দেখেছি—কোথায় হিলিঞ্চে আর কলমী শাকের সবুজ সমারোহ ছড়িয়ে আছে, কোথায় বা চলেছে শালুক ফুলের শুক্লাভিসার।

ছেলেবেলা থেকে দেখেছি মেঘনা আর ডাকাতিয়ার আদি-অন্ত-হীন চোখ-জুড়ানো রূপ। কখনো কালো, কখনো ধূসর। মেঘনা তো অনন্ত-যৌবনা জলকন্যা, তার বুকে নিত্যকালের উঁচু নিচু ঢেউ। তার সেই যৌবনজলতরঙ্গ তটে এসে আছড়ে পড়ছে—দুই তীর ভাঙছে আর ভাঙছে! বর্ষায় সেই শরীরী সঞ্চার আরো বিস্ফারিত, আরো বেসামাল হয়ে উঠতো। ঢেউয়ের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে দেখতুম সবলার যৌবনদাপট। সেই তুলনায় ডাকাতিয়া গ্রামের কিশোরী মেয়ের মতো ভীরু-ভীরু। তার ক্ষীণতটি স্রোতো-রেখা, হাওয়ার সঙ্গে লাজুক-লাজুক মিতালি, মেঘের ছায়া নিয়ে জলকেলি আর নিচু কণ্ঠের নির্জন আলাপ। কিন্তু বর্ষায় দেখতুম ডাকাতিয়াও ফুলে ফেঁপে উঠেছে – তন্বঙ্গীর অঙ্গে দেখা দিয়েছে ঘন শিহরণ। কিশোরী পদার্পণ করেছে প্রথম যৌবনে। আমার সেদিনের এই দুই সখীর রূপের বিচিত্র ভঙ্গিমা দেখে দেখে আশ মিটতো না।

আমাদের দেশখণ্ডটি সমুদ্রস্তর থেকে কতটা উঁচুতে ছিলো জানি না, কিন্তু রাঢ়বঙ্গ থেকে নিশ্চয় অনেক নিচুতে। এখানে আজ বন্যা হয় নদীর খাতে বালি জমে ওঠার জন্য, উৎসভূমিতে প্রাকৃতিক খেয়ালে, নদীশাসন ও জলসেচনের নামে বিজ্ঞানবুদ্ধির কারসাজিতে। আসলে আমাদের সব পরিকল্পনাই তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের অলস জল্পনা। আমাদের দিকটায় বন্যা ছিলো প্রায় বাৎসরিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান। অভিসারিকা প্রকৃতির দ্রৌপদীর শাড়ির মতোই অফুরন্ত গাগরি বারি। বর্ষায় উঠোনে জল থৈ-থৈ করছে, সিঁড়ি ছাপিয়ে মেঝে ছুঁই-ছুঁই করছে এমন ছবি আমার মনে গাঁথা হয়ে গেছে। ছপ্ ছপ্ করে আমরা দক্ষিণের ঘর থেকে উত্তরের ঘরে যেতুম, যেতুম শোয়ার ঘর থেকে রান্না ঘরে। প্যাণ্ট ভিজে, হ্যাঁচ হ্যাঁচ করে হাঁচছি যখন তখন, তবু আমরা খুশিতে ভরপুর। কলা গাছ কেটে ভেলা বানিয়ে চড়ে বসতুম সমবয়সী ছেলেরা। এ ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দিতুম। এ ঘর ও-ঘরের সামনে গিয়ে দু'হাত পেতে সুর করে বলতুম: মাগো, ভিক্ষে দাও।

নতুন বৌদিরা খিলখিল করে হাসতেন। ওরা শহরের মেয়ে, এমন মজার খেলা আগে কখনো দেখেননি। মায়েদের চোখ লাল ; ফুঁ দিয়ে দিয়েও ভিজে কাঠ জ্বলছে না। নতুন মায়েরা ঘ্যানর ঘ্যানর করছে—ভিজে কাঁথা কিছুতেই শুকোচ্ছে না যে! ঘরে ঘরে তখন চলতো খিচুড়ি-উৎসব। হাট-বাজার করার জো নেই।

জল আর শুধু জল। আকাশ-গঙ্গায় বান ডাকারও যেন শেষ নেই। যারা মৎসবিলাসী তাদের বিড়ালচোখ লোভে চকচক করে উঠতো। তারা দিনমানে কোঁচ নিয়ে বেরিয়ে পড়তো ধানখেত পাটখেতে। ছোট ডিঙিতে। ধান বা পাট গাছ নড়ে উঠলেই দূর থেকে ছুঁড়ে মারতো অব্যর্থ মারণাস্ত্র। কোঁচের বাতাগুলি কেঁপে কেঁপে উঠতো, বোঝা যেতো বাছাধন শরবিদ্ধ হয়েছে। কোঁচ তুলতেই দেখা যেতো রুই কিংবা কাতলা, শোল কিংবা গজার। কারো কারো লোভ ছিলো ছোট মাছে। তারা ছাতার শিক শানে ঘষে ঘষে চোখা ও ছুঁচলো করে নিতো এবং বানিয়ে নিতো কোঁচেরই মিনি সংস্করণ—'টেটা'। রাত একটু গভীর হলেই দ্বিগু সমাসের মতো সর্চ মার্চ শুরু করতো—একজনের হাতে ছোট্ট লণ্ঠন, অন্যজনের হাতে মারাত্ম নশলাকা। কই নিপুণিকার মতো ক্ষণিকা বধূ—এই আছে, এই নেই। সিঙ্গি, মাগুর বাঁকা ল্যাজের আভাস দেখিয়ে জলাভিসার করতো। কখনো ধরা পড়তো, কখনো পড়তো না। মৎসকুলে সবচেয়ে হাবাগোবা মেনি আর বেলে—এই আকন্দের মতো—তাদের শারীরিক আলস্যের রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশ করতেন টেটা-অবতার পরিগ্রহ করে। সরল পুঁটি সার্থকনামা—তার চালচলনে দেখেছি সাদাসিধে ঢং—জাতভাইদের সঙ্গে সহমরণে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই। আমি দাওয়ায় বসে—কারণ অন্ধকারে দারুণ অস্বস্তি—দেখতুম, লণ্ঠনের আলো আলেয়ার আলোর মতো মাঠময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দুটো সঞ্চরমান কালো ছায়া। বৃষ্টি ও বর্ষার তরল আস্বাদ জিভে আর ততটা মিষ্টি মনে হতো না। কিন্তু সেতো ঘুমের ছোঁয়া না-নামা পর্যন্ত।

চতুর্দিক জলে টইটম্বুর, মাঝে মাঝে ছোট ছোট উঁচু জমিতে গৃহস্থদের বাস্তুভিটে। এক সময় তিমিরবিনাশী মৎসবিলাসীরা ফিরে আসতেন। খলুই ভর্তি ছোট ছোট মাছ। যেন চুনার দুর্গ জয় করে এসেছেন এমনি তাদের ভঙ্গি। অন্ধকারকে ভালো না বাসলেও মাছ ভালো বাসতুম।

কিন্তু অন্ধকারকেও ক্রমে আর আগের মতো ভয় করতুম না। কলকাতাগামী স্টিমারে সেজদাকে তুলে দিতে গেছি বড়ো স্টেশনে। দুটো নদীর সঙ্গমস্থল। রেল ও স্টিমার লাইনের টার্মিনাস। সেজদাকে তুলে নিয়ে জাহাজ ভেসে চলেছে। ওপর-নিচের ডেকে অজস্র বাতি জ্বলছে। সামনে সার্চ লাইট ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরছে। চরের নিশানা তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। এত আলোর আয়োজন এর আগে আমি দেখিনি। অন্তরীপে—

অর্থাৎ ভূখণ্ড সরু হয়ে নদীর কাছে যেখানে থমকে দাঁড়িয়ে আছে—সেখানে রাঙাদাদার সঙ্গে বসে বসে সব দেখলুম। মনে হলো রূপকথার ময়ূরপঙ্খী ভেসে চলেছে। স্টিমারটা অনেকটা দূরে চলে যেতেই সবগুলি আলো একসঙ্গে মিশে গেলো। একটা জোরালো আলোর ফুল যেন নদীতে ভেসে চলেছে। তাকিয়ে তাকিয়ে আরো দেখলুম, রাত্রির ঘন অন্ধকারে গয়নার নৌকো সারি বেঁধে চলেছে, তাদের লণ্ঠনের আলোগুলিকে দূর থেকে চলমান নক্ষত্রের মতো মনে হলো। সেদিন বাড়িতে ফিরেছিলুম অন্ধকারে আলোর একটা আস্বাদ নিয়ে। যে আলোর জন্য আমার আবাল্য প্রার্থনা।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। মাসটা শ্রাবণ, পূর্ণিমা তিথি। হপ্তাখানেক বৃষ্টি নেই। অসহ্য গুমোট। পড়তে ভালো লাগছিলো না। বড়ো ঘরের দাওয়ায় ভাঙা বেতের চেয়ার টেনে আকাশের দিকে তাকালুম। কোথাও মেঘের ছিটেফোটা নেই। সমস্ত নভস্তলটা যেন মাজা কাঁসার থালার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। মাঝখানে গোলালো চাঁদের মস্ত বড়ো টিপ্। ফুট্‌ফুটে জোছনায় চারদিকে ভরে গিয়েছে। একটু আরাম পেলুম। হঠাৎ কোত্থেকে কী হলো! একটা বাড়ন্ত কালো ভাল্লুক ছুটে এসে চাঁদটাকে দিলো ঢেকে। জোছনা গেলো মরে। ঝপ্‌ঝপ্ করে নামলো অনেক আশার বৃষ্টি। হাত বাড়িয়ে বেশ কয়েক ফোঁটা স্পর্শ করলুম। মাখিয়ে নিলুম শরীরে। জ্বালা কমে গেলো। হাওয়া হলো ঠাণ্ডা। টিনের চালে ঝম্‌ঝম্ শব্দ, ব্যাঙের ডাক শোনা গেলো। মনে তখন বর্ণপরিচয়ের ভাষায় সুশীতল সমীরণ বইছে। ভাবলুম অনেকদিন কবিতা লিখিনি, আজ একটা লিখবো।

উঠলুম। লণ্ঠন জ্বালিয়ে চলে গেলুম পড়ার ঘরে। একটু ভেবে ভেবে একটা কবিতা দাঁড় করিয়ে ফেললুম। নাম দিলুম—'আজ বর্ষা নামলো'।

নীলাঞ্জনা
উতলমনা
    আঁচল দেয় তুলে
কান্না যেথায়
মুক্তো ছড়ায়
    সোনার ঝারি হাতে।
গণ্ডফুলে
কর্ণদুলে
    আলোর ঝিকিমিকি,
বুকের তাপে
অধর কাঁপে
    ভুবন বুঝি দোলে॥

বরুণ কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল করিনি। আমার সহপাঠী ও আত্মীয়।

কী লিখ্ছিস্, দেখি!

আমি লুকোবার আগেই ছোঁ মেরে কেড়ে নিলো খাতাটা। বার দুই পড়লো। কী বুঝলো, জানিনা। কারণ ও লেখাপড়ায় ভালো ছিলো না। আমার দিকে কট্মট্ করে তাকালো একবার, তার পরেই আমার গালে মারলো বিরাশি সিক্কার চড়।

থম্থম্ করে উঠলুম আমি : তুই আমাকে মারলি কেন?

আবার চড়। এবার বাঁ-গালে। আমি লজ্জায় অপমানে কেঁদে ফেললুম। আর কিছু করবার ছিলো না আমার। ওর গলায় ছিলো চিলের মতো আওয়াজ, গায়ে ছিলো অসুরেব মতো শক্তি। আমার ওজন ছত্রিশ সের, ওর ওজন এক মণ সাত সের। আমার চেয়ে হাত খানেকের মতো বেশি লম্বা অথচ বয়সে বরুণ ছিলো আমার থেকে এক মাসের ছোট। ছেলেবেলায় ওর হাতে কত যে মার খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। মুখ বুজে করেছি সাগ্রেদি। শুধু মারের ভয়ে।

— আবার যদি মুখ খুলেছিস্ তো তোর ভুবন দুলিয়ে দেবো।

বলে কুটি কুটি করে কাগজটা ছিঁড়ে ফেললো।

আমি চুপ করে থাকাই নিরাপদ মনে করলুম।

—তোর আস্পদ্দা তো কম নয়? শিঞ্জিনীর ওপর চোখ দিচ্ছিস্।

অবাক হয়ে বললুম : শিঞ্জিনীর!

বরুণ চোখ রাঙিয়ে বললো : হ্যাঁ, শিঞ্জিনী। তুই ভেবেছিস্ তোর নীলাঞ্জনা যে শিঞ্জিনী ছাড়া আর কেউ নয়, তা আমি বুঝতে পারিনি?

এবার মনে পড়লো শিঞ্জিনীকে। ও দত্তদের বাড়ির মেয়ে। ওকে কখনো দেখিনি, সাগরপারে কোন্ এক ভিন্দেশে ছিলো বাবার কর্মস্থলে। এখন এখানেই থাকবে। লম্বাটে ছিম্ছাম্ মেয়ে। গায়ের রং কচি কলাপাতার মতো। চোখ দুটি বড়ো সুন্দর, যেন দুটি কালো মানিক মাঝখানে কেউ বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মেয়েটার একটা দোষ অভিমান হলেই চোখে জল টলমল করে। যাকে বলে ছিচ্‌কাঁদুনে মেয়ে।

ভয়ে ভয়ে বললুম : আমার নায়িকাতো বর্ষা। তুই শিঞ্জিনীকে দেখ্লি কোথায়?

— তোর নীলাঞ্জনা কাঁদছে না? আমার শিঞ্জিনীও তো কাঁদে। তাছাড়া তোর 'ঞ্জ'-এর খেলাটা আমি ধরতে পারিনি, মনে করেছিস্?

কবিতার দেবী কোথায় থাকেন, আমি জানতুম না। যদি জানতুম, তবে তাঁর পায়ে ধরে বলতুম, মাগো, আমাকে রেহাই দাও। এই দেশে কচুরীপানায় ফুল ফোটে, কিন্তু কাব্য ফোটে না। তাকে ম্যালেরিয়া খেয়ে নিয়েছে।

বরুণ টুল টেনে বসে পড়লো। বললো : সাবধান, ওদিকে একদম নজর,

দিবি না। জানিস্ ওর সঙ্গে আমি রীতিমতো প্রেম করছি? ওকে লিখেছি তিনখানা পত্তর, ও লিখেছে দু'খানা।

—প্রেম?

আমি নিজের মনেই উচ্চারণ করলুম। ব্যাপারটা যেন কিছু কিছু বুঝি। পাঠক, চমকাবেন না। আমার বয়স এখন চোদ্দ। ক্লাশ নাইনে পড়ি, মাস তিনেক পরে টেনে উঠবো। সঞ্চয়িতার কবিতা মাঝে মাঝে পড়ি। দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, দেবদাস, দত্তা পড়া শেষ করেছি। গোল পণ্ডিতের কাছে শকুন্তলার গল্প শুনেছি। শরীরের দিক থেকে তেমন বাড়িনি বটে, মনের দিক থেকে বেড়ে উঠেছি অনেকটা।

—শোন্, ও বলেছে আমাকে বিয়ে করবে।

এবার আমার চমকে ওঠার পালা। প্রেমের কথায় অবশ্য চমকাইনি। আমি সভয়ে বললুম: সে কী করে হবে? শিঞ্জিনীতো সতেরো পেরিয়ে আঠারোয় পা দিয়েছে: বয়সে বড়োকে কেউ বিয়ে করে? ধ্যেৎ!

বরুণ বিজ্ঞের হাসি হেসে বললো: তুই একটা আস্ত গাধা। লম্বু মহারাজ গান্ধীজির আত্মজীবনী সেদিন পড়ে শুনিয়েছিলেন না? তাতে শুনিস্নি, গান্ধীজির চেয়ে তাঁর স্ত্রী বয়সে বড়ো ছিলেন?

আমি ক্লাশের ফার্স্ট বয়ের মতো ওকে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করলুম: তুই গান্ধীজির সঙ্গে নিজের তুলনা করিস্ না।

ও উদাস চোখে বললো: শিঞ্জিনীকে পেলে আমিও গান্ধীজির মতো হবো রে!

বলে হন্ হন্ করে চলতে আরম্ভ করলো, কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বললো: কিন্তু পিঠের চামড়া বাঁচাতে চাস্তো ওকে এড়িয়ে চল্বি।

আমার তখন কাহিল অবস্থা। মন বেসামাল। শিঞ্জিনীকে কতবার দেখেছি, একবারও ওকে ভালো দেখার ইচ্ছে হয়নি। কিন্তু প্রেম? আমার দেবদাস-পড়া মন বললো: তা একটু আধটু মন্দ নয়। কিন্তু বাড়াবাড়ি করতে গেলেই দাদারা কান কেটে নেবেন। বিয়ে? সে তো করেন বড়োরা। যেমন করেছেন আমার তিন দাদা। তাছাড়া, হাফপ্যাণ্ট-পরা ছেলের বিয়ে হয় নাকি! হঠাৎ মনে পড়লো, বরুণের বড়োসড়ো চেহারা এবং ও আজকাল ধুতি বা পা'জামা পরে। তবে ওর বোধহয় বিয়ে হবে। শিঞ্জিনী ওর গলায় মালা দেবে। কিন্তু আমার? পরনের ছেঁড়া হাফপ্যাণ্টের দিকে চোখ পড়লো। না, আমার কোনো দিন বিয়ে হবে না। আমাকে শুধু পড়তে হবে, ফার্স্ট হতে হবে, চাক্রী করতে হবে।

পড়ার ধার-করা বইটা টেনে নিলুম। কিন্তু এক বর্ণও মাথায় ঢুক্লো না। এমন তো ছিলুম না! হঠাৎ বরুণ এসে সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেলো। মনে মনে হাসলুম। একটা গল্প মনে পড়লো। এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন

বাজারে। সামনে সাঁকো। ওপারে দাঁড়িয়ে আছে এক পাগল। তিনি ডেকে বললেন : এই পাগ্‌লো, সাঁকো নাড়্‌বি না।

পাগল একগাল হেসে বললো : ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস্‌।

এই বলে সজোরে সাঁকো নাড়তে লাগলো। আমার মন ছিলো সাদা শ্লেট, বরুণ তাতে দাগ বসিয়ে দিয়ে গেছে। যার কথা কখনো ভাবিনি, তার কথা সারা সন্ধ্যা বসে বসে ভাবলুম : শিঞ্জিনী! শিঞ্জিনী!

এমনিতর বিচিত্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে বর্ষামঙ্গলের সঙ্গে।

শীত আসার প্রথম খবর পেতুম উত্তুরে হাওয়ার ডানায়। দখিনা বাতাস সেই কবে বিদায় নিয়েছে। তারপর থেকে ব্যতিব্যস্ত ঘরণীর মতো ঋতুসখী ব্যজনিকাদের এলোমেলো পাখা নাড়ার খেয়ালীপনা। সেই বাতাবর্তে কোনো নিপুণিকা বিমানসেবিকার পক্ষেও হাওয়ার আদব-কায়দার ঠিক ঠিক খবর রাখা শক্ত। কিন্তু কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাসের উড়ুনি চড়িয়ে উত্তরা দেবী যখন আসতেন তখন শিখরিদশনার কামড় টের পেতুম প্যাকাটে শরীরের সর্ব অঙ্গে। একটি মাত্র খদ্দরের চাদর সম্বল—বয়সে বেশ প্রাচীন, তাও এখানে সেখানে টুটোফাটা। শীত মানতে চাইতো না, ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতুম। যার আর কিছু নেই, তার অনাদিকাল থেকে জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ। সেই প্রথাসিদ্ধ ব্যবস্থা অনুসরণ করে উঁচু হয়ে বসে দুই হাঁটুর মধ্যে শরীরটা গুঁজো সায়েন্স পড়তুম। কখনো রোদে পিঠ দিয়ে বসে ফেনাভাত খেতুম। কখনো বা একরাশ শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে দিতুম। রুটি যেমন করে সেঁকে তেমনি করে হাত-পা সেঁকে নিয়ে বসে থাকতুম আঁচের কাছাকাছি। বিশেষ করে মাঘ মাসে, কেননা ওর দাঁতগুলো বড়ো ধারালো। কিন্তু বিছানায় শুয়ে গা আর কিছুতেই গরম হতে চাইতো না। সারাদিন ছোড়দি কাঁথাগুলো বারান্দার রোদে ফেলে রাখতো, মাঝে মাঝে উল্টে দিতো। তাতে আমার ডবল কাঁথা কেমন গরম-গরম মনে হতো। কিন্তু সন্ধ্যা নামতেই আবার যেই সেই। আসলে তুলোর গরম যতক্ষণ থাকে, কাপড়ের গরম ততক্ষণ থাকে না। তাই আমার আঘুম শীতের রাত্রি ছিলো এক দুঃসহ কষ্টের কাল। মেজদার চাকুরীর তৃতীয় বছরে কলকাতা থেকে আমার জন্য উলের চাদর এলো। মনে আনন্দ আর ধরে না। স্নানের সময়টুকু ছাড়া ও আমাকে ছাড়ে না, আমি ওকে ছাড়ি না। আমার আজকের ভাষায় বলতে পারি, প্রিয়ার গায়ের ওমও সেদিনের উলের চাদরের ওমের চেয়ে আরামদায়ক ছিলো না।

বোনাস পেয়ে মেজদা কিছু বাড়তি টাকা পাঠিয়েছিলেন। মা সে টাকায় বানালেন বড়ো লেপ। ওটি বরাদ্দ হলো সেজদি, ছোড়দি ও আমার জন্য। লাল শালুর নতুন গন্ধ, ধুনুরীর পিঞ্জনকলায় কোমলায়িত তুলোর

স্পর্শ, বহু-আকাঙ্ক্ষিত উষ্ণতার স্বাদ আমার মনে প্রথম দিন আনলো স্বপ্নসম্ভব কাব্য। মনে হলো—আমি সোহাগী কহিতুর আমের মতো শুয়ে আছি তুলোর তোশকে, গায়ে নবাবী বালাপোশ, চরণে পশমী অঙ্গাবরণ। সেদিন ঘুম এলো পরীর বেশ ধরে।

আমাদের অঞ্চলটা ছিলো বেরসিক কাঠখোট্টাদের দেশ। অন্ততঃ আজ আমার তাই মনে হয়। তা না হলে পয়সাওয়ালা শৌখিন বাবু তো অনেক ছিলেন--তারা লপেটা জুতো চুনোট-করা ধুতি চেকনাই সার্ট বা গিলে করা পাঞ্জাবী পরতেন। যত্ন করে টেরি কাটতেন। কিন্তু ফুলের চাষ করতেন না। সুন্দর ঠাকুর্দা একবার সখ করে জিনিয়া লাগিয়েছিলেন—এছাড়া মরশুমী ফুলের বাসর আমি দেখিনি। আমাদের বাড়িতে গন্ধরাজ, জুঁই, টগর, বেলফুলের গাছ ছিলো. কে কবে লাগিয়েছিলেন জানি না। বর্ষায় ফুল ফুটতো—কী মিষ্টি গন্ধ! ঘুরে ঘুরে ঘ্রাণ নিতুম, মন ভরে উঠতো। কিন্তু সকলের বাড়িতেই ছিলো বারোমাসে ফুলের গাছ—জবা আর নয়নতারা, বরাদ্দ মতো চালকলার সঙ্গে এই রকমের দু'তিনটি ফুলেই ঠাকুর সেবা চলতো। নিত্যসেবা দায়সারা গোছের হতেই হবে। তখন কবিতায় পড়েছি রজনীগন্ধা হাস্নুহানার কথা, চোখে কখনো দেখিনি।

শীতের ফুল ছিলো একমাত্র গাঁদা—যে যত বড়ো গাঁদা ফোটাতে পারতো তার তত সুনাম। রক্তগাঁদারও খাতির ছিলো। শুনতুম তাদের আদি জন্ম নাকি সিংহলে। সরস্বতী ঠাকরুন গাঁদা ফুলের মালা পরে বিদ্যাভবনে আসতেন। বর বিয়ে করতে যেতেন গাঁদা ফুলের মালা গলায় চড়িয়ে। হলপ করে বলতে পারি, হাল আমলের আধুনিকারা এমন বরের সঙ্গে মালা বদল করতেন না। গাঁদা ফুলের গাদায় আমার ফুলের সখ কখনো আরাম পায়নি।

হিমঋতু পাতাঝরার কাল। যে কচি পাতায় নতুনের অভিষেক, শীতের কড়া চাবুক মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করে কেমন করে তাকে ঝরিয়ে দেয় তা নিজের চোখে দেখেছি। পথ চলতে অনুভব করেছি শিউলির ফুরিয়ে যাওয়ার শিরশিরানি, দেবদারু আর বট-হিজলের পাকা পাতার পুঁজি নিয়ে হিমের কাড়াকাড়ি, হলুদে বাদাঘাসে উচ্চিংড়ের নীরব প্রতীক্ষা। ঊর্ধ্বশাখ কাঙাল গাছের দিকে তাকিয়ে শুনেছি শীতের প্রার্থনা: আমার বৈরাগ্য-সাধনায় কবে সিদ্ধি আসবে, ঠাকুর?

ঠিক কথা, আমি আমার আজকের মন, আজকের ভাষা দিয়ে সেদিনের অনুভবগুলিকে ধরবার চেষ্টা করছি। কথাগুলি পুরোপুরি সেকালের নয়, কতকটা একালেরও বটে।

বিশ্বাস করুন, সহৃদয় পাঠক, আমার বাল্যে ও কৈশোরে আর কিছু না

থাক্ একটা স্পর্শকাতর মন ছিলো। একটা বর্ধিষ্ণু বোধ ছিলো। সেই মূলধন নিয়েই আমি দুনিয়ার হাটে সওদা করে বেড়িয়েছি।

যে কথা বলছিলুম। শীতকে আমার বন্ধুরা বলতো বুড়ি। কণ্ঠে তার লাঠি ঠক্‌ঠক্ শাসানি, মুখে ফুটিফাটার ভ্রূকুঞ্চন, মাথায় শণের দড়িদড়া, লোলচর্মে খড়ি-ওঠা রুক্ষতা। তাই ওরা খড় দিয়ে বড়োগোছের 'বুড়ির ডালা' বানিয়ে সাড়ম্বরে বুড়িকে পোড়াতো। আমার কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে ওদের আস্থা ছিলো কম, ভীরুতা সম্বন্ধে বিশ্বাস ছিলো বেশি। কিন্তু আমাদেরই কিচেন গার্ডেনে ফিচেল চোর হয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশটি বেগুন সংগ্রহের দায়িত্ব থাকতো আমার ওপর। বুড়ির ডালার সঙ্গে পোড়ানো হতো সে সব। তারপর হৈ-হুল্লোড় ও কাঁচা লঙ্কা সহযোগে ভক্ষণপর্ব চলতো গভীর রাত অবধি। আমিও যোগ দিতুম বটে, কিন্তু আমাকে যেন থেকে থেকে জাপ্‌টে ধরতো একটা পাপবোধ। কারণ একটা নাটকে পড়েছিলুম—

এক পাপীর বাড়ি ছিলো তুলসী বৃন্দাবন।
তুলসী কাটিয়া পাপী লাগাইল বাইগন॥

সুতরাং জীবনের প্রথম অধ্যায়েই একটা পাপবোধ আমার মধ্যে প্রবেশ করে বেগুনপ্রেমের চৌরপঞ্চাশিকার সূত্র ধরে।

একবার ঘটলো একটা দুর্ঘটনা। বিকেলের মধ্যে বানিয়ে রেখেছি বুড়ির ডালা। আমাদের নজর এড়িয়ে কখন্ তলার দিকে ঢুকে পড়েছে একটা ক্ষুধার্ত কচি পাঁঠা। পেট ভরে খেয়ে নিয়ে বোধহয় তৃপ্তির আতিশয্যে পা গুটিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। রাত্রিতে আমরা বুড়ির ডালায় আগুন জ্বালিয়ে দিলুম, মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো বৈশ্বানর। হঠাৎ আমরা সকলেই শুনতে পেলুম একটা তীব্র আর্তনাদ। প্রীতীশ দেরি না করে লাঠির বাড়িতে ভেঙে ফেললো বুড়ির ডালা, আগা দিয়ে জ্বলন্ত খড় সরিয়ে দেখতে লাগলো ভেতরে কী আছে। বেরিয়ে এলো একটা মৃত অর্ধদগ্ধ ছাগশিশু। কারো কারো জিভ চক্‌চক্ করে উঠলো। না চাইতে জল। আজ শুধু চিরকেলে বেগুনপোড়া নয়, সঙ্গে সুস্বাদু পাঁঠার মাংস! এরই নাম বুঝি উৎকট উল্লাস।

সেদিন রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে আমি শুনতে পেয়েছিলুম এক মর্মান্তিক আর্তনাদ: বাঁচাও! বাঁচাও!

আমার পাপের নৌকোয় জমা হলো আর একটি আঁটি। পরের দিন ঘুম দিক উঠে ঘুরে ফিরে আমার মনে একটা ভাবনা: সত্যিই সংসারে পাপ বলে কি কিছু আছে? অন্যায়কে কি বলবো আমি?

যাক্ সে কথা। শীত যে শুধু শূন্য ঝুলি নিয়ে আমার কাছে দাঁড়িয়েছে তা নয়। কখনো কখনো ভরে দিয়েছে অঞ্জলি। ভালো লাগার রং লেগেছে চোখে।

স্কুলে যাচ্ছি পাট খেতের ভেতর দিয়ে। আমাদের ওদিকে ধান তেমন

হতো না, হতো পাট। এও হতে পারে, ধানের চেয়ে পাট দুধ দিতো বেশি। তাই চাষীরা ধানের ধনেখালির চেয়ে পাটের পট্টবস্ত্রে অধিক আস্থা রাখতেন। তা না হলে নদীর ধারে ধারে সাহেবসুবোরা এতগুলি আপিস খুলে বসতেন না। তাদের পাটের ব্যাবসা যে ছিলো রমরমা তা বড়োবাবুদের মৌরুসী পাট্টা আর ঘাড় ছাঁটা দেখেই বেশ বোঝা যেতো।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালুম। না, আর কচি নালতে পাতার লালিত্য নয়, দুপাশের উঁচু জমিতে সোনার ধানের উদার আতিথ্য। সারা মাঠ জুড়ে পৌষ ডাকাডাকি করে নামিয়ে দিয়েছে ভূমিলক্ষ্মীর স্বর্ণসম্ভার। এইখানেই কয়েক মাস আগে দেখেছি ধানের নতুন চারায় বাতাস বয়ে যাচ্ছে দামাল ছেলের মতো। আর আজ? হরিৎকে আদাব জানিয়ে জায়গা করে নিয়েছে হিরণ্য-সিন্দুর। ফলভারাক্রান্ত গাছগুলো প্রায় নুয়ে পড়েছে মাটিতে। চোখ জুড়িয়ে গেলো! জোরে টানলুম নিঃশ্বাস। বাতাসে কেমন মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ! স্পষ্ট মনে আছে সেদিন বাড়ি ফিরে লিখেছিলুম চার ছত্রের কবিতা—

সিটি বাজে ধানকলে ভরাট মরাই,
পাকা ধানে সোনাস্বপ্ন জড়িমামধুর।
ষোড়শী ডোমের কন্যা চুলে ফুল গোঁজে,
নবান্নের প্রান্তবর্তী লগ্ন নয় দূর!

মজার কথা, আমার বয়স তখনও ষোলো হয়নি। পনেরো ছুঁই-ছুঁই করছে।

এইতো আমার ছেলেবেলার ছোট্ট দুনিয়ার নিসর্গ। তার মংলিখিত সুসমাচার। মহারানী অধিরানী প্রকৃতিদেবীর বিচিত্র ঐশ্বর্য ক্ষুদ্র মুষ্টিতে ধরতে পারি, সে-সাধ্য ছিলো না আমার। আকন্দের অস্তিত্বের খানাখন্দ কি গঙ্গোত্তরী হতে পারে? তাই আমার কর্মহীন অবসরে কল্পনার রেশমী সুতো জাল বুনতো মহারানীর সহচরীদের নিয়ে। মনে মনে বলতুম,—

আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান।

ছোড়দির বন্ধু বিজলী সেনের কন্ঠে গানটা শোনার পর থেকে আমার কিশোরমনের ওটাই হয়ে উঠেছিলো আহ্বানগীতি।

যিনি প্রথমে এলেন এবং চকিত চমকে প্রস্থান করলেন তার নামের সাড়ম্বর ঘোষণা শোনলুম বাসন্তী চৌধুরী। খানদানী ঘরের মেয়ে। কিন্তু তার সঙ্গে ভালোমতো পরিচয় হলো কই?

তার পেছনে অবগুণ্ঠনবতী ও কে? ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখলুম ওর প্রখর রূপ।

বললুম: ঘোমটা খোলো বধূ?

ও মাথা ঝাঁকিয়ে বললো: না। ওটা উন্মোচন করবে তুমি।

—কি নাম তোমার?

—কি জানি! তুমি নাম দাও।

—আচ্ছা, তাই হোক্। নাম দিলুম বৈশাখী সিংহ।

—ও নামে তো সবাই আমাকে চেনে। তুমি এমন একটা নাম দাও যা জানবে শুধু তুমি আর আমি। সে-নামে, পরাণসখা, ডাকবে শুধু তুমি।

ফিস্‌ফিস্ করে বললুম: তোমার নাম হোক্ চম্পা গুপ্তা।

অবগুণ্ঠন লুণ্ঠিত হলো। সখীর উদ্ভাসিত মুখের ওপরে দেখা গেলো পান্নাখচিত সিঁথিমৌড়। ঘনকৃষ্ণ ঘোড়ায় চড়ে মন্থরগতিতে চম্পকসুন্দরী অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ও আবার কে এসে দাঁড়িয়েছে? মাথায় চুলের বন্যা, মেঘকজ্জল পল্লবতলে নয়নতারার আলো।

আবেগে বলে উঠলুম: কে গো তুমি?

—চিনতে পারছো না, বন্ধু?

—বুঝেছি, তুমি বর্ষা মিত্র।

ওর চোখে জল টলটল করে উঠলো। হাওয়ায় ওড়ানো ধূপছায়া শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বললো: তুমিও সেই পুরনো নামে ডাকলে? আমি কি আর নতুন নেই, প্রিয়?

আমি অস্থির হয়ে উঠলুম। বারবার বলতে লাগলুম: তুমি চিরপুরাতন, চিরনূতন। তুমি আমার কত আদরের শ্রাবণী সোম।

নবাগতার ললাটে শ্রাবস্তীর চান্দ্র রাত্রি ঝিলিক দিয়ে উঠলো। সে আস্তে আস্তে ঝিরঝিরিয়ে বললো: ওই কারা আসছে! আমি তবে যাই?

মিছিল করে এলো আর গেলো শিউলি দত্ত আর কৃত্তিকা ভদ্র। শাদা শাড়ি ও কমলা পাড়ে শিউলিকে মানিয়েছে বেশ। কৃত্তিকা যেন ধূমাবতী। ওর মুখটা তেমন দেখতে পেলুম না। সবশেষে এলো ঝরা দাস, মনে হলো হাওয়ায় উড়ে এলো। ও যাই-যাই করেও গেলো না। কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একটু দূরে।

আমি কড়া সুরে বললুম: ঝরা দাস, তোমাকে আমি চাইনি। তুমি ডাইনি।

ঝরা মচ্‌মচ্ শব্দে এগিয়ে এসে বিবস্ত্রা হতে শুরু করলো। খসে পড়লো ওর গেরুয়া বেশ। তাকিয়ে দেখি এবার ও ঝলমল করে উঠেছে সোনার জরির কাজ-করা ধানী রংয়ের শাড়িতে। মুচকি হেসে বললো: চেয়ে দেখোতো, আমাকে কেমন লাগছে?

তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে আমি বললুম: যেওনা, দয়িতা, যেওনা। তুমি আমার নিত্যকালের ধন, পৌষালী বসু।

বুদ্ধিমান পাঠক, আপনার নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হবে না আমার এই আরব্য উপাখ্যানে জড়িয়ে মিশিয়ে আছে কিশোর-মনের কল্পনা-প্রবণতা,

নিসর্গ-সন্দর্শনের সরাসরি অভিজ্ঞতা ও রূপকথার জগতে নিরন্তন অভিসারের ছায়াসম্পাত। দাদা-বৌদিরা চোখের সামনেই হয়েছেন বর-বধূ। তাদের সম্পর্কের গভীরে এই আকন্দের প্রবেশাধিকার না ঘটলেও বাইরে থেকে তাদের পারস্পরিক আচরণবিধি আমার একেবারে অজানা ছিলো না। নাটক-নভেলেও তার কিছু পরিচয় আমি এরই মধ্যে পেয়ে গেছি। সবচেয়ে আদত কথা, প্রকৃতি চিরকালই মানুষের সোহাগিনী বধূ।

● ●

সমাজ বস্তুটা আজ আমড়াজাতীয়। সমাজের কথা মনে পড়ে বিবাহ আসরে ও শ্রাদ্ধ বাসরে—হয় বরকন্যার আশীর্বাদের আয়োজনে, নয় মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতির প্রয়োজনে। যেমন আমড়ার ডাক পড়ে অরুচি দমনে আচার রূপে কিংবা ভূরিভোজনে চাট্নি হিসেবে। গয়াধামে পিণ্ডদানে উৎসর্গ করলে আত্মাতকের সঙ্গে মৃত্যুতক ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, শহরনামে তীর্থস্থানে আত্মোৎসর্গ করলেও সমাজকে অনায়াসে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো যায়। সমাজ এখন হয়ে উঠেছে যাদুঘরের প্রস্তরীতির দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী।

কিন্তু আমার কৈশোরে এমনটি ছিলো না। তখনো বারোয়ারি চণ্ডীমণ্ডপ বা বড়োবাড়ির বৈঠকখানা ছিলো। তাতে সজনে ডাঁটা থেকে বঁড়শির কাঁটা পর্যন্ত সব কিছুর আলোচনা হতো। কুলজি ঠিকুজিসহ রাম শ্যাম যদু মধুর আগাপাস্তলা দেখা হতো চুলচেরা বিচার করে। সমাজপতিরা সেখানে জমিয়ে বসতেন—চল্লিশ থেকে চুরাশি পর্যন্ত তাঁদের বয়স। কেউ গুড়ুক গুড়ুক শব্দে গড়গড়ার নল টেনে, কেউ বা হাতের আড়াল দিয়ে হুঁকোর ধোঁয়া ছেড়ে সমাজের স্বাস্থ্য-রক্ষায় গভীর মনঃসংযোগ করতেন। বৃহত্তর জনমণ্ডলের ভবিষ্যত ঠিক রাখার গুরু দায়িত্ব যে তাঁদের ওপর ন্যস্ত! কখনো কখনো সমাজপতিদের বিধানসভার জরুরি অধিবেশন বসতো—কোনো পরগত ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে কড়া প্রস্তাব কিংবা শাস্তিমূলক আইন পাশ করিয়ে নিতে হবে। যখন সভা ডাকায় কালগত বা বিধিগত অসুবিধা থাকতো তখন চৌধুরীকাকা অর্ডিন্যান্স জারি করতেন। কারণ তিনি একাই এক শ—জমিদার পরিবারের ধুরন্ধর বংশধর। যেখানে ভ্রষ্টাচার অন্যগত, সেখানে বজ্র

আটুনির অন্ত ছিলো না। কিন্তু ফস্কা গেরোও ছিলো যদি ভ্রষ্টাচারটা হতো সমাজপতিদের আত্মগত।

আমাদের ঘোষ-দাস-চৌধুরী বংশের ত্রিমাত্রিক বৃহৎ ভদ্রাসনের বাইরের দিকটায় যে আটচালা ঘর ছিলো তার চারদিকে আমার মতো ছোট ছেলেদের জন্য সব সময়েই এক শ চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা থাকতো। হাল আমলের ছেলেদের মতো মিছিল করে গিয়ে আইন ভংগ করার সাহস আমাদের কারো ছিলো না। তাই আমরা কৌতূহলে আক্রান্ত হয়ে ফাঁক-ফোকর খুঁজে আড়ি পাততুম। যাকে নিক্সনি ডিকশানারিতে বলে বাগিং। ওটা গুরুজনদের পেনাল কোডের কোনো ধারায় পড়তো না। এবং সেটাই ছিলো বাঁচোয়া।

এই গ্রাম-সমাজের অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশি টের পেতুম সামাজিক ক্রিয়াকর্মে। বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, শ্রাদ্ধে। আমার ঠাকুর্দা যদ্দিন জীবিত ছিলেন তদ্দিন তিনি হতেন খাদকবাহিনীর নিখাদ নেতা। বয়সে জ্যেষ্ঠ, সমাজশাস্ত্রে তর্কতীর্থ ও স্ট্র্যাটেজি রচনায় পারঙ্গম। তাছাড়া ঘরজামাইয়ের কামাইয়ের প্রশ্নই উঠতো না, কারণ কর্মে ও ধর্মে তাঁর অনীহা ছিলো মহিলামহলের লোকসভায় ও পুরুষকুলের রাজ্যসভায় বিনা ডিভিসনেই চির-অনুমোদিত। তাছাড়া সাড়ে চারফুট জমিদারকন্যার পাণিগ্রহণ যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন এই ছ'ফুট মানুষটি, তাইতো যথেষ্ট! তাঁর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব জমিদারকন্যার। তাই তাঁর সমস্ত জীবনটাই ছিলো আত্মরতির তেজারতী কারবার। বিরানব্বুইয়ের ধাক্কায় বরাবরের মতো বিধ্বস্ত হওয়ার আগে তিনি নিজেই দেখে গিয়েছিলেন, তাঁর সহধর্মিণী তারকগঙ্গা চৌধুরানীর তবিল খালি হয়ে গেছে, জমিদারির ঠাট উঠেছে লাটে। তাই বাবা যখন বসেছিলেন চৌধুরীদের দৌহিত্র বংশের সিংহাসনে, তখন তিনি পুরোপুরি জখম—মাখমের স্বপ্ন দেখা তাঁর পক্ষে বাতুলতা। ভাতকাপড়ের সত্যে বেঁচে থাকার লড়াই করতে গিয়ে তাঁকে উদয়াস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হতো। মোড়লি করবার সময় তাঁর ছিলো না, ছিলো না বোধহয় ইচ্ছাও। অথচ সামাজিক ইজ্জত না রাখলেও নয়—তাই বাবার বদলে দাদারা কেউ না কেউ নিমন্ত্রণ বাড়ির অভিমুখে আনুষ্ঠানিক প্রোসেসানে অংশ গ্রহণ করতেন। আমার বাবা মুকুন্দদাস হাভাতে লোক ছিলেন, তবু তাঁর বরাতে জুটেছিলো বিচক্ষণতার সম্মান।

রাঙাদা ছাড়া দাদারা সব কলকাতায়। রাঙাদা আমার চেয়ে ছ'বছরের বড়ো ছিলেন। সামাজিক খাওয়াদাওয়ায় তাঁর দাবি ছিলো জোরদার। কিন্তু সাফাই কাজে মকাই চাষে, ঘরামির ব্যায়ামে তাঁর যতটা আনন্দ ছিলো, ততটা আনন্দ ছিলো না দক্ষিণহস্তের ক্রিয়ায়। আর আমার ভোজনপ্রিয়তা চালতার ডালের মতোই ছিলো সুখ্যাত। তাই জমিদার বাড়ির দৌহিত্রবংশের অবতংস রূপে নিমন্ত্রণযজ্ঞে আমার যোগদান ছিলো প্রায় অবধারিত।

গন্ধবণিকদের বাড়িতে অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ। সেদিন আমাদের নেতা

ছিলেন বীরেশ্বরদাদু। আমরা বলতুম ছোটদাদু। ঘোষ-দাস-চৌধুরী বংশের প্রমীলাবাহিনী আগেই গেছেন চলে। মা আমাকে সাজিয়ে দিলেন। পঞ্চম জর্জের রাজত্বকালের রজতজয়ন্তী উৎসবে স্কুলের ভালো ছেলে হিসেবে প্রাইজ পেয়েছিলুম একটা সাদা জিনের হাফ প্যান্ট আর সাদা পপলিনের সার্ট। মা বাক্সোয় তুলে রাখতেন, পরতে দিতেন না। বার করে দিতেন বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে। ছেলে ভিখিরির মতো আর সকলের সামনে যাক্ এটা বোধহয় কোনো মা-ই চান না। আমার মা-ও চাইতেন না। আমার প্যান্ট-সার্টে মায়ের যত্ন দেখে মনে হতো গর্ভধারিণী ততদিন বেঁচে থাকলে ও দুটি পরেই বোধহয় আমাকে শ্মশানযাত্রা করতে হবে। মনে মনে তাঁর ওপর অভিমান করতুম।

ছোটদাদুর আঠারো মাসে বছর। তাঁর রেডি হতেই মধ্যাহ্ন হয়ে গেলো। তারপর আবালবৃদ্ধদের জড়ো করে মিছিল স্টার্ট দেওয়ানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমরা ছোটরা চঞ্চল হয়ে উঠেছি, কারণ পেটে ততক্ষণে ছুঁচোর ডন-বৈঠক শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু টুঁ-শব্দ করার জো নেই। কারণ এই জাতীয় গুরুভার কর্মকাণ্ডে ডিসিপ্লিন মেনে চলার ট্রেনিং আমাদের ছেলেবেলা থেকে দেওয়া হতো। শিরায় নীল রক্তের কথা মনে না রাখলে তো চলবে না!

প্রোসেসান শুরু হয়ে গেলো। রাজকীয় পোশাকে লেফ্ট রাইট করতে করতে আমি চলেছি। অক্ষৌহিণী যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্থাৎ নিমন্ত্রণকর্তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো তখন পুবের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। সবাই অপেক্ষা করছেন বড়োবাড়ির ব্যাটেলিয়নের জন্য।

ছোটঠাকুরমা এগিয়ে এলেন। তিনি খগ্গনাসা, তাতে রুপোর নথ পরেছেন।

তৃতীয় পক্ষ ও-দুটি যুগপৎ নাড়িয়ে বলে উঠলেন: কি গো ছোটকর্তা, একাহারে দু'বেলারটা উশুল করে নেবে নাকি? রাত্তিরের খাবারের খরচ বাঁচাবার মতলবে আছো নাকি?

অবাক কাণ্ড! ছোটদাদু অটল গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন: যথাসময়ে আসে হ্যাংলারা। সম্ভ্রান্তদের আবির্ভাবের লয় সব সময়েই বিলম্বিত।

বলে চোখে ইঙ্গিত করলেন।

আমরা একে একে বসে পড়লুম। পরিবেষণ শুরু হয়ে গেলো। ছোটদাদু আড়চোখে অর্ডারটা একবার চেক করে নিলেন। প্রথমে তিনি, দ্বিতীয় প্রীতীশ, তৃতীয় আমি ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর মাটির গেলাসে হাত ধুয়ে ভাত ভাঙলেন। সিগনেলিং-এ কোনো ভুল নেই: স্টার্ট! ফায়ার!

অন্যের কথা জানিনে, আমি কাঁচ কলাপাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। যুদ্ধচর্চা, প্রেমচর্চায় বিলম্ব যে নিষিদ্ধ, তা তখন জানতুম না। কিন্তু খাদ্য-চর্চায় যে শুভস্য শীঘ্রম্, তা ততদিনে ভোজনশাস্ত্রের সঙ্গে আবাল্য পরিচয়ের

ফলে জেনে গেছি। প্রথমে উচ্ছে-দেওয়া তেতো ডাল, তারপর নারকোলকুচি মেশানো ছোলার ডাল, সর্বশেষে রুইয়ের মুড়ো সহযোগে মুগের ডাল—ডালহুদের এই ত্রিস্রোতা বন্যায় তখন হাবুডুবু খাচ্ছি। তেতো তোয়াজ স্পর্শ মাত্র করলুম, ছোলার কুচিতে কিছু কচরমচর শব্দ তুললুম। তারপর পাতে পড়লো একটা আস্ত মুড়োসহ মুগের ডাল। রসনার তখন বেসামাল অবস্থা। মুড়োটা তুলে তার ঘিলুতে কামড় দিতে যাবো এমন সময় প্রীতীশের কনুইয়ের গুঁতো। তাকিয়ে দেখি কোর কমাণ্ডার ছোটদাদু হাত গুটিয়ে বসে আছেন। মুখের চেহারা আষাঢ়ের মেঘলা আকাশের মতো।

গৃহকর্তা হা-হা করে ছুটে এলেন।

—কি হলো, ঘোষজামশাই? অপরাধ কিছু হয়েছে?

—ওই লোকটাকে ওখানে বসালো কে?

—তা, তা—আমি কি করবো, বলুন! উনি বুড়ো মানুষ, বসতে চাইলেন।

তাকিয়ে দেখি শংকর মাছের ল্যাজের মতো বাঁকানো পংক্তির একেবারে শেষে মাথা নিচু করে বসে আছেন এক বুড়ো মানুষ। আরে, এ যে মেজদাদু তারকেশ্বর ঘোষ। ছোটদাদুরই সাক্ষাৎ বড়ো ভাই।

ছোটদাদু চোখ পাকিয়ে বললেন: তুমি জানো না, লোকটা সমাজে পতিত?

গৃহকর্তা আমতা আমতা করে জবাব দিলেন: তা জানি বৈ কি, ছোটবাবু! কিন্তু উনিতো আপনারই সহোদর ভাই।

—ভাইয়ের চেয়ে বংশ বড়ো, জাত বড়ো, সমাজ বড়ো। এমন অনাচার আমি সহ্য করবো না।

বলে তিনি আবার সিগনেলিং করলেন। অর্থাৎ বাছাধন তোমরা সবাই উঠে পড়ো। আর খাওয়া চলবে না। আমার হুকুম।

মেজদাদু আসন ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। তবু ছোটদাদুকে বাগ মানানো গেলো না। ভদ্রলোকের এক কথা!

আমার অবস্থা তখন কহতব্য নয়। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে। মাছের মুড়োটা পাতে পড়ে রইলো। রসুইখানা থেকে আসছে মাছ আর মাংসের গন্ধ। দাওয়ায় দেখতে পাচ্ছি চিনি-পাতা দইয়ের হাঁড়ি। এক পাশে অনেকগুলি ডালা—তাতে থরে থরে সাজানো সন্দেশ। অন্যদিকে রসগোল্লা-ভরতি খানকয়েক টিন। মধ্যাহ্নভোজের সন্তোষজনক আয়োজন। অথচ আমি অর্ধভুক্ত রইলুম। মেজদির বিয়ের সময় দেখেছিলুম মেজবৌদি জামাইবাবুর মুখের কাছে ধরছেন সন্দেশ কিংবা রসগোল্লা। জামাইবাবু না বুঝে যেই হাঁ করতে যাচ্ছেন অমনি মেজবৌদি হাত সরিয়ে নিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েমহলে খিলখিল করে হাসি। নন্দাইয়ের সঙ্গে শালাজের জামাই-

ঠকানো খেলার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। আধঘণ্টা এই ধরনের হাসি-মস্করা চললো। তারপর মেজবৌদি চোখে ঝিলিক তুলে বললেন: না ভাই, রাগ কোরো না। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটাই তো ঠাট্টা-পরিহাসের। কিন্তু আর দেরি করলে মেজঠাকুরঝি কেঁদে ফেলবে। তোমার বৌয়ের দিকে তাকিয়ে দেখো ভাই, মুখখানা কেমন থমথমে হয়ে উঠেছে।

বলে তিনি পেছন থেকে একটা রেকাবি—বেশ বড়ো গোছের—বার করলেন। হরেক রকম মেঠাই। সঙ্গে একজোড়া পাকা মর্তমান কলা। খান দশেক লুচি।

মোটামুটি সচ্ছল চৌধুরী বংশের নতুন জামাতা প্রাতঃকালীন মল্লযুদ্ধে মনোনিবেশ করলেন। মুখে লজ্জারক্তিম মৃদু হাসি।

আর আমি? হাঁ-করেই ছিলুম, পরিবেষকরাও মেজবৌদির মতো জামাই-ঠকানো খেলা খেলছিলেন না। কোথা থেকে রাবণের স্টাইলে—রামায়ণ পড়েছি কিনা, তাই ও তুলনাটাই তখন মনে পড়লো—ছোটদাদু আমার মুখের গ্রাস ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেলেন। আমার রাজভোগ তছনছ করে দিলো ওই মেনীমুখো মানুষটা। হাজার আশরফি তছরুপ হয়ে গেলেও এত দুঃখ পেতুম না আমি। ঘরের একপাশে রাখা ড্রামের জলে হাত ধুতে গিয়ে দেখি, ঘরের পেছনের দিকটায় লুকিয়ে প্রীতীশ নিশ্চিন্ত মনে মাছের মুড়ো চিবোচ্ছে। ও কোনো কালেই হাবা নয়। আরো দেখলুম, উঠোনে দাঁড়িয়ে কপাল চাপড়াচ্ছেন গৃহকর্তা বৃন্দাবনবাবু আর বলছেন—আমার পোড়া কপাল! এত বন্দোবস্ত করলুম সব ভেস্তে গেলো। আমার নাতিটা বোধহয় বাঁচবে না।

আমার মনে হলো, ছোটদাদুকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে তক্ষুণি গুলি করে মারি।

কানে এলো কনকবৌদির চাপা গলার কথা: ছোটঠাকুরমা, এটা কি ভালো হলো? মেজদাদু তো ছোটদাদুরই বড়ো ভাই। হাটের মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁকে অপমান না করলে কি চলতো না? তাছাড়া বৃন্দাবনবাবু এত ব্যবস্থা—

ছোটঠাকুরমা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন: বলছো কি, নাতবৌ? জাত কুল বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে না? তুমি লেখাপড়া শিখেছো, কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি তোমার আজো হলো না। তা বুঝবে কি করে, মা! যতই বিদ্যেধরী তুমি হও না কেন, আট ঘরের মেয়েই তো বৌ করে এনেছে তোমার শ্বশুর। সেকালীন গোত্রের মহিমা তুমি বুঝবে কি করে?

বৌঠান তবু কেস চালিয়ে গেলেন: ছোটঠাকুরপো, কুট্টি ঠাকুরপো ওরা কেউ খায়নি। কেমন মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন।

—ওই তোমার কুট্টির কথা আর বলো না। ওর তো শুধু খাই-খাই

রব। আমি তোমার গুরুজন, আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না। তোমার ছোটদাদু যা করেছেন, ঠিক করেছেন। ওঁর একটা মাথায় দশটা মানুষের বুদ্ধি! সমাজ ঠিকঠাক চালানো সোজা কথা নয়, কনক!

বলে স্বামীর গরবে গরবিনী তৃতীয় পক্ষ নাসিকামণ্ডল দোলাতে দোলাতে প্রস্থান করলেন।

বৌঠানের বিষন্ন মুখটা চকিতে দেখে নিয়ে আমি চলে এলুম।

প্রত্যাবর্তনকালে সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ। কোর কমাণ্ডার নিরুদ্দিষ্ট। মজুমদার বাড়ির সামনে তাল গাছের সারি। তার ছায়ায় ছায়ায় ফিরতে ফিরতে ভাবলুম: মেজদাদুর দোষটা কোথায়? শুনেছি, যৌবনে লুকিয়ে বিয়ে করেছিলেন গ্রামান্তরের একটি মেয়েকে। ওরা বেজাত নয়, কায়স্থই। তবে ছোট ঘরের। তারপর যা হবার তা-ই হলো। স্বগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে শ্বশুর বাড়িতেই বাস করতে লাগলেন। মাঝে মধ্যে আসেন—বেশ মৃদুভাষী ভদ্রলোক। আমাদের ডেকে আদর করেন, ভালো মন্দের কথা জিজ্ঞেস করেন। আমার বেশ পছন্দ ওঁকে—অন্ততঃ ছোটদাদুর চেয়েতো বটেই। সেই এক স্ত্রী নিয়েই আজো বাসা করছেন। ছোটদাদুর মতো বাজার থেকে দু'টাকা সেরের মাছ কিনে এনে তৃতীয় পক্ষের মনোরঞ্জনের জন্য এক টাকা দাম বলেন না। অথচ ছোটদাদু হলেন সমাজপতি আর মেজদাদু হলেন সমাজচ্যুত।

আসতে আসতে তাল গাছকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করলুম: আমি বড়ো হয়ে কুল মানবো না, জাত মানবো না, সমাজ মানবো না। ওগুলি আবর্জনা, পুড়িয়ে ফেলার মতো।

এই পর্যন্ত লিখে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে: সত্যিই কি বড়ো হয়ে সেদিনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পেরেছি? আজ আমি জাত-কুল নিয়ে মাথা ঘামাইনে। ওগুলি আমার কাছে গৌণ বা মিথ্যা হয়ে গেছে। ধর্ম যদি থেকে থাকে সে আমার একান্তই নিজস্ব। আজকের শহর-জীবনে সমাজের অস্তিত্ব টের পাইনে, কিন্তু অসামাজিক কিছু আজো করিনি। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা, চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি পুরনো দেয়াল যতই ভাঙুক না কেন—নতুন দেয়াল গজিয়ে উঠছে। উচ্চ নীচের ভেদের পুরনো চেহারাটা বদলে গেছে, তার জায়গায় দেখা দিয়েছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বৃত্তিজীবী বুদ্ধিজীবী অফিসার কেরানি ইত্যাদি কত নতুন রকমের ভেদের চেহারা। মনের দিক থেকে আমরা বোধহয় শূন্য মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনে। তাই ওঠে পুরনো দেয়ালের পর নতুন দেয়াল। তার জন্য তাত্ত্বিক দোহাই পাড়েন পণ্ডিতেরা। সেকালের সমাজপতিরাও কিন্তু জাতিভেদ বর্ণভেদের পক্ষে দোহাই পাড়তেন। সুতরাং দেয়াল ভাঙার খেলা শেষ হবে কি কোনোদিন?

যে গ্রামের ছেলে ছিলুম আমি তা ছিলো মুসলমানপ্রধান। হিন্দুরা ছিলো শতকরা পনেরো ভাগ, বাকি পঁচাশি ভাগ ছিলো মুসলমান। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের দূরগামী রাস্তার এ-ধারে হিন্দুরা, অন্যধারে মুসলমানেরা। ছুটকো দু'একটা মুসলমান ঘর হিন্দু পাড়ায় বা হিন্দু ঘর মুসলমান পাড়ায় অবশ্য ছিলো। হিন্দুদের মধ্যে যাকে বলে বর্ণহিন্দু তাদের সংখ্যা হাতে গোণা যেতো। কায়স্থ কুলপঞ্জিকা মতে ঘোষ কাকারাই ছিলেন একমাত্র চার ঘরের জায়গিরদার, আমরা তিনটে পরিবার ছিলুম আট ঘরের হক্‌দার। বাকিরা বত্রিশ ঘরের বারোয়ারি উঠোনের মালিক। বারুজীবী, গন্ধবণিক, যুগী (এঁরা যে নাথসম্প্রদায়ভুক্ত, সেটা জেনেছি অনেক পরে)—এদের বরোজের বন্দ্‌., বাণিজ্যসম্ভারের সপ্তডিঙা ও তন্তুজ শিল্পের পানসি তরতর করে বয়ে চললেও ওরা শুধু জলচল বলে গণ্য হতেন। জলহস্তীর সম্মান ওরা পাননি। এ ছাড়া ছিলেন বিচিত্র হরিজন সম্প্রদায়-ধোপা, মালী, কৈবর্ত ইত্যাদি ছোটজাতের বড়ো জগৎ। মজার কথা, সামাজিকভাবে ওরাও এককাট্টা ছিলেন না-মালীদের ওপর কৈবর্তদের অত্যাচার নিজের চোখে দেখেছি। নাপিত বাড়িতে জল খেতে আমাদের বারণ ছিলো না। আমাদের বাঁধা ক্ষৌরকার—যিনি নিষ্কর সম্পত্তি ভোগ করতেন—তিনি হতেন বিয়ের আসরে সাদরে আমন্ত্রিত। কী একটা মন্ত্র বর-বৌয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে বলে যেতেন গর্‌গর্‌ করে। তারপর বসে পড়তেন পুরুত ঠাকুরের পাশে। নাপিত-বৌ রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে নতুন বৌদিদের পায়ে পরিয়ে দিতেন আল্‌তা। ছেলেবেলাতেই শুনেছিলুম নাপিতরা উচ্ছন্ন জাতির পাঁতিতে জলাচরণীয় হংসপতি। আজ ভাবি, এই বর্ণভেদের বেদশাস্ত্র ও জলাচরণীয়তার আচরণবাদ যাঁরা প্রচার করে গিয়েছিলেন তাঁরা ব্যক্তি ও সমষ্টির মনস্তত্ত্বে আমার মহামহোপাধ্যায় বন্ধু অমলকান্তি চন্দ্রের চেয়েও পারঙ্গম ছিলেন। বন্ধুবর আর যে মনস্তত্ত্বই জানুন, দশের ওপর একের লাঠি ঘোরানোর মনস্তত্ত্ব এত ভালো জানেন না। সামাজিক সংবিধানের এমন বিধিবন্ধ অথচ অলিখিত সংশোধনের কায়দা এযুগের রাজনৈতিক কৌশল পার্টিগুলিরও অজানা।

আমাদের গ্রামসমাজ ছিলো ব্রাহ্মণ্যশাসনবর্জিত। মোট দু' ঘর ছিলেন—বেনেদের বামুন মিশ্ররা আর ছুতোদের বামুন আচার্যরা। এঁরা নিশ্চয় উঁচু-দরের দস্তুরওয়ালা ধর্মশাস্ত্র বিক্রেতা ছিলেন না। ওঁদের পেশা ছিলো জ্যোতিষচর্চা, হোমিওপ্যাথিচর্চা, আয়ুর্বেদচর্চা ও বিদ্যাচর্চা। কেউ কেউ লেখাপড়া শিখে আসামে থাকতেন--রেলে বা ডাকবিভাগে করতেন চাকুরী। কুলকর্মে তাদের কোনো সুযোগ বা মনোযোগ দেখিনি। চক্রবর্তী মশাই ছিলেন গ্রামান্তরের লোক—সমাজপতিত্বের অধিকারগত ও অর্থগত প্র্যাক্‌টিস জম্‌বে ভালো মনে করেই আমাদের গ্রামে তাঁর একক বসবাস। খনা বলে গিয়েছেন—

ঝড় জঙ্গল আঁধার রাত, পাগলো হাতি কায়েত জাত—এদের বিশ্বাস কোরো না। সেটা বোধহয় তিনি জানতেন। তাই কায়েতের হাতে একচ্ছত্র শাসনভার ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় মনে করেই তাঁর সখড়ম আবির্ভাব। কিন্তু সমাজ-শাসনে তিনি তেমন জোরালো অংশ নিতে পারেননি আগমার্কা চৌধুরীকাকার দাপটে। সমাজনাটকে গৌণ ভূমিকা নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিলো। তিনি বোধহয় চাণক্যের সরাসরি বংশধর ছিলেন না।

সহৃদয় পাঠক, জানি আপনি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। বিশ্বাস করুন, বর্ণ-বিন্যাসের বস্তাপচা বিরেচক আপনাকে পরিবেষণ করার কোনো সৎ অভিপ্রায় এই অধম আকন্দদাসের নেই। তা তোলা রইলো ভবিষ্যতের সাধু আকন্দদাস বাবাজীর জন্য। তখন তর্কচূড়ামণি হয়ে সে হাঁচি-টিকটিকি, দিনে-শেয়াল আর রাত্রিতে-কাক ডাকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবে। আপাততঃ চিনে নিন্ আকন্দের চারদিকের খানাখন্দগুলি। তারই মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে সে বড়ো হয়েছে। তবে সে তৎপুরুষ হয়েছে কি কাপুরুষ হয়েছে তা তার ব্যাসবাক্য থেকেই বুঝতে পারবেন।

যাক্ সে-কথা।

যে অঞ্চলে আমার কৈশোরক পর্বের অধিষ্ঠান সেই পরিচিত দ্যাবাপৃথিবীর সাত আটটি গ্রাম ধরলে সংখ্যালঘু হিন্দুদেরই প্রতাপ ছিলো বেশি। ধর্মভিত্তিক আসন সংখ্যার জোরে কোনো মুসলমান ভদ্রলোকই য়ুনিয়ন বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হতেন। কিন্তু বিদ্যা ও বুদ্ধিতে, রুপো ও রোজগারের জোরে জনবাহিনীতে হিন্দুরা করতো রিসালাদারি। তালুকদার তরফদার মজুমদার ভিহিদার জায়গিরদার উপাধির আড়ালে যারা জমির দখলী স্বত্ব ভোগ করতেন তারা বিশুদ্ধ হিন্দুসন্তান। আর হলধর বর্গাদাররা ছিলো তিন-ওক্ত নমাজ-পড়া মুসলমান সন্তান। অবস্থাপন্ন আট দশ ঘর মুসলমান পরিবার দেখেছি এবং তাদের হিন্দু প্রজা বা নোকরও দেখতে পাইনি এমন নয়। কিন্তু রুখা মাইনের দিনমজুর আসতো প্রায় সবই ওপাড়া থেকে। তারা লাঙলে বলদ জুড়ে চাষ করতো, জমিতে মই দিতো, ধান পাট বুনতো, নিড়েন দিয়ে আগাছা তুলতো, ধান কাটতো, পাট ভেজাতো, কাঠের ওপর আঁশের গোছা আছড়াতো। মোদ্দা কথা, খোরাকি জোটানোর বিনিময়ে চাষবাসের কঠোর পরিশ্রমটা করতো গরিব মুসলমানেরা। যখন খেতের কাজ থাকতো না তখন তারা করতো ঘরামি বা করাতির কাজ। তবে গরিবীয়ানায় শুধু মুসলমানদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিলো না, হিন্দুদেরও ছিলো। তবে তারা অনেকে রেখে ঢেকে চলতো।

তিরিশের দশকের শেষ দিকে আমার তিন দাদা পদস্থ না হলেও যখন পদাতিক হয়েছেন, তখন মা রান্নাঘরের কাজের জন্য রাখলেন দেব-নন্দিনী নন্দরানীকে। বুদ্ধির বয়সে ও কাঁচা ছিলো বটে, কিন্তু শরীরের

সামর্থ্যে নয়। অসুরদলিনীর মতো খাট্‌তে পারতো। ওকে আমি খেপাতুম।

— ও নন্দরানী, তোমার গোপাল কই ?

—হবে গো, হবে !

—কবে ?

নন্দরানী একগাল হেসে বলতো : আগে ভালো করে তেগা মরিচ দিয়ে পান্তা খাই, গায়ে জোর বাড়ুক। তারপর।

একগাদা কুঁড়ি লঙ্কা এগিয়ে দিয়ে বলতুম : এই নাও।

নন্দরানী একটা টিপে মুখ বিকৃত করে বলে উঠতো : আরে, ছ্যা ছ্যা। এই তেগা মরিচ দিয়ে পান্তা খেলে গতর বাড়ে ? আমি নেবোনি।

কুঁড়ি অর্থে 'তেগা' নন্দবংশজাত শব্দ।

কখনো আদুরে গলায় বলতুম : ওগো নন্দদি, তোমার উমর কত ?

—তা দু' দশ হবে।

—তোমার যে একটা ছেলে হয়েছিলো, বেঁচে থাকলে তার উমর কত হতো ?

—তা দু' দশতো হতোই !

ঠাট্টা করে বলতুম : দু' দশে যে কুড়ি হয়, জানো ? তা তুমি আর তোমার ছেলে কি সমান ?

নন্দরানী রাগ করতো না। বলতো অতশত বুঝিনে, বাপু। ওই দ্যাখো না, পাউপা গাছ দুটো সমাল অম্বা। মাগো শুদুলে জানিত পারবা. সরুপারাটা মোটাপারাটার মাইয়া।

হেসে আমি গড়িয়ে পড়তুম। গোপালজননী নন্দরানী নিজস্ব কণ্ঠকোষ থেকে যুগপৎ প্রসব করলেন একরাশ অনিন্দ্য নাদ। এ ভাষা পুরোপুরি আঞ্চলিক নয়, অনেকটাই নান্দিক। ওর যুক্তি শুনলে টোলের ন্যায়তীর্থমশায় মূর্চ্ছা যেতেন। শরীরের মাপে যে বয়সের মাপ চলে না, সেটুকু বুঝবার মতো বয়স তখন আমার হয়েছিলো। কিন্তু নন্দদির যুক্তির ধোকড় ছিলো তার নিজেরই সেলাই-করা শিল্পকর্ম।

হয়তো পড়তে বসেছি, তখন শুভাগমন নন্দরানীর। বুঝতুম কোনো গোপন কথা এযাবৎ ফাঁস করতে না পারায় তার পেট ফুলে উঠেছে। অপেক্ষা করে থাকতুম তার বাক্যসুধার জন্য।

—জানো, ছোটবাবু, আজ বড়োদিঘিতে জল আনতে গিছিনু। হেমনি সময় হোই পাড়ার মেজ কত্তা আমাকে—

—কী, বিয়ে করতে চেয়েছিলো ?

—হ্যাঁ, বাবু। বল্‌লি পেত্তোয় হবনি, ফিস্‌ফিস্‌ করে কত্তা বললুন. মা নন্দ, তোকে একটু পীরেত কত্তে ইচ্ছে কচ্চে।

আমার স্কুলের সময় হয়ে এসেছে। এখনও জ্যামিতির একস্ট্রা করা বাকি। তাই তড়িঘড়ি ওকে ভাগিয়ে দেওয়ার দরকার ছিলো। তেড়েমেড়ে বললুম : এই নিয়ে ক'জন তোমাকে বিয়ে করতে চাইলো ?

নন্দরানী মিনিট পাঁচেক ধরে গুণলো। কয়েকবার হোঁচট খেলো। কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারলো বলে মনে হলো না। হাল ছেড়ে দিয়ে বললো : তা দু' দশ হবে।

বুঝলুম শ্রীমতীর সব হিসেবই চলে দু' দশের চালে। ঠাট্টা করে বললুম :

তা কুড়ি সোয়ামীর ভাত রাঁধতে পারবে তো ?

—পারবোনি কেনে? ছেন্দ ধানের পাঁচমণি ডেগ এই দু' হাতে লামাই না ?

সে-বেলার মতো চৌপদী দ্রৌপদীকে বিদায় দিলুম। ও দশাসই শরীরটা তুলে বললো : মিঞাকে নাস্তা দিয়ে আসি, হেই ছোটবাবু।

মিঞা মানে আলিমুদ্দিন খাঁ। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই দিন-মজুরের কাজ করে। মাটি কোপায়, বেড়া বাঁধে, জঙ্গল সাফ করে। শান্ত প্রকৃতির ছোটোখাটো মানুষ। কিন্তু খাটতে পারে অসুরের মতো। জমিজমা কিছু নেই ; বড়ো গরিব। প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর আর নিকে করেনি। মায়ের আলিমুদ্দিনকে বড়ো পছন্দ। কাজের লোকের দরকার হলেই ওকে ডাকে।

খিড়কির পুকুরে চান করতে যাচ্ছি। দেখতে পেলুম, নন্দদি আলিদার গা ঘেঁষে বসে নাস্তা খাওয়াচ্ছে। বাসি রুটির থালাটা উপুড় করে সব ঢেলে দিয়েছে আলিদার মাটির সরায়। হেসে হেসে কথা কইছে। আমি একটু থমকে দাঁড়ালুম। তবে কি নন্দদির দু' দশের হিসেবের মধ্যে আলিদাও আছেন ?

ব্যাপারটা টের পাওয়া গেলো দিন পাঁচেকের মধ্যে। নন্দদি বেপাত্তা। মা ওর ভাইকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু কোনো হদিস দিতে পারলেন না তিনি। কিন্তু তাকে তেমন উদ্বিগ্নও দেখা গেলো না। একটা পেটের দৈনিক খোরাকি জোগানো থেকে রেহাই পাওয়া গেলে খুশি হয় সংসারের সব গরিব মানুষই। রান্নাঘরের কাজের ঝক্কাট পোয়াতে পোয়াতে মা রেগে গিয়ে বললেন : মেয়েটা বেহদ্দ বদমাইশ্। ও ফিরে এলেও আর রাখবো না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, আলিমুদ্দিন খাঁও আর কাজে আসছেন না। তার বাড়িতে লোক পাঠানো হলো। আলিদার বুড়ী ফুফু বেদম কাশতে কাশতে যেটুকু বললেন, তাতে বোঝা গেলো হারামির ব্যাটা কাঁধে বোচ্‌কা ঝুলিয়ে ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

কিন্তু ফকির সাহেবের সাচ্চা খবর আনলেন লোমশ ভট্টাচার্য। রতনে রতন চেনে। আলিদা মহকুমা সহরে পাটের আপিসে কুলির কাজ নিয়েছেন। দু'

দশের সৌভাগ্যবতী শ্রীমতী নন্দরানীও আছেন তার সঙ্গে। তারা ঘর বেঁধেছেন নদীর ধারে টিনের চালায়।

মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মেয়েটা কিছু নিয়ে পালায়নি তো? পাথরের বাসন থেকে তুলোর আসন পর্যন্ত সব কিছুর হিসেব নেওয়া হলো। না, কিছু চুরি যায়নি। শুধু ধানী লঙ্কার গাছ দুটো একদম খালি হয়ে গেছে। একটাও পড়ে নেই।

আমি মনে মনে ভাবলুম, নন্দদির গতর এবার নিশ্চয় বাড়বে।

খবরটা চাউর হতেই সব পার্টিরই পলিট ব্যুরোর মীটিং শুরু হয়ে গেলো। একটা গ্রুপে সুন্দর ঠাকুরমা, ছোটঠাকুরমা, মা ও মাতৃভগিনী কাকীমা। গোপন বৈঠক, ইন্-ক্যামেরা সেসন। চেয়ারম্যান যতদূর বোঝা গেলো সুন্দর ঠাকুরমা। তিনি বহুদর্শিনী, কেননা অকাল মৃতদের বাদ দিয়ে দশটি সন্তানের জননী। বয়সে জ্যেষ্ঠ বলে ভ্রষ্টাচারের জ্ঞানকাণ্ডেও শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় গ্রুপে ছিলেন আমার তিন নতুন বৌদি ও কনকবৌদি। মাঝে মাঝে চতুষ্কণ্ঠের কলরোল যেভাবে চন্‌চন্ করে চড়ছিলো এবং চাপাগলায় কনকবৌদির শাসনের নামে ভাষণ শোনা যাচ্ছিলো তাতে শেষোক্তাই যে গ্রুপ লীডার তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয়নি। চাট বৌ-ঝিদের বরাবরই রসনারোচন। নন্দরানীর উপাখ্যান অম্লমধুর স্বাদে বধূমহলে মুখরোচক হয়ে উঠেছিলো।

মেজদি, সেজদি ও ছোড়দি সকৌতুক দৃষ্টিবিনিময় ও নিঃশব্দ গা-টেপাটেপি করে নিজস্ব কোডে খবর চালাচালি করছিলো। ওরা সবে ফ্রকের ব্লক ছেড়ে শাড়ির শামিয়ানায় গিয়ে পৌঁচেছে। এখন ওদের অবস্থা নতুন প্রমোশন-পাওয়া ছেলেমেয়েদের মতো—বাইরে ভীরু-ভীরু ভাব, ভেতরে গোপন আনন্দ। মেজদির বিয়ের কথাবার্তা চলছে, সুতরাং দেখা গেলো স্বাভাবিক অধিকার বলেই তিনি নেত্রীপদে আসীনা।

কিন্তু এই তিন মহলের কোনো থামালেই চড়ে বসা দূরে থাকুক, ধরে বসার সুযোগ হলো না আমার মতো ছেলেদের। যেখানেই যাই সেখানেই খেঁকানি খাই। এখানে কেন ঘুরঘুর করছিস্? যা পড়গে। শুধু বড়োদের কথা শোনার শুলুক সন্ধান!

অথচ চোদ্দ পেরিয়ে তখন পনেরোয় পা দিয়েছি। উঠেছি টিনের ঘর পেরিয়ে দরদালানে, ক্লাশ টেনে। আমি এখন আর কচি খোকাটি নই, দস্তুর-মতো ধুতি পরি। মনে মনে রাগ হলো। শাড়ি পরলে মেয়েরা যদি বুড়ি হয়ে যায়, তবে ধুতি পরলেই ছেলেদের বাড়তি ধরা হবে না কেন? ওদের বেলা বলবে, কেমন বুদ্ধিমতী মেয়ে! আর আমাদের বেলা এঁচোড়ে-পাকা ছেলে! আসলে ঈশ্বর নামক ভদ্রলোক ঠিকমতো রেফারিং করতে জানেন না, তিনি আদপেই ইম্‌পারসিয়েল নন।

এতো গেলো জেনানা-ফাটকের কথা। এবার খাসদরবারের কথা শুনুন।

সমাজপতিদের সুপ্রীম কোর্ট বসলো আটচালা ঘরে। ইমারজেন্সি সেসন। ডিভিসান বেঞ্চ নয়, একেবারে ফুল বেঞ্চ। চীফ্ জাস্টিস চৌধুরীকাকা তো আছেনই, অন্যান্য বিচারপতিরাও যথাসময়ে আসন পরিগ্রহ করলেন। চোখ-মুখের হাবভাব পদমর্যাদা ও বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী বেশ গুরুগম্ভীর। বেশ বোঝা গেলো পেনাল কোডের ধারাগুলি তাঁদের মগজের মধ্যে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে। কোর্টরুম ভিড়-ভরতি। মাননীয় বিচারকরা ছাড়া সমাজ-কল্যাণ দপ্তরের ছোট-বড়ো মাঝারি আধিকারিকবৃন্দ – স্বেচ্ছানিযুক্ত কুশলী কৌঁসলীবৃন্দ এক বগলে শাস্ত্র-সংহিতা ও অন্য বগলে শস্ত্র-ছাতা নিয়ে উপস্থিত। মান্ধাতার আমলের নড়বড়ে তক্তপোশ সব মহাজনকে ধারণ করতে পারলো না। সুরেনদাদুর বাড়ি থেকে একটা অর্ধজীবিত পাটিও রিকুইজিসান করতে হলো। প্রীতীশ ছিলো দূরদর্শী, তাই বিচারালয়ের পশ্চাদ্ভাগে দুটি গোলাকার ছিদ্র কর্তন করে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে রেখেছিলো। আমরা সেই গোলকযুগলে বীক্ষণশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী চোখের দূরবীণ লাগিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলুম! সূর্য, চন্দ্র গ্রহ, নক্ষত্র, এমন কি ধূমকেতু পর্যন্ত সকলকে নিয়ে পুরোপুরি আলোকিত সমন্বয়। একী, লোমশ ভট্টাচার্যও যে আছেন! আজ আর দরজার ধারে কাচুমাচু ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান নয়, পাটির অগ্রভাগে সগৌরবে দীপ্যমান।

প্রীতীশকে ফিস্‌ফিসিয়ে সে-কথা বলতে সে আইনশাস্ত্রের অধ্যাপকের মতো হাঁড়িমুখে বললো : উনি আজ আসামী নন, রাজসাক্ষী।

পরে ওর কাছেই জেনে নিয়েছিলুম রাজসাক্ষী কথাটার অর্থ কি।

বিকেল গড়িয়ে কখন রাত্রি এসেছে কারো খেয়াল নেই। গুরুতর সমস্যার সমাধান তো আর ঘড়ি ধরে হয় না! যেমন আমাদের দেশের খাওয়া-পরার সমস্যা। সে যাক্। শুরু হলো মিডনাইট সেসন। ঘরের পেছনে হুঁকো-কালো অন্ধকারে মশার কামড়ে আমাদের তখন কাহিল অবস্থা। তবে রক্ষে মশারা শুধু কামড়ায় না, গানও গায়। এবং সে গান লংপ্লেয়িং রেকর্ডের মতো।

ইতিমধ্যে কত ভরি মতিহারী তামাক শেষ হয়েছে, তা জানে চৌধুরীদের মুনীষ রাখালদা। সেই দুপুর থেকে ছিলিমের পর ছিলিম সাজিয়ে গেছে। এখন ক্লান্ত হয়ে তিনি আটচালা ঘরের দাওয়ায় বসে ঝিমোচ্ছেন। প্রচুর তর্ক, প্রচুরতর ধূম উদ্গীরণ ও প্রচুরতম কাশির পর সাব্যস্ত হলো, নন্দরানীর চেয়ে আলিমুদ্দিনের অপরাধ বেশি। মেয়েমানুষ অবলা জীব, আত্মরক্ষায় অসমর্থ। কিন্তু আলিমুদ্দিন জোয়ান মদ্দ। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার দায় পুরুষের। তার চেয়ে বড়ো কথা, হিন্দু মেয়েকে যদি ফুসলিয়ে মুসলমান ছেলে বার করে নিয়ে যায় তবে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে টিকিয়ে রাখা যাবে না। আর সেটা ঘটবে উপস্থিত মহাশয়দের চোখের সামনে? মনু থেকে বাবুরবাজারে মানবরক্ষ

স্মৃতিতীর্থ পণ্ডিতের অমোঘ বিধান উদ্ধৃত করা হলো। সবাই একমত হলেন। কোনো ডিসেণ্টিং নোট নেই।

আটাশ ইঞ্চি বুকের ছাতিওয়ালা বিশ্ববন্ধু আচার্য উঠে দাঁড়ালেন। ক্রোধে লম্ফঝম্ফ মারলেন খানিক। রাইফেলের সঙ্গীনের মতো তর্জনী উঁচিয়ে বললেন : আলিকে শূলে চড়ানো হোক্।

কিন্তু এবার সবাই নীরব। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? সুরেনদাদুর তখন আফিং খাওয়ার সময় হলো, চক্রবর্তী মশায়েরও নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছিলো। অন্যরাও অবস্থা বুঝে চুপচাপ। হঠাৎ নাদুস-নুদুস সুবন্ধু আচার্য গর্জন করে উঠলেন : শূলে চড়াবে ওই খ্যাংরা কাঠি আলুর দম?

দুই ভাইয়ের চিরাচরিত ঝগড়া আবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাগড়া তোলে সেই ভয়ে সুরেনদাদু হস্তক্ষেপ করলেন : পরেশ যে খবর এনেছে, সেটা একটু যাচাই করে নিতে হবে।

লোমশ গোঁ গোঁ শব্দে কি যেন বলার চেষ্টা করলো।

চৌধুরীকাকা প্রচণ্ড ধমক ছুঁড়ে মারলেন : তুমি থামতো, পরেশ। তাহলে চক্রবর্তীমশাই, বিশ্ববন্ধু আচার্য ও শরৎ নাগকে নিয়ে একটা অনুসন্ধান সমিতি গঠন করা হলো।

অর্থাৎ কমিশন বসলো। সেদিন মশার কামড় খেতে খেতে অল্প বয়সের মন নিয়ে সিদ্ধান্তের তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। আজ বুঝতে পারছি, কমিশন বসানো মানে বিষয়টাকে ধামাচাপা দেওয়া। সেই ট্র্যাডিশন আজো সমানে চলেছে।

দিন কয়েক পরে এলো অন্য পক্ষের চাঞ্চল্যকর খবর। সে-খবরেরও বার্তাবহ লোমশ ভট্টাচার্য। সে বুক চিতিয়ে বললো : বলছি শুনুন, জোতদার দায়াগাজির বাড়িতে মুহুর্মুহু বৈঠক বসছে মুসলমান মাতব্বরদের। আলোচ্য বিষয়, নন্দরানী-আলিমুদ্দিন কেচ্ছা। ওদের ধারণা, মুসলমান পরিবারে কুমারী, তালাক-দেওয়া মেয়ের অভাব ছিলো না। আলিমুদ্দিনের মতো খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনে আর যা কিছুরই অভাব থাকুক ঘর করবার মতো মেয়েমানুষের অভাব ছিলো না। ওই নন্দরানীই আলির মতো গোবেচারা ছেলের মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছে। তার পেছনে আছে নিশ্চয়ই হিন্দু ব্যাটাদের উস্কানি। ওদের শায়েস্তা করতে হবে।

শুনলুম, এই নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে। ম্লেচ্ছরা নাকি লাঠিসোঁটা, ডাণ্ডা, কোঁচ নিয়ে রেডি হচ্ছে। ঢাকায় ঘন ঘন দাঙ্গা হয়ে যাবার পর ওই শব্দটির অর্থ আমার মতো ছোটদেরও অজানা ছিলো না। বড়োরাতো জানতেনই, কারো কারো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিলো। দেশের আবহাওয়া দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে—টের পাচ্ছিলুম। প্রতি শুক্রবার মসজিদে মসজিদে গরম গরম বক্তৃতা হচ্ছিলো। সুতরাং নন্দদির ব্যাপার নিয়ে

দাঙ্গা বাধার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলো না কেউ। সুরেনদাদু, চক্রবর্তীমশাই ঘরবন্দী হয়ে রইলেন। বিশ্ববন্ধু আচার্য কুমড়োর ফালি, লাউশাক, জোড়ামুলো ফি নিয়ে হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্‌টিস বন্ধ রাখলেন কয়েকদিন। শুধু চৌধুরীকাকা শক্ত ধাতুর মানুষ বলে আগের মতোই নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে প্রাত্যহিক কাজকর্ম করে যেতে লাগলেন।

এর পর দিন পাঁচেক শত্রুপক্ষের দিক থেকে কোনো সাড়া-জাগানো খবর পাওয়া গেলো না।

ষষ্ঠদিনে বড়োদিঘিতে চান করতে যাচ্ছি। দেখলুম লোমশ ভট্টাচার্য হাসিমুখে সুরেনদাদুর সঙ্গে কথা বলছেন। আটচালা ঘরের কাছাকাছি একটা মোটা কাঁঠাল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাঁদের অন্তরঙ্গ আলাপ শুনলুম।

—ওহে পরেশ, ওদিকের সংবাদ কি?

—আজ্ঞে, ঘোষদাদু, একটা ছোট পট্‌কা ছাড়তেই ওদিকের সব ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

—বল কিহে! কাজ হাসিল করলে কি করে?

—বাজারে যাচ্ছি, দেখলুম উল্টো দিক থেকে দায়াগাজি আসছেন। একটা সেলাম ঠুকে বললুম: খবর কী, গাজি সাহেব?

তিনি গম্ভীরমুখে বললেন: মোছলমানকে তোমরা বেইজ্জত করবে আর আমরা আলখাল্লা পরে থাকবো এটা ভেবো না।

আমি কাছাকাছি গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বললুম: আলবত। আমি হিঁদু হলেও ওরা আমাকে বেআব্রু করে ছেড়েছে। ওদের বেয়াদবি বেড়েই চলেছে। দেখলেন না, নন্দরানীকে দিয়ে আপনাদের মুখে চুনকালি কেমন মাখিয়ে দিলো! ওদের তড়পানো যদি বরাবরের মতো ফয়সালা করে দিতে পারেন তবে আল্লার দোয়া আপনাদের ওপর কতখানি আছে, বুঝতে পারবো। কিন্তু যা করবেন, ভেবেচিন্তে করবেন। বেমক্কা কিছু করলে—

—কি হবে? ওদিকের খবর কিছু রাখো?

—চৌধুরীবাবুর তো একটা বন্দুক ছিলোই, আরো তিনটে আনিয়েছেন কলকেতা থেকে। সঙ্গে বাক্স-ভর্তি তাজা কার্তুজ। তাই ভাবছিলুম কি, ওরা আবার আপনাদের বেকায়দায় না ফেলে দেয়—

দায়াগাজিকে চিন্তিত দেখা গেলো। তিনি দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন: তা তুমি কি করতে বলো?

—আমি বলি কি, আপনি পবিত্র ইসলামের ফতোয়া অনুযায়ী আলিকে শাস্তি দিন। আর হিঁদুদের নামে তিনবার থুথু ছিটিয়ে দিন। বেহেস্তের দরোজা আপনার জন্য ঠিক খুলে যাবে।

সুরেনদাদু অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন: ওরা শেষ পর্যন্ত কি ঠিক করলো, জানো?

লোমশ ভট্টাচার্য বুঝলেন, কেল্লা ফতে! তিনি বিজয়ীর হাসি হেসে বললেন : দায়াগাজি ফিরে গিয়ে মক্তবে সভা ডেকেছেন এবং আমার উপদেশ মতো বার তিনেক থুথু ছিটিয়ে বিশুদ্ধ হদীস মতে বিধান দিয়েছেন : আলি কাফের। উসকো নিকাল দাও। হায়াৎ খাঁ একটু ওজর আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু গাজিসাহেব তাকে আমল দেননি। সুতরাং আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভট্টাচার্যের কাঁধে হাত রেখে সুরেনদাদু বললেন : বাবা, পরেশ, তোমার ওপর আমরা অবিচার করেছিলুম। দোষ আমাদের, তোমার নয়। সমাজের তুমি কি যে উপকার করলে, ঈশ্বরই জানেন! আমি আজই জানিয়ে দিচ্ছি সবাইকে, এখন থেকে তুমি আটচালা ঘরের স্থায়ী সদস্য হলে।

আমি আর দাঁড়ালুম না। বড়োদিঘির দিকে চলতে চলতে অনুভব করলুম, চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। মনে মনে ভাবলুম : কুসুমদি, তুমি বৃথাই মলে! কি তোমার অপরাধ ছিলো, জানি না। কিন্তু ছোট হলেও এইটুকু জানি, তোমার চেয়ে লোমশ ভট্টাচার্যের অপরাধ কম ছিলো না। অথচ ওই ধড়িবাজ লোকটা প্যাঁচ কষে সমাজপতি হয়ে গেলো। অথচ তোমাকে মরতে হলো। তোমার জন্য আমার বুকটা কেমন করে উঠছে, কুসুমদি!

যে সময়ের কথা বলছি তখনো পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায় হয়ে ওঠেনি। পুরুষানুক্রমে এরা পাশাপাশি বাস করছে, একে অপরকে চেনে। সময়ে অসময়ে পরস্পরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। সত্যপীরের পুজোয় দেখেছি মুসলমান পুরোহিত। হিন্দুর দুর্গাপুজোয় মুসলমান দর্শনার্থীরা ভিড় করতো। হিন্দু জমিদারের মুসলমান প্রজা ছিলো, মুসলমান জমিদারের ছিলো হিন্দু প্রজা। বড়ো লোক গরিব মানুষ ছিলো দুই সম্প্রদায়েরই মধ্যে। মহরমে মুসলমানের তাজিয়া বার করা ও দুর্গোৎসবে প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটতে দেখিনি কখনো। পুজোর দালানের সামনে দিনমজুর পশ্চিমাস্য হয়ে নিঃসংশয়ে নমাজ পড়তো, ঈদ মোবারক জানাতে মিঠাইমণ্ডা হাতে হিন্দুর বাড়িতে আসতো। বিয়েসাদিতে হিন্দুরাও নেমন্তন্ন করতো মুসলমানদের। তাদের মধ্যে পায়েস দুধ-বাতাসার সম্পর্ক না থাকুক, কিন্তু মাছের ঝোলে আলু-বেগুনের সম্পর্ক নিশ্চয়ই ছিলো। ধর্ম ছিলো যার-যার তার-তার। কিন্তু রাজনৈতিক ধড়িবাজ ও ধর্মধ্বজী পাণ্ডারা আপন আপন ফায়দা তুলতে গিয়ে দাঙ্গার নামে ধর্মযুদ্ধের কায়দা রপ্ত করে ফেলেছেন। যেন তারাই এখন দেশের মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের একমাত্র হিস্যাদার। কিন্তু আমার জমাখরচের হিসেবটা দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের হিসেবের সঙ্গে কোনোকালেই মেলে না। সংসারের গোশালায় যারা দুধেল গরু দোয়, অথচ দুধের ছিটেফোঁটাও পায় না, তারা লুঙ্গি কিংবা ফাড়া-কানি

যাই পরুক না কেন তাদের একজাত। আর দুধপোষ্য হোমরা-চোমরারা, তা হাতে তাদের কোরান কিংবা পুরাণ যাই থাক্ না কেন, তাদের আরেক জাত। এটুকু বোঝার জন্য চোখ ও কানই যথেষ্ট, কোনো ইজ্‌মের ভজনা করবার দরকার নেই।

এতো হাজব্যাণ্ড ও ভ্যাগাবণ্ড আকন্দদাসের ভাবনা। সে-ভাবনার বাজারদর সাতকাহন নয়। মানুষের দাম নামে নয়, ধর্মে নয়—ঘামে, একথা যদি আপ্তবাক্য হতো তবে এই অধম এতদিনে শাক্যসিংহ হয়ে উঠতো। অতএব আকন্দের মন্দ ভাগ্যের কথা চুলোয় যাক্।

চান করে ফেরার সময় মনে পড়লো দায়াগাজির কথা। লোকটি কি খারাপ? দাঙ্গাবাজ? কই, আমার তো তা কখনো মনে হয়নি!

মনে পড়ছে একদিনের কথা। তার বছর খানেক আগে বাবার মৃত্যু হয়েছে। আমাদের অবস্থা তখন কেনেস্তারা পিটিয়ে বলবার মতো নয়। না-চলতে না-চলতে কোনোরকমে চলছে। বাইরের উঠোনে শীতলাতলার বেদিতে আমি ও ছোড়দি বসে গল্প করছি।

তালতলা দিয়ে আসছিলেন এক মুসলমান ভদ্রলোক। ছোড়দি বললো: কে রে লোকটা?

ভদ্রলোক ততক্ষণে সামনাসামনি এসে গেছেন। নাম বলার উপায় নেই। তাই কোড ল্যাংগুয়েজে ছোড়দিকে বললুম: চিদা চিয়া চিগা চিজী।

তিনি কথাগুলি শুনতে পেয়েছিলেন। পেছন ফিরে মুচ্‌কি হেসে বললেন: হ্যাঁ, আমার নাম দায়াগাজি।

তারপর এগিয়ে এসে বললেন: কিন্তু আমাকে নাম ধরে ডাকা তোমার পক্ষে কি উচিত, বাবা? তুমি এখন থেকে আমাকে দায়াচাচা বলে ডাকবে। কেমন?

আমি লজ্জায় অধোমুখে বসেছিলুম। মাথা নেড়ে সায় দিলুম।

—মায়ের থানে বসে আছো। উঠে আসোতো একটু।

উঠে গিয়ে কাছে যেতেই তিনি বিড়বিড় করে কী উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন: লেখাপড়া করছো তো, বাবা? মন দিয়ে পড়বে। মুকুন্দদার মতো মানুষ ছিলো না। কিন্তু কত কষ্ট পেয়ে গেছেন! এই যে আজ আমি খেয়ে-পরে ভালো আছি তা শুধু তোমার বাবার পরামর্শে। তোমরা বড়ো হবে, এই ছিলো তাঁর স্বপ্ন। আল্লা তোমাদের দোয়া করুন।

আমি স্পষ্ট দেখলুম তাঁর চোখ ভিজে। আমার চোখও শুক্‌নো ছিলো না।

আরেক দিনের কথা। সরকারি খাজনা কোনো এক সূর্যাস্তের আগে না দেওয়ায় আমাদের সামান্য প্রজাপত্তনি লাটে উঠলো। দফাদার ঢোল পিটিয়ে 'নোটিশ' জারি করে গেলেন। দাদারা সব কলকাতায়। মা কী করবেন

বুঝতে না পেরে মহকুমা সহরে উকিলকাকার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। প্রায় চার মাইল হেঁটে যখন গিয়ে পৌঁছোলুম, তখন তিনি কোর্টে বেরোচ্ছেন। সব শুনে বললেন : চল্।

তাঁর জামগাছওয়ালা বাসার সামনেই সিভিল কোর্ট। সেরেস্তাদারের সঙ্গে একটু কথা বলে আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন : মহামান্য হুজুর, তাকিয়ে দেখুন একটি নাবালক আপনার সামনে দাঁড়িয়ে। নাবালকের সম্পত্তি লাটে উঠতে পারে না।

হুজুর চশমার ফাঁক দিয়ে আমার ধুলো-পা ছন্নছাড়া চেহারাটা একবার দেখে নিলেন। তারপর বললেন : এ কাঁচা বটে, তবে দড়কাঁচা। বয়স কত ?

—চোদ্দ।

—হেডমাস্টারের সার্টিফিকেট আছে ? স্কুলে পড়ে তো ?

—পড়ে।

বলে একটু থামলেন।

কোর্টে দাঁড়িয়ে সেই আমি প্রথম কথা বললুম : সার্টিফিকেট আনতে হবে আমি জানতুম না। সময়ও হাতে ছিলো না। কাল এনে দেবো।

নাবালকের বালভাষণে মহামান্য হুজুর কর্ণপাত করলেন না। আমাকে উপেক্ষা করে উকিলকাকার দিকে তাকিয়ে বললেন : এজপ্রুফ ছাড়া সরকারি আদেশ আমি রদ করি কি করে, মিঃ ঘোষ ?

এমন সময় ঘর্মাক্ত কলেবরে হন্তদন্ত হয়ে কোর্টরুমে প্রবেশ করলেন দায়াগাজি। কার কাছ শুনে ছুটে এসেছেন প্রায়-বৃদ্ধ। হুজুরকে সেলাম ঠুকে কাঠগড়ায় আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন : আমার নাম দায়াগাজি। সাকিন সপ্তকাঠি। আমি আকন্দদাসের চাচা হই। আমি ওকে জন্মাতে দেখেছি। আল্লার নামে শপথ করে বলছি, ওর বয়স চোদ্দ।

দায়াগাজি মেটেরিয়াল উইটনেস হিসেবে গ্রাহ্য হলেন। জবানবন্দীর তলায় কাঁপা হাতে সই করলেন। তারপর আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। আমাদের প্রজাপত্তনি লাটে ওঠার আদেশ রদ হলো।

উকিলকাকার বাসায় খেয়ে নিলুম। গাজীচাচা কিছুই খেলেন না। মসজিদে গিয়ে একবার নমাজ পড়ে নিলেন। পথে আমাকে খাওয়ালেন বরফকুচি মেশানো গোলাপী সরবত। ওপরে ভাসছে তোকমারি। আঃ, কী আরাম!

আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে মাকে বললেন : আকন্দ ভালোয়-ভালোয় ফিরে এসেছে। আপনি কিছু ভাববেন না, বড়ী ভাজ! নীলামের নোটিশ খারিজ হয়ে গেছে।

মায়ের অনুরোধে খোলা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে একটু বিশ্রাম করলেন এবং মায়ের হাতে তৈরি এক কাপ চা খেয়ে বিদায় নিলেন।

সেই আকন্দদাসের চাচা দায়াগাজি দাঙ্গাবাজ? হিন্দুর নামে থুথু ছিটিয়ে দেন? তাদের কাফের বলেন? আমার মনে হলো, এ কিছুতেই সত্য হতে পারে না। সব লোমশ ভট্টাচার্যের বানানো গল্প। তাঁর সময় বুঝে তেরছা কারসাজি। তিনি একদিন সমাজে হেনস্তা হয়েছিলেন, আজ সমাজপতিদের হেনস্তা করে স্বয়ং তারকব্রহ্ম হয়ে উঠেছেন। আমার কিশোরমনে অবিশ্বাসের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগলো।

আমাদের তালুকদারির নাভিশ্বাসের দিনে আমার জন্ম। আমার জন্মের আগে কী ছিলো জানিনে, জানার চেষ্টাও করিনি। আমি যখন পরিবারে এসেছি তখন মাঠের জমিজমা বন্ধকীসূত্রে বিশ বছরের জন্য আবন্ধ, খাতকের সংখ্যাও কম নয়। এ-গল্পতো শুরুতেই করেছি। থাকার মধ্যে ছিলো দশঘর প্রজা – পাঁচঘর হিন্দু, পাঁচঘর মুসলমান। খাজনা আদায় হতো বছরে কুড়ি টাকা। উপরি-পাওনা ছিলো বেশ কিছু পাটকাঠি—তাতে সারা বছর আখা ধরাবার কাজ বেশ চলে যেতো। মুসলমান প্রজারা হাসিমুখে দিতেন। আদায়ের সময় ছিলো বর্ষাকাল*।

দাদারা একে একে সবাই সর্বতীর্থসার কলকাতাবাসী হয়েছেন। কেউ চাকুরী করতে, কেউবা পড়তে। বড়দা খুলেছেন পাইস হোটেল। ছয় পয়সায় ডাল মাছ তরকারির তোফা লাঞ্চ। ফুলদা ঠাট্টা করে বলতেন—কলেজ রো'র বেঙ্গল হোটেল নয়, চৌরঙ্গীর গ্র্যাণ্ড হোটেল। নবীন কুণ্ডু লেন, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, পটলডাঙ্গার দোকানী আর কেরানিদের তোফা সাফ্রারি। তখন আর দাদারা মেসবাড়ির মাসিক তিনটাকা ভাড়ার তক্তপোশে আরূঢ় নন, বড়দার হোটেলের দোতলায় দুখানা বড়ো ঘরে সসম্মানে সমারূঢ়। একটা রংদার বাড়ি খোঁজা হচ্ছে, নতুন বৌদিরা সেখানে গিয়ে সংসার পাতবেন বলে। এই অধম আকন্দদাসই এখন জমিদারের দৌহিত্রকুলের অকূলে হাল ধরে আছে।

সেই আমার গ্রাম-জীবনের উপানন্দ বর্ষা। আর একটা বর্ষা—যাকে বলতে পারি পূর্ণানন্দ বর্ষা—কাটিয়ে আমিও পাড়ি দেবো কলকাতা। হিন্দু প্রজা আচার্যদের বসতি ছিলো লাগোয়া। আমাদের বাড়ির মেয়েদের আনাগোনা ছিলো তাদের বাড়িতে। মা নিজেই খাজনা আদায় করতেন আচার্যদের কাছ থেকে।

এক রবিবার। সকালে মা ডেকে বললেন, চৌধুরীদের খাব-খাওয়ানো নতুন নৌকো যোগাড় হয়েছে। লগি দিয়ে নৌকো বাইবে দে-দের বাড়ির নটবর। আমাকে খাজনা আদায়ে যেতে হবে মুসলমান পাড়ায়। পাটকাঠিও সংগ্রহ করতে হবে। বেশ কয়েক বছর ধরে এটা ছিলো আমার বাৎসরিক কাজ।

মন্দ লাগতো না। গলায় মালা পরতে বর-বর লাগে নিজেকে। তেমনি রজতরূপিণী খাজনা ও শলাকারূপিণী নজরানা আদায়ের উদ্দেশ্যে

প্রজা-পত্তনিতে সাড়ম্বর অভিযানের সময়েও আমার নিজেকে রাজপুত্র-রাজপুত্র বলে মনে হতো। তাই মায়ের কথায় রাজী হয়ে গেলুম। ষাণ্মাসিক পরীক্ষার ভাবনা তখন সাহসিক যোদ্ধার মতো পশ্চাদপসারণ করেছে।

শাদা প্যান্ট আর চেক সার্ট পরে তখন স্কুলে যেতুম। উৎসবে-ব্যসনে পরতুম ধুতি ও শাদা সার্ট। আজকের অভিযান রাজকীয় কর্ম। সুতরাং ধুতি-সার্টে সুশোভিত হয়ে নৌকোয় আরোহণ করলুম। মা পেছনে 'দুর্গা দুর্গা' উচ্চারণ করলেন। পাটাতনে বিছিয়ে-দেওয়া কম্বলাসনে সমাসীন হলেন পাটলিপুত্রের রাজকুমার ভোম্বলরাম। গলুইয়ে দাঁড়িয়ে লগিধর নটবর ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে দিলো সম্বলপুরের উদ্দেশে। রসিক পাঠক, আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন প্রজারাই রাজার সম্বল। সুতরাং প্রজাপুর যাত্রা মানেই সম্বলপুর যাত্রা।

রাজসিক স্টাইলে বসে থাকতে থাকতে কোমরে ব্যথা ধরার উপক্রম। নটবর যে এমন লাবড়া মানুষ তা জানতুম না। শেষ পর্যন্ত পৌঁছানো গেলো রায়তি-ভুক্তিতে। অবশ্য হিক্কা ওঠার আগেই। তার জন্য নটবরের অদম্য হিকমতের প্রশংসা করতে হয়।

অতি কষ্টে কাদার আওতা থেকে জুতোজোড়া বাঁচিয়ে ময়ূরপঙ্খী থেকে নামলেন রাজপুত্র। কোঁচাটাকে বাঁ পকেট থেকে নামিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন। সার্টটার ওপর হাত বুলিয়ে দুরস্ত করে নিলেন ভাঁজগুলোকে। তারপর দুর্ধর্ষ পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন করিম খাঁর খড়ের ছাউনিওয়ালা ডেরার উদ্দেশে।

উঠোনে একটি হাড্ডিসার সবৎসা গাভী দোহন করছিলেন ফতেমাবিবি। করিম খাঁর বৌ। জমিদারনন্দনকে দেখে হ্লাদিনী হাসি হাসলেন . দুই উরুতে ধরে-রাখা মাটির হাঁড়িটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে গরুর পায়ের দড়ি খুলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পরনের সস্তা শ্যাড়িটার জন্মক্ষণের রং কি ছিলো বলা কঠিন, এখনকার রং মিশির মতো কালো। তাতে আবার ক্ষয়িষ্ণু দশা। ধারয়িষ্ণু এদিকে টানেন তো ওদিকে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে যাচ্ছে, ওদিকে টানেন তো এদিকে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আবরণ যাই হোক না কেন সাবরণা সত্য অর্থেই সুশোভনা। ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘের মধ্যে কৈলাসের গৌরী। পাঠক, চোদ্দ বছরের ছেলের জ্যাঠামি দেখে আপনি হাসবেন না। মনে রাখবেন, আকন্দদাস তখন একটু আধটু শ ব্যচর্চা করে।

কোনো কথা না বলে ছিন্নবসনা ফতেমাবিবি সন্ত্রস্তা হরিণীর মতো শৈলেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে অর্থাৎ হোগলার লাগসই বেড়ার মধ্যে অন্তর্হিতা হয়ে গেলেন। বয়সে ছোট হলেও আমি বিবিজানের জেনানাসুলভ অসোয়াস্তি কতকটা বুঝতে পারলুম। কিন্তু নটবর রাজদূত, তার হালচাল রাজকুমারের

হালচালকেও ততক্ষণে ছাড়িয়ে গেছে। সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো : বেহায়া মেয়েছেলে!

একটু বাদেই বিবিজান বেরিয়ে এলেন। হাতে একটা জলচৌকি ও ছেঁড়া চট। আমার দিকে জলচৌকিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন : বসুন, ভাইসাব।

চটটা পেতে দিলেন নটবরের জন্য। কিন্তু রাজদূত তখন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম, গৌরাঙ্গীর পরনে আগেরটার চেয়ে উন্নততর সংস্করণ। এতে অন্ততঃ আব্রু রক্ষা হয়।

—ভাজ, করিমভাই কোথায়?

—হাটে গেছেন। চাল বাড়ন্ত। ধারে যদি কিছু পাওয়া যায়, দেইখতে গেছেন।

—এবার পাট ওঠেনি?

—যা উঠেছিলো, প্যাটের আখায় সব শ্যাষ হয়ে গেছে, ভাইজান!

আমার মনটা দুলে উঠলো। তবু মায়ের নির্দেশ স্মরণে রেখে বললুম : কিন্তু খাজনার কি হবে?

হাতের ময়লা নখ খুঁটতে খুঁটতে ফতেমাভাজ বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন : আজ আমার কাছে কিছু লেই, ছোটবাবু। গিন্নী-মাকে গিয়ে বইলবেন : আপনার করিমভাই গিয়ে একদিন দিয়ে আসবেন।

—আর পাটখড়ি?

—তা লিয়ে যান। হোই সুপারি গাছে যতগুলান বাঁধা আছে, সব লটবরকে পেড়ে লিতে বলুন।

আমি উঠতে যাচ্ছি, ফতেমাভাজ বলে উঠলেন : একটু বসুন, ভাইজান।

তিনি আবার তড়িৎবেগে প্রস্থান করলেন। খানিক বাদে বেরিয়ে এলেন। এক বাটি গরম দুধ, এক ঠোঙ্গা মুড়ি। বললেন : সেবা করুন।

— দুধমুড়ি দিতে গেলেন কেন, ভাজ? ডাংগুলি, কাবাডি খেলতে এসে কতদিন তো মুড়িগুড়সহ জল খেয়ে গেছি। আজ আবার কেন?

— তখন আসতো আমার আকন্দভাই। আজ এয়েছেন আমাদের জমিদারের ছাওয়াল। ঠিকমতো খেজমত না করলে আপনার করিমভাই আল্লার দোয়া পাবেন না।

আমি দ্বিরুক্তি না করে খেজুর-গুড়-মেশানো দুধে মুড়ি ঢাললুম। তাকিয়ে দেখি, নটবর ততক্ষণে নৌকোর গলুইতে গিয়ে বসেছেন। তিনি গরীব হতে পারেন, তা বলে জাত খোয়াতে পারেন না! আমি সশব্দে খেতে আরম্ভ করলুম।

এমন সময় দেখা গেলো, একটু দূরে পথ দিয়ে যাচ্ছেন হায়াৎ খাঁ। তিনি আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এসে বললেন : কি ভাই, মোছলমানের

ঘরে দুধ-মুড়ি খাচ্ছো? জাত যাবে না? চৌধুরীকর্তা, চক্কোত্তিমশায় জানেন?

আমি রেগে গিয়ে বললুম: না জানেন তো আপনি গিয়ে বলে আসবেন।

হায়াৎ খাঁ ফতেমাবিবির দিকে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হেনে চলে গেলেন। ততক্ষণে ভাজের দুটি কালো চোখ থেকে বর্ষা নেমেছে।

পাঁচঘরের জমিদারি পরিক্রমা শেষে শ্রীযুক্ত নটবর দে মহাশয়ের আশ্চর্য কর্মদক্ষতায় যখন বাড়ি পেঁাছোলুম তখন মাতৃঠাকুরানী উদ্বিগ্ন হয়ে ঘর-বাইর করছেন। কিন্তু বালক পুত্রবর ও চালাক নটবরের অবস্থা দেখে তিনি শান্ত-ভাবে সব শুনলেন। অসামান্য পাটখড়ি ও সামান্য রজতকড়ি সংগ্রহে তিনি যুগপৎ আনন্দ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন: সবই তো বুঝলুম। ফতেমা পারলে ফিরিয়ে দিতো না, নবাবও কথার খেলাপ করতো না। কিন্তু ভাবছি, লাটের খাজনা দেবো কি করে? ও ছাই গেলেই হয়!

ভালোয় ভালোয় সেদিন কেটে গেলো। কিন্তু গোল বাধলো পরের দিন সকালে। ষাণ্মাষিকের নাশপতিতে সবেমাত্র কামড় বসিয়েছি এমন সময় মহারানী অধিরানীর দরবারে ডাক পড়লো।

বিরক্ত মুখে বড়ো ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ালুম। দেখি, চক্রবর্তীমশায় দাঁড়িয়ে। মা আছেন কপাটের আড়ালে। আমি আসতেই ব্রাহ্মণপ্রবর সুধাবর্ষণ করলেন: এই তো আকন্দ, একেই জিজ্ঞেস করে দেখুন, ও ফতেমাবিবির হাতে দুধ-মুড়ি খেয়েছে কিনা। আর দুধ-মুড়ি খাওয়া তো অন্নগ্রহণের তুল্য। ও ছোট না হলে ওকে আজই আমরা জাতিচ্যুত করতুম।

আমি রেগে তখন অগ্নিশর্মা। তেড়েমেড়ে উঠে বললুম: খেয়েছি, বেশ করেছি। মুসলমানেরা কি মানুষ নয়?

—কি, কি বললে? শুনলেন বৌমা? মুসলমানরা বিধর্মী, ম্লেচ্ছ। তারা আবার মানুষ!

আমার মুখে তখন খই ফুটছে: হ্যাঁ, স্বধর্মী হিন্দুদেরও আপনারা মানুষ বলে মনে করেন না। ধোপা, নাপিত, মালী, জেলে এলে ওই উঠোনে উবু হয়ে বসে থাকে। আর মতিয়ার রহমান সাব, দায়াচাচা, বসিরউদ্দিন সাব, মৌলবী সাব এলে ওই বেতের চেয়ারে এসে চেপে বসেন। কই তখন তো ওদের ম্লেচ্ছ বলে তাড়িয়ে দেন না!

চক্রবর্তীমশায় অবাক হয়ে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন: দেখলেন তো, বৌমা, আপনার ছেলের তেজ দেখলেন তো! এই ছেলেকে আপনি আচ্ছা করে শাসন করুন, না হলে গোল্লায় যাবে। যাই, একবার চৌধুরীকর্তাকে খবরটা দিয়ে আসি।

আমি তখন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি রাগে। ব্যঙ্গ করে বললুম: যান, যান, যেখানে খুশি যান। আপনাদের দৌড় কতখানি জানি। নন্দদির

ব্যাপারেই দেখেছি। ফতেমাভাজের কাছে আমি আবার খাবো, হাজারবার খাবো।

এমন সময় আমার পিঠে দড়াম করে শব্দ। দরজার আড়াল থেকে মা দেরখো ছুঁড়ে মেরেছেন। চাপাগলার গর্জনও শোনা গেলো: এমন ছেলে থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। কেটে দু'খানা করে ফেলবো।

এটা বরাবরই দেখেছি, মায়ের হাতের কাছে ঠিক সময়মতো দেরখো এসে পোঁছোতো। ওটাই ছিলো ওঁর লাঠ্যৌষধি। সদ্যনিক্ষিপ্ত অস্ত্রটিও হচ্ছে দেরখো। আমার পিঠ তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। চিৎকার শুনে নতুন বৌদিরা ছুটে এলেন। শাড়ির আঁচল দিয়ে বার বার পিঠ মুছে দিচ্ছেন, কিন্তু রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। কে একজন দৌড়ে গিয়ে একরাশ গাঁদাপাতা নিয়ে এলেন। হাতের তালুতে থেঁতলে লাগিয়ে দিলেন ক্ষতস্থানে। ক্রমে রক্ত বন্ধ হয়ে এলো।

প্রাথমিক চিৎকার ছাড়া সেদিন আমি আর কিছু করিনি। কাঁদিনি। আশ্চর্য, যেখানে সামান্য কথাতেই চোখের-জলে আমার বুক ভেসে যেতো, সেখানে স্তব্ধ থামের মতো দাঁড়িয়েছিলুম। তাকিয়ে দেখলুম, চক্রবর্তীমশায় চৌধুরী-কাকার ঘরের দিকে গেলেন না, রক্তারক্তি কাণ্ড দেখে ভুতুড়ে কোঠাবাড়ির পাশ দিয়ে পালিয়ে গেলেন। তাহলে সমাজপতিরা কি সব অনাবশ্যক তেজপাতি?

মেজবৌদির মারফৎ খবর পেলুম, সে-বেলার মতো আমার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। তাঁর শ্বাশুড়ী-ঠাকুরানীর অর্ডার।

চান করলুম না। সারাদিন গালে হাত দিয়ে পশ্চিমের ঘরে বসে রইলুম। বিকেলের দিকে মা ঘরে ঢুকলেন একথালা মুড়ি নিয়ে। ঠক্ করে থালাটা আমার সামনের টেবিলে রেখে বললেন: বড়ো হয়ে যখন বাপ হবি তখন বুঝতে পারবি, বাপ-মায়ের দুঃখ কোথায়!

মায়ের প্রস্থান। মেজবৌদির পুনঃপ্রবেশ। তাঁর মুখেই শুনলুম: পুত্রকে অনাহারে রেখে মা-ও কিছু আহার করেননি।

আজ যখন মনটাকে পেছন দিকে ফিরিয়ে নিয়ে সমস্ত ঘটনাটাকে তলিয়ে দেখছি তখন না হেসে পারছি না। সহুরে জীবনে গ্রাম-জীবনের মাতব্বররা নেই, তার জায়গা দখল করে নিয়েছে অন্য একজাতের মাতব্বররা। তারা রূপের নামে, রুপোর নামে, নীতির নামে, ডিগ্রির নামে, চক্‌চকে বুলির নামে সমাজে ও রাষ্ট্রে দখলী স্বত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের কথায় ও কাজে আসমান-জমিন ফারাক। আকন্দদাস তো হাকিমের হুকুমনামাতে সেই কবে থেকে দড়কাঁচা। তাই তার ছেলেবেলাকার বিপ্লবী আস্ফালন সেদিনের ক্রোধচক্রের ঘর্ষণের ফল বলেই ধরে নিন। তবু এই অধম হিন্দু-মুসলমানের সীমা-সরহদ্দের ছাগল-দাড়ি ডিঙিয়ে যেতে ভয় পায় না। কিন্তু আস্ফালনপটু বিদ্রোহীরা যখন মন্ত্র পড়ে বিয়ে করে কিংবা 'খিদে নেই' দোহাই দিয়ে বস্তিবাড়িতে নিরম্বু থেকে

সুপক্ক ফলের মতো বিপ্লবরস পরিবেষণ করে তখন বলতে ইচ্ছে করে, ভদ্র-মহোদয়রা একবার ভেতরের জামাটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, কাদার ছিটেয় ওটা কেমন চেকনাই হয়ে উঠেছে। না, না, পাঠক, ভুল বুঝবেন না। সাধু আকন্দদাস বাবাজী এখনও কোনো আশ্রম খোলেননি। তিনি জ্ঞানামৃত বিতরণ করছেন না।

ভালো-মন্দ সব সমাজেই আছে। লোমশ ভট্টাচার্যকে তো আপনারা চিনে নিয়েছেন। এবার হায়াৎ খাঁ-কে একটু রেয়াত করুন। আমার দুধ-মুড়ি পর্বে ওর ভূমিকা আসলে কিশোর আকন্দের প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত নয়। সমগ্র দাসবংশের প্রতি ক্রোধবশতঃ। আমাদের কয়েক কানি জমি ভাগে চাষ হতো। হায়াৎ খাঁ বর্গাদার হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দাদারা তাঁকে না দিয়ে আমাদের দরিদ্র প্রজা আহ্‌মেদ খাঁ-কে দিয়েছিলেন। তাতেই তাঁর রাগ। দুধ-মুড়ির গল্পটা যে সেদিন তিনি চক্রবর্তীমশাইকে পৌঁছে দিয়েছিলেন তার আসল উদ্দেশ্য ঝিকে মেরে বৌকে বোঝানো। তাছাড়া লোকটাও যে তিনি সুবিধের ছিলেন না তার ইঙ্গিত আলি-নন্দ উপাখ্যানে দিয়েছি। তবে পৃথিবীটা যখন আজো পরার্থপরতার আদিগঙ্গা হয়ে ওঠেনি তখন হায়াৎ খাঁ-র স্বার্থপরতার নিন্দে করলে চলবে কেন? লোমশ ভট্টাচার্যও সেই একই রেয়াতের দাবিদার, কারণ মানুষের নামে কুকুর বেড়াল দিন দিন বেড়েই চলেছে।

মায়ের কথাই ঠিক। আজ আমি ছেলেমেয়ের বাপ হয়েছি। পুত্ নামে নরকের ভয় আর নেই। কিন্তু প্রতিদিন বুঝতে পারছি, ছেলেমেয়ে মানুষ করা কত কঠিন। তাদের নিয়ে কত আশা, কত আশাভঙ্গ! তাই মায়ের স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে প্রায়ই মনে মনে বলি, মাগো, তুমি যেমনভাবে আমাকে মানুষ করতে চেয়েছিলে আমি নিশ্চয় তেমনভাবে মানুষ হইনি। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। তবে তোমার কথা ছেলেমেয়েদের বলে যাবো। জানি না, তারা শুনবে কিনা।

এই তো গেলো আকন্দদাসের সমাজশিক্ষার প্রথম ও মধ্যম ভাগ। অন্তিম ভাগ শুরু হতে দেরি হলো না। ফুলদা অনিন্দ্য এম এ. পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এলেন কার্তিকের শেষাশেষি। তিনি ছিলেন অন্য দাদাদের চেয়ে ভিন্ন ধাতুর মানুষ। আপসে সাহস দেখানোর চেয়ে বিতণ্ডায় শুণ্ড তুলতে তাঁর আগ্রহ ছিলো বেশি। তিনি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ছিলেন না, প্রহ্লাদকুলে দৈত্য ছিলেন। দস্তার মূল্যে তিনি বিতস্তা পার হতে ভালোবাসতেন না।

সেবার বর্ষা ছিলো কৃপণ। নদী-নালায় দিঘি-পুকুরে জল জমেছিলো কম। শরৎ আসতেই ছোটখাটো জলাশয় শুকিয়ে কাদাশয় হয়ে গিয়েছিলো। সেকালে ছিলো গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের খুব অভাব। অনেক পুকুরে কলসী ডুবতো না। পণ্ডিতমশায় বৃন্দাবন ঘোষেরা হয়তো ছিলেন, কিন্তু বোধহয় কাদাতেই কায়দা করে ডুব মেরেছিলেন। ফলে একই পুকুর সাপ্লাই দিতো প্রাতঃকৃত্য

থেকে সমস্ত দিনকৃত্যের জল। কলেরা তা-ই অপেরা বসাতো ঘন ঘন। মহামারীতে মৃত্যু ছিলো জলভাতের মতোই সরল সত্য।

কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের বড়োদিঘিটি ছিলো জলকন্যাদের লীলাশয়। এমন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বিরাট মুসকিল-আসান বাবুর বাজারে আর ছিলো না। গভীর খাতে পরিষ্কার জল বারোমাস টলটল করতো। কম ছিলো পাঁক, মাছ ছিলো ঝাঁক ঝাঁক। আমরা চার পাড় দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়তুম, ঝাঁপিয়ে পড়তুম কাকচক্ষু জলে। দিঘির ধারে ধারে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে হেঁটে বেড়াতুম। পায়ের তলায় চাপা পড়তো ইয়া বড়ো বড়ো গলদা চিংড়ি। সেদিনের মধ্যাহ্নের ভোজে চিংড়ির ঘিলু এনে দিতো পরম পরিতৃপ্তি।

দেখতুম গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে বৌ-ঝিরা কলসী কাঁখে 'জলকে চল' চালে সারি সারি আসছে। দিঘিতে গাগরি ভাসিয়ে তারা সাঁতার কাটতো, এ ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দিতো। তারপর জল ভরে নিয়ে ভিজে কাপড়ে দ্রুতগতিতে চলে যেতো। এ জলবিনোদনটুকু ছিলো তাদের জীবনে খোলা আকাশের অভিনন্দন।

কিন্তু সেই খোলা আকাশের দাক্ষিণ্য একদিন বন্ধ হয়ে গেলো চৌধুরী-কাকার আদেশে। কি পাঠক, আশ্চর্য হচ্ছেন? ভগবানের দেওয়া আকাশকে রুদ্ধ করবে কে, এই ভাবছেন? না, আমি একটু কাব্যি করে বলছিলুম। আসলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো বড়োদিঘিতে যাওয়ার পথ। জলকেলি না করলে মানুষ মরে না, কিন্তু খাওয়ার জল না পেলে মানুষ মরে। মানুষ মারার কলকাঠি প্রকাশ্যে নেড়েছিলেন চৌধুরীকাকা, কিন্তু সেই গ্রাম্য চক্রান্তে ছিলেন আরো অনেকে।

চৌধুরীকাকা রাশভারি লোক ছিলেন। চলনে বলনে তাঁর ছিলো একটা সহজাত আভিজাত্য। তিনি জমিদারবংশের শেষতম ধারারক্ষী। দাপট যেমন ছিলো তাঁর, তেমনি ছিলো নিচু কাজে বীতস্পৃহা। তিনি বোধহয় মনে রেখেছিলেন, প্রজা হচ্ছে জমিদারের আশ্রিত। তাই তিনি ধারে ও ভারে কাটতে চাইতেন।

কিন্তু সে-কালের গ্রাম্য চক্রান্ত ছিলো ভয়ংকর। তিনি বুদ্ধিমান হয়েও কেন তার শিকার হয়েছিলেন, জানি না।

আচার্যরা ছিলেন দৌহিত্রবংশের অর্থাৎ আমাদের প্রজা। তাই তাঁরা চৌধুরীকাকাকে সম্মান করলেও ভয় করতেন না। আসলে আশ্রিত প্রজামাত্র তাঁরা ছিলেন না। জমিদারের কাছে খাজনার দায় ছাড়া আর কোনো দায়ের ধার তাঁরা ধারতেন না। জীবিকায় আচার্যরা ছিলেন স্বনির্ভর। কে যেন তাঁর কাছে লাগিয়েছিলো, আচার্যদের কেউ চৌধুরীকাকা সম্পর্কে কটু ও কড়া মন্তব্য করেছেন। অমনি চৌধুরীকাকার জমিদারি রক্ত টগবগ করে উঠলো। তিনি উত্তর-পশ্চিম কোণে বেড়া দিয়ে আচার্যদের বড়োদিঘিতে যাওয়ার পথ

বন্ধ করে দিলেন। তিনি ভেবে দেখলেন না, এতে হিন্দু মুসলমান আরো অনেকের পানীয় জল সংগ্রহের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিলেন। সমাজপতি হয়ে এই অসামাজিক কাজ তিনি কতকটা জেদের বশেই করে বসলেন।

শুনেছিলুম এর পেছনে আছে তিনজনের উস্কানি। লোমশ ভট্টাচার্য ও তল্লাটে ঘুরঘুর করতেন কোনো এক সুন্দরী মহিলার আকর্ষণে। আচার্য-বাড়ির উঠ্তি ছেলেরা ওঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলে বিষকাটালি দিয়ে পিটিয়েছিলো। হায়াৎ খাঁর ছেলের চিকিৎসা করতে গিয়ে তাকে ভুল ওষুধ দিয়ে প্রায় মেরে ফেলেছিলেন বিশ্ববন্ধু আচার্য। তার চেয়ে বড়ো কথা, আচার্য বাড়ির সামনে এঁদো পুকুরটায় রাত্তিরে লুকিয়ে মাছ ধরতো আচার্যগোষ্ঠীর কেউ কেউ। পুকুরটার মালিক ছিলুম আমরা ও ঘোষেদের এক শরিক সুন্দর ঠাকুর্দা। ঠাকুর্দার সঙ্গে একদিন তুমুল ঝগড়াও হয়ে গিয়েছিলো আচার্য-বাড়ির কারো কারো। কিন্তু এঁরা তিনজনই ছিলেন নির্বিষ সর্প। প্রকাশ্যে ঝাঁটা মারতে পারেন এমন বুকের পাটা এঁদের একজনেরও ছিলো না। তাই তাঁরা মার্তঙ্গিনীভর্তা চৌধুরীকর্তার আঁতে ঘা লাগাবার ফুসমন্তর ছড়াতে লাগলেন দুই তিন দিন অন্তর অন্তর। এর অনিবার্য ফল দিঘির পথে বাঁশের বেড়া।

বেলাবেলি বৌ-ঝিদের জলকেলি না করলেও চলে, কিন্তু পিপাসার বারি গাগরি ভরে না আনলে চলে না। ওলাবিবি ওৎ পেতে আছেন যে! তাই একদিন সকালে দুই অহি-নকুল ভাই সুবন্ধু ও বিশ্ববন্ধু এলেন। হাঁক দিলেন: অনিন্দ্যভায়া আছো নাকি?

ফুলদা তখন তাঁর গল্পের নায়ক সঞ্জয় বোসকে নিয়ে বিপ্লবের ধুনি জ্বালাতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ব্যাজার মুখে বেরিয়ে এসে বললেন: কী খবর?

দুই ভাই সমস্বরে যাকে বলে গুরুতর পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন। তারপর জানালেন: প্রজাকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। তুমি ভায়া একটা কিছু বিহিত করো।

—রাজাপ্রজার প্রসঙ্গ থাক্। আপনারা খাওয়ার জল পাচ্ছেন না?

—না।

—কাল সকালে দিঘির পাড়ে সব জড়ো হবেন। আমি ও আকন্দ থাকবো।

আমি তখন দারুণ উত্তেজিত। আটচালা ঘরের ফুটো পথে আর সামাজিক ঘোঁটের গোপনচারী ভুয়োদর্শন নয়, সামাজিক কুরুক্ষেত্রে আকাশচারী বিশ্বরূপদর্শন! কুরু-পাণ্ডবের ধর্মযুদ্ধ! আমি ততদিনে শরৎচন্দ্র পড়ে ফেলেছি। বাঁধ কাটা নিয়ে রমা-রমেশের রক্তারক্তি কাণ্ড—না, না, ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ নয়—বিলকুল অবগত আছি। আগামীকালের দ্বৈরথযুদ্ধে আমি

সেনাপতি নই বটে, কিন্তু দূতও নই। ফুলদা স্বয়ং আমাকে নিয়ে যাবেন বলেছেন।

যথাসময়ে যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা দুজন, দশ বারোজন গ্রাম-বাসী। ফুলদা কমাণ্ডারের মতো অর্ডার দিলেন—কাট্।

এগিয়ে এলো বছর কুড়ি বয়সের একটি লিক্‌লিকে ছেলে। সে কাটারি নিয়ে এগিয়ে যেতেই পেছনে গর্জন: খবরদার! বেড়ায় হাত দিবি তো, দু'টুকরো করে ফেলবো।

তাকিয়ে দেখি, চৌধুরীকাকা। সংগে ষণ্ডামার্কা দুজন লোক—একজনের হাতে বন্দুক, অন্যজনের হাতে খড়্গ।

কবুল করতে লজ্জা নেই, আমার বুকটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করছিলো। আকবর সর্দারের অবস্থাটা মনে ছিলো কিনা!

ফুলদা একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে গিয়ে দুজনের হাত থেকে দু'খানা কাটারি নিয়ে নিলেন। একটা বড়ো. আরেকটা ছোট। ছোটটা আমার হাতে দিয়ে বললেন: আপনারা সবাই গিয়ে দিঘির উত্তর পাড়ে দাঁড়ান। ইশারা করার আগে এদিকে আসবেন না।

তারপর ঝপাঝপ বেড়ায় কোপ মারতে লাগলেন। আমিও হাত লাগালুম। মিনিট পনেরোর মধ্যে সব পরিষ্কার। আমার মনে হলো, কাটারির তোপ দাগিয়ে বাঁশের কেল্লা উড়িয়ে দিলুম।

চৌধুরীকাকা অটল দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা কথা বললেন না। কিংবা বিবেকের দংশনও হতে পারে।

ফুলদা সবাইকে ডেকে এনে বললেন: যান্, জল নিয়ে যান্। কাল থেকে বৌ-ঝিরা জল নিয়ে যাবেন।

তারপর কাটারিটা ফেলে দিয়ে চৌধুরীকাকার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে হঠাৎ প্রণাম করে বললেন: কাকাবাবু, আমাকে যতটা অমানুষ ভাবছেন. আমি ততটা অমানুষ নই। আপনি জমিদার না? মানুষ না? সাধারণ লোকের তেষ্টার জল বন্ধ করে দিচ্ছেন!

আমি ফিস্‌ফিস্ করে সদ্যপড়া মহেশের গল্পটা মনে করিয়ে দিলুম।

ফুলদা হেসে বললেন: আয়।

সেদিনের জলপর্বের এখানেই শেষ।

●●

ঝিল্লীদি, তুমি কি বেঁচে আছো? এই বিপুলা পৃথ্বীর কোথাও যদি বেঁচে থাকো এবং এই লেখা যদি তোমার চোখে পড়ে, তবে ধরে নিয়ো, তোমার আকন্দভাই আজো তোমাকে ভোলেনি। ভোলা কি যায়? তুমি দিয়েছো যে অনেক! সমুদ্র যেমন দেয় মেঘকে। মেঘ এক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে দিয়ে সমুদ্রকে কিছুটা ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু আমি কি দিয়েছি তোমাকে? আমি যে বৃষ্টিহারা মেঘ! সমুদ্রের সন্ধান আমার চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে।

কুয়োর ব্যাং একটা লাফ মেরেই ভাবে, অনেকটা এগিয়ে গেলুম। কিন্তু সে জানে না, কুয়োর বাইরে আছে অনেক জল। সে জলের নাগাল সে কোনোদিন পায় না, পাবেও না। আমার কৈশোরের ক্ষুদ্র জগৎটাকেই একসময় ভেবেছিলুম ভূতলের স্বর্গখণ্ড। তাকে ভালোবেসেই সুখী হতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ঝিল্লীদি, তুমি আর বিল্লুদা আনলে আরো অনেক বড়ো জগতের খবর। সেখানে তুষারপাত হয়, আগুন জ্বলে। ব্লিজার্ডের তাড়া আছে, আগ্নেয়গিরির উষ্ণ উদ্গীরণ ঘটে। তোমরা দুজন ছিলে আমার সেই অজানা বড়ো দুনিয়ার যাযাবর পাখি। তোমাদের চোখের ডানায় তুহিন শীতলতার স্পর্শ ছিলো, রৌদ্রের উষ্ণীষের রং ছিলো। আমাকে তোমরাই জানিয়ে দিয়ে গেছো আমি শুধু বাবুরবাজারের নিধিরাম হয়ে থাকবো কেন, আমি চেষ্টা করলেই হতে পারি যাদবপুরের বলরাম। কিন্তু পোড়া কপাল নিয়ে জন্মেছি, ঝিল্লীদি, অচলায়তনেই রয়ে গেলুম। দেবায়তনে পৌঁছোনো আর হলো না। তোমরা আমাকে ক্ষমা কোরো।

মনে পড়ছে বেড়া ভাঙার গল্প তোমার কাছে বসে বসে করছিলুম। তুমি কিছুটা শুনছিলে, কিছুটা শুনছিলে না। এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে 'হুঁ' 'হাঁ' করছিলে। কিন্তু তাতেও আমার উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। প্রচুর আবেগ ও প্রচুরতর হস্তসঞ্চালন করে বলে যাচ্ছিলুম আমাদের সুমহান কীর্তির রোমহর্ষক কাহিনী।

বিল্লুদা যে উঠোনে উবু হয়ে বসে সব শুনছিলেন, তা টের পাইনি। ডানপিটেদের আসরের কুরু-পাণ্ডব সংবাদ শেষ হতেই বললেন: দু'ভায়ে মিলে যে বেশ কাব্য লিখে ফেলেছিস? এর নাম দিস্ বেড়ানিধন কাব্য।

আমি অভিমান করে বললুম: তুমি ঠাট্টা করছো, বিল্লুদা।

—তাহলে নাম দিস্ অনিন্দ্য আকন্দ কাব্য। কী, এবার খুশি তো!

মুখ ফিরিয়ে আমি চোখের জল চাপার চেষ্টা করলুম।

ঝিল্লীদি, আমার চোখের জল তোমার দৃষ্টি এড়ায়নি। তুমি হাতের কাজ ফেলে রেখে এগিয়ে এসে আমার চিবুক ধরে বললে: আকন্দভাই, আমার চোখের দিকে তাকা। বেশ করেছিস্, আমি খু-উ-ব খুশি হয়েছি। সাহস বাড়ুক, বড়ো হয়ে আরো বড়ো কাজ করতে পারবি। তখন তোর এই দিদি তোকে আরো বেশি করে ভালোবাসবে।

বিল্লুদা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন: শরৎ চাটুজ্জে, বাংলাদেশটাকে ডুবিয়ে দিয়ে গেছেন। শুধু কাঁদতে শিখিয়ে গেছেন। ওরে আকন্দ, মেয়েমানুষের মতো শুধু কাঁদবি না। আগুন জ্বালিয়ে যাবি। সে-আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিবি শুধু একটা বেড়া নয়, সব বেড়া।

বিল্লুদার মুখ তখন গনগনে আগুনের মতো। যেন আপন মনেই বলে চললেন: একটা বেড়া ভেঙে ভাবছিস্, অনেক কিছু করলুম। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আছে এমন লক্ষ লক্ষ বেড়া। ক'টা ভাঙবি? আসল কথা কি জানিস্, মূল চিকিৎসা করতে হবে।

—মূল চিকিৎসা? মানে?

—স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে। তার জন্য আগুন নিয়ে খেলতে হবে। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। ঝিল্লীদি, তুমি উঠোনের দিকে পেছন ফিরে বললে: তোর বিল্লুদা কিচ্ছু জানে না রে! ও শুধু আগুন জ্বালাতে জানে, আগুন নেভাতে জানে না। পেটের আগুন না নেভাতে পারলে যে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবি। দেশে আগুন জ্বালাবি কি করে?

এবার যেন অনেকটা বুঝলুম। জন্মলগ্ন থেকে আর কিছু না জানি আগ্নেয় ক্ষুধার কথা জানি। তবে কি এঁদের খাওয়া জুটছে না? আমার বুকটা ব্যথায় টনটন্ করে উঠলো। আমি মাথা নিচু করে বসে রইলুম।

একসময় খেয়াল হলো অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে আছি। মাথা তুলতেই দেখলুম, বিল্লুদার মুখের আগুন কখন নিভে গেছে। তিনি মরা মাছের এক জোড়া চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছেন ঝিল্লীদির দিকে। কিন্তু একী, আমার দিদিভাইয়ের জলভারাক্রান্ত মেঘের মতো দুটি চোখ গেলো কোথায়? তিনিও যে মরা মাছের চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছেন বিল্লুদার দিকে! আমি শিউরে উঠলুম।

ঝিল্লীদি, তোমরা দুজনে মরা চোখে তাকিয়ে কী দেখছিলে সেদিন?

কৌতূহলী পাঠক, তাহলে অনুমতি দিন্, ঝিল্লীদি বিল্লুদার বিলক্ষণ আখ্যান শুরু করি। বিশ্বাস করুন, এতে স্মৃতিস্খলন কিছু ঘটলেও অনৃত ভাষণ হবে না।

আমার সহপাঠী অমিত অধিকারী। মজাপুকুর দালালদিঘির পাশের বাড়ির ছেলে। পড়াশুনোয় মন নেই, শুধু খুঁজে বেড়ায় সুজলা সুফলা ভারতভূমির আশনাই। গাঁয়ে গাঁয়ে চড়কি মারে, মীটিং শুনতে যায় সহরে।

এমন সরল অথচ বলিষ্ঠ ছেলে আমি কম দেখেছি। ওকে মনে হতো মাথা-উঁচু করা তালগাছ—আর আমরা সব বেঁটেখাটো শেওড়ার ঝোপ। একবার বারুদ দিয়ে বোমা বানাবার সময় বিস্ফোরণ ঘটেছিলো। ওকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিলো তিন মাস।

একদিন বাড়ি ফেরার পথে অমিত বললো : আকন্দ, তুইতো কাব্যি করিস্?

আমি হাসলুম। সে-হাসিতে সগর্ব সায় ছিলো।

—ছড়া বানাতে পারিস্?

—যে উত্তর পেলে তুই খুশি হবি, ধরে নে তা-ই।

নিচের ক্লাসে আমি ছিলুম সাদামাঠা কথার কারবারি। কথাবার্তা শুনে কেউ আমাকে চালাক চতুর ছেলে বলে মনে করতো না। উপরের ক্লাসে উঠে তাই আমি চলনে বলনে একটু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করছিলুম। ভগবান যেখানে শেষ করে রেখেছেন সেখানে অবশ্য দুরমুশ করার কিছু ছিলো না।

—একটা ছড়া বানিয়ে দিবি?

—কাকে নিয়ে?

—দুঃখহরণ রায়কে তো চিনিস্? লোকটা টিকটিকি, হাড়-বজ্জাত। তাই ওকে কেউ বলে দুঃখবিকাশ, কেউ বলে নিদ্রাহরণ।

—লোকটা কি করেছে তোর?

অমিত বুক চিতিয়ে বললো : ও আমাকে কি করতে পারে? আমি কি কাউকে কেয়ার করি? লোকটা আমার ঝিল্লীদিকে বড়ো জ্বালাচ্ছে রে!

আমি ঢোক গিলে বললুম : ঝিল্লীদি কে?

- তুই চিন্‌বিনে। একদিন চিনিয়ে দেবো। তা ছড়াটা যদি পরশু না পাই তবে একটা বিরাশি সিক্কা তোর পিঠে পড়বে।

—দেবো, দেবো, দেবো।

তিন সত্যি করে বিদায় নিলুম। কিন্তু যেতে যেতে ভাবলুম, ঝিল্লীদিটি কে? কোথায় থাকে?

যথাসময়ে বীরদর্পে অমিতের হাতে সমর্পণ করলুম আমার চতুষ্পদী শিশুকে। অমিত মনে মনে পড়ে নিলো :

নিদ্রাহরণ, নিদ্রাহরণ, করছো তুমি কি!
গিরিশ সেনের পায়ে কেন মাখ্‌ছো শুধু ঘি?
ফাঁসি কাঠে ঝোলাও যদি সোনার ছেলেকে,
গদাই মালীর মেয়ের সাথে দেবো তোমার বে॥

স্বীকার করছি, এই বালভাষিতের মধ্যে অকালপক্কতার ঝাঁজ ছিলো। কিন্তু সেই গুজবমুখর গ্রামজীবনে মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি হয়ে যেতো, চোদ্দতে ছেলেরা হতো পাকার হদ্দ। রাত্তিরে গা ঢাকা দিয়ে দুঃখবিকাশ যে গদাই

মালীর বাড়িতে দুঃখলাঘব করতে যায় এ তথ্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারো অজানা ছিলো না। জানতুম লোহার রড দিয়ে মারার ভয় দেখালে ওর হৃদ্‌কম্প হবে না। কারণ, ও যে থানায় নিত্য হানা দেয়—পুলিশের অদৃশ্য পুলটিস ওঁর গায়ে বর্মের মতো ঘিরে থাকে। সামাজিককে মারার ব্রহ্মাস্ত্র হচ্ছে অসামাজিক কর্মের পুলিন্দা কাঁধে চড়িয়ে দেওয়া। পনেরোর পা দিয়ে আমার বুদ্ধির দা যে কতকটা ধারালো হয়ে উঠেছিলো, চতুর পাঠক, তা আকন্দের কাব্যচর্চা থেকেই আঁচ করতে পারবেন।

পরের দিন ইস্কুলে দেখা হতেই অমিতের মুখে দেখলুম আকর্ণবিস্তৃত হাসি। আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললো : তোর ওটা ছড়া তো নয়, একটা মোক্ষম দাওয়াই। নাড়ুগোপাল ওতেই টালমাটাল হয়ে পড়বে। তোর কলমবাজি দেখে ঝিল্লীদি খুব খুশি হয়েছেন রে !

এই ঝিল্লীদি কে, তখন পর্যন্ত জানি না। তাঁর কেরামতিরও কিছু পরিচয় পাইনি। কিন্তু যে-কোনো বালখিল্য কবিযশপ্রার্থীর কাছে সুখ্যাতির রেজাই মাত্রই বেশ আরামদায়ক। তাই কোনো এক ঝিল্লীদির আড়াল থেকে ছুঁড়ে-দেওয়া দিল্লীকা-লাড্ডু সানন্দে গলাধঃকরণ করলুম।

কিন্তু হজম হতে না হতেই কেমন ভয় ধরে গেলো। দাদারা জানতে পারলে খড়ম-পেটা করে ছাড়বেন। বন্ধুর হাত ধরে বললুম কাঁপা গলায় : কেউ জানতে পারবে না তো আমি লিখেছি ?

অমিত নিজের সাহসবিস্তৃত বক্ষপাটে থাপ্পড় মেরে বললো : এই শর্মা থাকতে তোকে কিছু করা কারো কম্ম নয়। তুই গাছকোমর বেঁধে চল্ দেখি। ভাবিস্ না, কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। নেতা হওয়া কি সহজ কথা ? অনেক কিছুতেই লেবেল মেরে রাখতে হয়, টপ্ সিক্রেট !

সবে পাণিপথের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুদ্ধের আনুপূর্বিক ইতিহাস পড়েছি। সেদিন অমিতের কথা শুনে আমার মনে হলো, পানিপথে যতগুলি যুদ্ধ হয়েছিলো এবং যে-সব যুদ্ধ কখনো হয়নি সেই হওয়া না-হওয়া সব যুদ্ধেরই নায়ক অমিতকুমার অধিকারী। অমিত তার বিক্রম, অধিকার তার কৈলাসপ্রমাণ। সে অমিত্রসূদন, কিন্তু বন্ধুবৎসল।

আমার চোখে ভক্তের আকুতি বোধহয় দেখেছিলো অমিত। সেদিকে তাকিয়ে বললো, ঝিল্লীদিকে দেখবি ?

—হ্যাঁ।

—কালকের কিষ্কিন্ধ্যাপর্বটা শেষ হয়ে যাক্। তারপর একদিন তোকে নিয়ে যাবো দিদিভাইয়ের কাছে।

—কিষ্কিন্ধ্যাপর্ব মানে ?

—বালিবধ।

—আরেকটু বুঝিয়ে বল্।

—কাল নিদ্রাহরণ নির্যাতন পালা শুরু হবে। গাছের পেছনে লুকিয়ে দেখিস্, রমরমা আয়োজন! ওঁর বাপের ঘুম চিরদিনের মতো ছুটিয়ে দেবো।

বলে হন্‌হন্ করে চল্‌তে আরম্ভ করলো।

পরের দিন সকাল ন'টাতেই নাকেমুখে কিছু গুঁজে ইস্কুলের দিকে ইঞ্জিনের মতো ছুটতে লাগলুম। বুকে ঢিপ্‌ঢিপ্ শব্দ। কী জানি কি হয়! নিদ্রাহরণ সহরের দিকে দ্বিচক্রযানে যাত্রা করেন সরকারি নোক্‌রি করতে। পোস্ট আপিসের হাজিরা খাতায় লেখা হয় সাড়ে দশটা, কিন্তু সি. আই. ডি ইনস্পেক্টার গিরিশ সেনের দপ্তরে চুলো থেকে চুলকানি পর্যন্ত চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে ডাকঘরে যখন অদীনপুণ্যের মতো প্রবেশ করেন তখন অন্যদের প্রস্থানের সময় উপস্থিত। পোস্টমাস্টার মশায় পুচ্ছ তুলে না নাচলেও উঠে দাঁড়িয়ে নিদ্রাহরণকে রাজোচিত সম্বর্ধনা জানান। তিনি জানেন এর অন্যথা ঘটলে টিকি রাখা দায় হবে।

অমিতকুমারের সাগ্‌রেদদের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকতে দেখলুম। তাদের মুখে কাইজারের গাম্ভীর্য। আমি স্টাফ রুমের পেছনের মোটা বটগাছটার আড়ালে বসে রইলুম। ড্রপ্ সীন উঠতে দেরি নেই।

হঠাৎ হুইশিল বেজে উঠলো।

তাকিয়ে দেখি ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা দিয়ে উল্টো দিক থেকে গান গাইতে গাইতে আসছেন একজন কীর্তনিয়া। হাতে শ্রীখোল। দরাজগলায় তিনি গাইছেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

হঠাৎ কীর্তনিয়া বাবাজী ভাবে বিভোর হয়ে উঠলেন। তিনি ডান হাত ছড়িয়ে রাস্তার ওপর চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে শ্যামনামের মধু ছড়াতে লাগলেন। তিনি বাহ্যজ্ঞানহীন।

এদিকে ক্রমাগত বেল বাজাতে বাজাতে একটা সাইকেল সামনে এসে থেমে গেলো। আরোহী নিদ্রাহরণ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ। তিনি নেমে পড়লেন। স্বগতঃ উচ্চারণ করলেন: সাধু সন্নোসীতে দেশটা উচ্ছন্নে গেছে!

ততক্ষণে কীর্তনিয়ার সুরলহরী উত্তাল হয়ে উঠেছে: স-ই-ই-ই, স-ই-ই-ই-গো—

এটা স্পষ্টতঃই ছিলো কোনো ইঙ্গিত।

সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠলো। কেরোসিনের খালি টিন, ক্যানেস্তারা, স্কুলের ঘণ্টা, করতাল সব মিলিয়ে এক রোমহর্ষক ঐকতান। চেয়ে দেখলুম, ব্যাং-এর মতো নাচতে নাচতে দু'দিক থেকে আসছে গোটা দশ বারো ছেলে। মুখে মুখোশ। পিঠে বুকে লাগানো চাটাইয়ের ওপর কাগজ সাঁটা। তাতে বড়ো বড়ো হরফে লেখা আমার ছড়াটি।

এর পরে সমবেত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। পরে শুনেছিলুম আমার ছড়াটিতে সুর বসিয়েছিলেন স্বয়ং ঝিল্লীদি।

নিদ্রাহরণ হতভম্ব। পালাবার পথ খুঁজছেন, কিন্তু সঙ্গীতবিশারদ ছেলেরা এমনভাবে তাঁকে ঘিরে ধরেছিলো, সাইকেল চালাবার রাস্তা পাচ্ছিলেন না।

হঠাৎ বোধহয় তাঁর মনে হলো, এর পেছনে নিশ্চয়ই বড়োরা আছেন। ছোটদের এত বুদ্ধি ও সাহস হতে পারে না।

তিনি দ্রুতগতিতে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়লো আমার ওপর। মজা পেয়ে আমি যে কখন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছি তা আমি নিজেই জানি না। একসময় হাততালি দিয়েও উঠেছিলুম। খেয়াল হলো যখন নিদ্রাহরণ আমাকে লক্ষ্য করে হুংকার ছাড়লেন। কীর্তনিয়া হাত নেড়ে আমাকে পালিয়ে যেতে বলছেন। কিন্তু ততক্ষণে বড়ো দেরি হয়ে গেছে। সঙ্গীতবিশারদরা বিপদ বুঝে গান থামিয়ে দিলো। সুযোগ পেয়ে নিদ্রাহরণ সাইকেল চালিয়ে দিলেন সহরের দিকে।

এই দুষ্কর্মের ফল দেখা গেলো পরের দিন সকালেই। ভোরের দিকে ঘুমটা সবে জমে এসেছে। মেজবৌদি গায়ে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙালেন। ভীতকণ্ঠে বললেন : কুট্টি ঠাকুরপো, পুলিশ!

হাফ প্যান্টের দড়িটা বাঁধতে বাঁধতে বাইরে এলুম। জন পঞ্চাশেক পুলিশ বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে। সঙ্গে একজন পিস্তলধারী সাব-ইন্সপেক্টর।

মা একেবারে স্তম্ভিত। মেয়েরা ভীতসন্ত্রস্ত! বড়দা হন্তদন্ত হয়ে এ-ঘর ও-ঘর করছেন। চৌধুরীকাকা বজ্রাহত তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু ঘোষেদের অসিতদা মাঝে মাঝে আরক্ত চোখে মৃদু প্রতিবাদ করছেন। তুলপাই ইস্কুলের শিক্ষায় পুলিশের কাজে আপত্তি জানাবার স্পর্ধা রাখেন তিনি। অন্যরা সব কৌতূহলাক্রান্ত, কারণ তাদের কাছে পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য দ্রষ্টব্য বস্তু পুলিশ।

সার্চ ওয়ারেণ্টের অজুহাতে বাড়ি একেবারে তছনছ। অভিযোগ রাষ্ট্রদ্রোহিতা। মায়ের গুড়ের হাঁড়ি থেকে শুরু করে গয়ার পাথরের থালা-বাটি কোনোটাই আস্ত রইলো না। বৌ-ঝিদের স্নো-পাউডার-তরল আলতা থেকে ঘরের চালে বোলতার বাসা পর্যন্ত সবই রীতিমতো তদন্ত করা হলো। ঘরের পেছনে কলাবাগানে দিনের বেলাতেই টর্চ ফেলে তদারক করে এলেন মহামান্য

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব। বোমা কোথায় ঘোমটা টেনে আত্মগোপন করে আছে, বলা তো যায় না! বাড়ির সেই ছন্নছাড়া চেহারা দেখলে পুলিশ সুপারও চুল-ছাঁটা ঘাড় নেড়ে বলতেন, হ্যাঁ, এরই নাম পূর্ণ তদন্ত। অথচ আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি এর পেছনে আছে একটা চারপায়া ছড়া। তাহলে পেন্সিল বোমার চেয়ে কম রাষ্ট্রদ্রোহী নয়।

পুরো দু'ঘণ্টাব্যাপী তাণ্ডবলীলার শেষে বার হলো একটি নিষিদ্ধ বই। আর কিছুই নয়, সি. আর. দাশের জীবনী। সেটি বেরুলো বড়দার বিছানার তলা থেকে। দেশবন্ধু সাব-ইনস্পেক্টর সাহেবের ইজ্জত বাঁচিয়ে দিলেন গ্রন্থাবতার হয়ে। বীরদর্পে পুলিশপুঙ্গব গ্রেপ্তার করলেন বড়দাকে। অসিতদা তেড়েমেড়ে বলে উঠলেন: এটা যে নিষিদ্ধ বই, প্রমাণ করুন।

যিশু খ্রীষ্টের ভঙ্গিতে খুদে সাহেব উত্তর দিলেন: সেটা প্রমাণ করা হবে কোর্টে।

বড়দাকে নিয়ে দেশরক্ষাবাহিনী যাত্রা করছেন। এমন সময় ছুটে এলেন নন্দদি। হাতে একটা কলার মোচা। সব্জি বাগানে পটকার জোরালো সন্ধানের সময় পলকা কদলীনন্দিনী কাৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিলো। নন্দদি ভাবলেন, বোধহয় লালবাবুরা মোচার খোঁজেই সলাঠি অভিযান করেছেন। কিংবা নন্দদির মতো নির্বোধও রয়্যাল ডিফেন্স ফোর্সের কাণ্ডকারখানা দেখে একটু মস্করা করার লোভ সম্বরণ করতে পারেননি। কারণ যাই হোক, শ্রীমতী মোচা হস্তে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সাব-ইনস্পেক্টরবাবুর আত্মসম্মানবোধ তিড়িক করে লাফিয়ে উঠলো। তিনি তর্জনসহ বেটন দিয়ে খোঁচা মেরে বলে উঠলেন: হারামজাদী, চুপ কর্!

নন্দদির তেজী লঙ্কা খাওয়ার অভ্যাস। তিনি দমলেন না। খাঁটি নান্দিক ভাষায় জবাব দিলেন: বেছরম উল্লুকদের হিঁইসো হসাবো নাকি? মাইয়্যা মানুষের গায়ে হাত!

বলে কোমরে শাড়ি জড়িয়ে নিলো। অতএব বাঘিনীকে না ঘাঁটিয়ে পুলিশবাহিনী বড়দাকে নিয়ে যথাসময়ে সরে পড়লো।

মা পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন। বড়োবৌদি বাপের বাড়ি। তা না হলে তিনি কি করতেন আন্দাজ করতে পারলুম। আমার মনে তখন পাপবোধ। আকন্দের আদার ব্যাপারী হয়ে কী কাজ ছিলো জাহাজের ব্যবসা করা। আমার ছড়াই যে বড়দার হাতে হাতকড়া পরিয়েছে; সন্দেহ কি! মনে পড়লো নিদ্রাহরণের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি।

এর পর কয়েকদিন ইস্কুলে যাইনি। তিন দিন ফাটকে থেকে বড়দা ফিরে এলেন। বেকসুর খালাস। অসিতদা গাঁদাফুলের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করলেন। দূর থেকে দেখলুম ওঁর মুখে কোনো গ্লানি নেই, দুঃখবোধ নেই।

তবু আমার মনটা কেবলই খাবি খেতে লাগলো। রামের অপরাধে শ্যামের সাজা হবে কেন?

স্কুলে যেতেই অমিত এগিয়ে এলো। আমার হাত ধরে পরম বন্ধুর মতো বললো: দুঃখ করিস্‌নে। হতচ্ছাড়া দেশে মানুষকে এম্‌নি দুঃখ ভোগ করতে হয় রে! মনে রাখিস্‌, কিছু দাম না দিলে বড়ো জিনিস পাওয়া যায় না।

—এ কি তোর কথা? না কি তোর সেই ঝিল্লীদির কথা?

—ঠিকই বলেছিস্‌। এ ঝিল্লীদির কথা। আমি কী দিয়েছি দেশের জন্য যে এতবড়ো সত্য জানবো! ভালো কথা, দিদিভাই তোকে ডেকেছে।

আমি মুখ ফিরিয়ে বললুম: না, আমি কোথাও যাবো না।

—আমাকে থাপ্পড় মারিস্‌, রাগ করবো না। কিন্তু আমার ঝিল্লীদিকে অপমান করিস্‌ না। উনি সব দিক থেকেই অনেক বড়ো, আকন্দ!

ছুটির পর অমিতের পিছু পিছু চলতে লাগলুম। দালালদিঘি পার হয়ে এক সময় পৌঁছে গেলুম অধিকারী বাড়িতে। অমিতের যে জ্যাঠা কাশীবাসী তাঁর পরিত্যক্ত টিনের ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে অমিত ডাকলো: দিদিভাই, দ্যাখো, কাকে এনেছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন একজন মহিলা। বয়স তিরিশ পঁয়ত্রিশ হবে। ছিপ্‌ছিপে গড়ন। গায়ের রং শ্যামলা। চুল ছড়িয়ে পড়েছে কোমর পর্যন্ত। কিন্তু তাতে চিরুনি পড়েনি অনেক দিন।

আমার হাত ধরে বললেন: এসো, ভাই আকন্দ।

একটা জলচৌকি এগিয়ে দিলেন বসবার জন্য। ছেলেবেলায় আমাদের ঘরের যা চেহারা দেখেছি অনেকটা সেই রকম। দিনযাপনের গ্লানি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

ঝিল্লীদি দ্রুতপায়ে ছেঁড়া কাপড়ের পার্টিশানের ও-পাশে চলে গেলেন। একটু টুংটাং শব্দ শুনতে পেলুম। তারপর এক সময় বেরিয়ে এলেন। হাতে টিনের গেলাসে জল, এলুমিনিয়ামের বাটিতে দুমুঠো মুড়ি ও একটা কাটা শশা।

—জানি, সারাদিন ইস্কুল করে তোমার খিদে পেয়েছে। এইটুকুতে তোমার পেট ভরবে না। কিন্তু আর যে আমার কিছু নেই, আকন্দ ভাই!

ঝিল্লীদি আমার দিকে সস্নেহে তাকালেন। আমি চমকে উঠলুম। দিদিভাইয়ের গভীর কালো চোখে জল টল্‌টল্‌ করছে।

আমি দ্বিরুক্তি না করে খেতে শুরু করলুম। কচ্‌কচ্‌ শব্দে খেয়ে ফেললুম শশার চারটে টুকরো। একটা মুড়ি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো। সেটা সযত্নে তুলে গলায় ফেলে দিলুম। আর যাই হোক, আমার ঝিল্লীদির যেন কোনো অসম্মান না হয়।

সেই আমার ঝিল্লীদির সঙ্গে বন্ধনের সূত্রপাত। উনি গ্রহ, আমি উপগ্রহ। দিদিভাইয়ের সম্মান নিয়ে তিনি অক্ষয় হয়ে বসলেন আমার জীবনে।

খাওয়া শেষ হতেই তিনি বললেন : হ্যাঁরে, আকন্দ, সেদিনের ব্যাপারটা নিয়ে তুই নাকি মন খারাপ করে আছিস্ ?

—মিথ্যের মধ্যে, অন্যায়ের মধ্যে আমি থাকতে চাইনে, ঝিল্লীদি। বড়দাকে আমি সব খুলে বলবো।

—তা বল্তে পারিস্। কিন্তু তাতে লাভ ? তোর বড়দার তো তিন দিনের হাজতবাস হয়ে গেছে। সেই কষ্ট থেকে তাঁকে মুক্তি দিতে পারবি ?

—না, তা পারবো না। কিন্তু বিবেকের দংশন থেকে আমি নিজেকে বাঁচাতে পারবো।

—বিবেক ? ওই বিবেক বাঁচাতে গিয়ে যদি আর কারো বিপদ ঘটে তাতে তোর বিবেকে লাগবে না ?

—তা লাগ্বে। কিন্তু তাতে কার বিপদ ঘটবে ? দাদাদিদিরা ছাড়া আমার আর কেউ নেই যার বিপদে আমার মন আঘাত পাবে।

—ধর্ তোর বিল্লুদার ?

—আমি তাঁকে এখনও দেখিনি।

একটু ইতস্ততঃ করে তিনি বললেন : তোর ঝিল্লীদির যদি বিপদ ঘটে ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারলুম না। একটু চুপ করে থেকে বললুম : তাহলে আমাকে ভেবে দেখতে হবে।

—কেন ?

—না, সে উত্তর আমি দেবো না।

ঝিল্লীদি নাছোড়বান্দা। বললেন : বল্, কেন আমার বিপদ ঘটবে জান্লে তুই বিবেকের তাড়না ভুলতে রাজি আছিস্ ?

আমি লাজুক মুখে বললুম : তোমাকে দেখামাত্রই যে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। তুমি আমার দিদিভাই হয়ে গেছো।

ঝিল্লীদি আমার চিবুক ধরে মুখটা তুললেন। বললেন : তাহলে তোর দিদিভাইয়ের একটা কথা চিরদিন মনে রাখিস্। বৃহত্তর কল্যাণের জন্য অল্প-স্বল্প অন্যায় করলে অপরাধ হয় না। যদি হতো তবে হয় পৃথিবী রামরাজ্য হয়ে যেতো, নয় পাপে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তো। তুই এখনো ছোট, আমার সব কথা বোঝার বয়স তোর এখনো হয়নি।

—বৃহত্তর কল্যাণ কাকে বলছো, ঝিল্লীদি ?

—স্বাধীনতা।

—তাহলে তোমরা দুজন কি স্বাধীনতার যোদ্ধা ?

ঝিল্লীদি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠলেন : চুপ চুপ, একথা কখনো মুখে উচ্চারণ করবি না।' শুনতে পেলে তোর বিল্লুদা তোকে কেটে ফেলবে।

—বড়দার দিকটা তুমি দেখছো না!

—রাগ করিস্‌নে, আকন্দ। তোর বড়দার মেয়াদটা তিন দিনের চেয়ে বেশি হলে ভালো হতো। ছেলেবেলা থেকে তিনি শুধু ক্ষুধার অত্যাচারই সহ্য করে এসেছেন। দেশের যে সব সোনার টুক্‌রো ছেলে জেলে পচ্‌ছে, তাদের দুঃখটা তাঁর জানা ছিলো না। সেটা এবার একটু জেনে এলেন, ভালোই হলো।

এমন কথা আগে কেউ আমাকে বলেনি। এই প্রথম শুন্‌লুম সেই অজানা দিকটার কথা। ঝিল্লীদিকে প্রণাম করে বললুম : তোমার কাছে একটা অজানা জগতের খবর পেলুম। যে কথা বললে তা আমার মনে থাকবে আজীবন। এবার উঠি।

এর পর থেকে ঝিল্লীদির ওখানে আমার যাতায়াত শুরু হলো।

মনে পড়ছে একদিনের কথা। ততদিনে বিল্লুদার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে। গিয়ে দেখি, ঝিল্লীদি বাড়ি নেই। বিল্লুদা একা বসে আছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেও দিদিভাই সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেলো না।

আমাকে দেখে বিল্লুদা বললেন : বোসো।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ।

— তোমার জানাশোনা ছেলেরা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে না?

—কেউ কেউ পড়ে।

— ছাত্র পেলে আমিও পড়াতে পারি। ঝিল্লী বলছিলো, তোমাকে জিজ্ঞেস করতে।

—ওরা সব টিচারদের কাছে পড়ে।

হেসে বললেন বিল্লুদা : আমিও খারাপ পড়াবো না। একদিন আমিও এম. এ. পাশ করেছিলুম।

অমিতের কাছে শুনেছিলুম, সে বিল্লুদার কাছে পড়ে। তার বিনিময়ে ওঁদের ঘর ভাড়া দিতে হয় না। মাঝে আরো কয়েকটি ছাত্রকে পড়তে দেখেছি। তাও বোধহয় অমিতই জুটিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু আজকাল কোনো ছাত্রকে পড়তে দেখি না।

চকিতে মনে পড়লো কিছুদিন যাবৎ ওঁদের ঘরে উনুন জ্বলতে দেখিনি। তবে কি ঝিল্লীদি বিল্লুদা আজকাল প্রায় অনাহারে আছেন? আমার কান্না পেলো। কিন্তু আমি ছোট, কি করতে পারি ওঁদের জন্য?

বললুম : কেউ পড়ে কিনা, দেখবো।

বোধহয় আমার কণ্ঠস্বরে কান্নার আভাস ছিলো। বিল্লুদা হঠাৎ কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে বললেন : সেদিন কি বলছিলে সুভাষ বোসের কথা?

—আমি তাঁকে দেখেছি। তখন তিনি প্রথম কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন। সঙ্গে ছিলেন আশ্রাফউদ্দিন আহ্মেদ চৌধুরী ও বসন্ত মজুমদার। শেষের দুজনকে আমি আগেও দেখেছি।

—কোথায় ?

—আহ্মেদ সাহেব আমার মামার জমিদারের ছেলে। আমার দাদাদের চেনেন, ভাগ্নে বলে ডাকেন। বসন্তবাবু সম্পর্কে আমার মায়ের ভাই হন।

—সুভাষ বোসকে দেখে কী মনে হলো তোর ?

—সেই গভীর রাত্তিরে তাঁকে দেখে মনে হয়েছিলো, মানুষ এত সুন্দর হয় ! এত ননীর মতো সুন্দর মানুষের মধ্যেও আগুন থাকে ?

—বক্তৃতায় কী বলেছিলেন তিনি ?

—রাত বারোটার সেই সভায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা ছিলো বেশি। তিনি তাদের বলেছিলেন, মা ও বোনেরা, আপনাদের সুন্দর করে নিকোনো রান্নাঘরের মালিক আপনারা। যদি একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখতে পান, আপনার সেই রান্নাঘরটি দখল করে বসে আছেন একজন অপরিচিতা মহিলা তবে কি আপনারা রুখে দাঁড়াবেন না, প্রতিবাদ করবেন না ? তেমনি আমাদের এই সোনার দেশ দখল করে বসে আছে এক বিদেশী জাত। আপনারা তাদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান, প্রতিবাদ করুন। ওদের দেশছাড়া করুন। আপনারা যদি একটি করে ছেলে আমাকে দেন, তবে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, দেশকে স্বাধীন করে ছাড়বোই।

বিল্লুদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগলেন। যেন মনের ভেতরটা পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে দেখছেন। চোখে এমন তীব্র সন্ধানী আলো আমি আর কারোর মধ্যে দেখিনি। কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করলুম। আমি খেতে-না-পাওয়া এক সামান্য ছেলে, আমার মধ্যে কী খুঁজছেন বিল্লুদা ?

—তা হলে সুভাষ বোসকে তোর ভালো লেগেছে, বল্।

লক্ষ্য করলুম, বিল্লুদা 'তুমি' থেকে 'তুই'-তে নেমে এসেছেন। মনটা খুশি-খুশি হয়ে উঠলো। বললুম : খুলে বললে তুমি হাসবে না তো !

তাঁর স্বচ্ছন্দ মুখে দেখলুম নীরব আশ্বাস।

—যখন সিক্স-এ পড়ি, একবার কলকাতায় গিয়েছিলুম। দেখেছিলুম ইয়া উঁচু মনুমেণ্ট। সুভাষ বোসকে দেখে মনে হলো, আমরা যদি হই নড়বড়ে বাঁশের খুঁটি, উনি শক্ত-সমর্থ মনুমেণ্ট।

বিল্লুদা কথাগুলি শুনে অবাক হলেন। বিরক্তির কোনো ছায়া দেখলুম না তাঁর মুখে।

—আর কোনো নেতার নাম জানিস্ ?

—জওহরলালের নাম শুনেছি। কিন্তু তাঁকে কখনো দেখিনি। তিনি অনেক দূরের মানুষ, এই গাঁয়ে থেকে তাঁকে দেখবো কি করে ?

—নাম শুনলি কোথায় ?

—খবরের কাগজে ওঁর কথা পড়েছি, ছবি দেখেছি। তাছাড়া ফুলদা অনিন্দ্য প্রায়ই ওঁর কথা বলেন।

—কী বলেন ?

—উনি নাকি সত্যিকারের উদারনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক। ফুলদা ওঁকে আদর্শ বলে মানেন। দেশের ভবিষ্যৎ ওঁর হাতে থাকলে নাকি নিরাপদ।

—শব্দগুলির মানে তুই জানিস্ ?

—না। কিন্তু আমার ফুলদা তো কখনো ভুল বলেন না। আমি ওঁকে খুব মানি।

—গান্ধীজীর কথা শুনেছিস্ ?

—হ্যাঁ। সত্যেন দত্তের কবিতায় পড়েছি। উকিলকাকার কাছে শুনেছি, আমার জন্মের আগে কুলি-ধর্মঘটের সময় এসেছিলেন আমাদের মহকুমা সহরে। কিন্তু উনি তো বুদ্ধদেব।

—কার কাছে শুনলি ?

—লম্বু মহারাজ গান্ধীজীর কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে বুদ্ধদেবের সঙ্গে কি প্রসঙ্গে তাঁর তুলনা করেছিলেন।

এক পনেরো বছর বয়সের কিশোরের এই দেশচর্চায় নিশ্চয়ই বুদ্ধির খরচা বেশি ছিলো না। বিশ্বাসের বৃন্তটিও ছিলো অবশ্যই চুনুরি শাঁড়ির চুমকির মতো মজবুত! বৃহত্তর চৌহদ্দি সম্পর্কে চৌকশ কোনো মানুষের স্বরভঙ্গি আমার কথায় বিলুদা আলবৎ খুঁজে পাননি। তবু তিনি বিরক্ত হননি।

যেন নিজেকেই নিজে বলছেন এমনভাবে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন: হয়তো তোর কথাই ঠিক। আজকাল কতজনাই সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন। কিন্তু কেউ তার গায়ের চামড়া পাল্টাতে পারে না। আমিও পারবো না! আমাকে শেষ হয়ে যেতে হবে আমারই পথে।

কাকে কি বলছেন তিনি ? আমি অবাক্।

হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তিনি। বললেন: শুনবি একজন মানুষের গল্প। সুব্রত রায়, আমার হরিহরাত্মা বন্ধু।

গল্পের গন্ধ পেয়ে আমি এগিয়ে বসলুম।

এরপর বিলুদা আমাকে যে কাহিনী শুনিয়েছিলেন তার স্বরলিপি আজ আর আমার মনে নেই। কিন্তু গল্পটি আমার আজো স্পষ্ট মনে আছে। সদয় পাঠক, সুব্রত রায়ের সেই অনবদ্য আখ্যান শুনুন আমারই মুখে। এতে যদি কোনো ত্রুটি ঘটে তবে একজন আমাকে ক্ষমা করবেন না। সে আমার বিন্নীদি।

সপ্তরঙা প্রজাপ্রতি-পাখা নিয়ে জীবন যেখানে উড্ডীন নয়, সেখানে মানুষ দু'মুঠি অন্নের কাঙাল। রং-বেরংয়ের হোলি খেলা নেই, আছে পেটের লড়াই।

ভুরভুরে মেঠো গন্ধে আর ধোঁয়ার অন্ধকারে লেখা হয় জনতার ইতিহাস। সুব্রত রায় আর চিনু মিত্রের রক্তেও কি নেই তাদের ইতিহাস? ওদের দু'জনের ক্ষুধাও কি নয় তাদের ক্ষুধার নামান্তর? সবুজ ধানের খেতে সোনার শরৎ, থোকা থোকা ফসল ফলেছে। কিষাণের রক্তে বোনা ধান। তবু কিষাণ কতটুকু পায়? যে ক'টি মানুষ ঐ পাহাড়ী টিলায় আর বাংলো-বিতানে, বিলিতি নেশার ফাঁকে ফাঁকে হুকুম চালায়, তাদেরই মেসিনের মুখে কিষাণের ভবিষ্যৎ বেচা হয়ে গেছে। কিষাণ-কিষাণী তাই অন্ন খুঁজে মরে—সুব্রত-চিনু শুধু তাদের খোঁজার দোসর।

রৌদ্রচটা ক্লান্তদেহে ওরা ঘরে ফিরে আসে। যাদের দাবির আহ্বানে রাঁচিতে এসেছে, তাদের মাঠের আলে আর ফার্নেসের ধারে ওদের দিন কেটে যায়। তাদের দুঃখ আর দুর্দিনের হাহাকারে খুঁজে মরে বিপ্লবের ঢেউ—একরঙা জনতার ঢেউ। কোল ভীল ওঁরাও মুণ্ডার দল ওদের সুহৃদ। চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট রণদাপ্রসাদ আর সহেলী, ডাঃ নীতিরঞ্জন ঘোষ ও মিসেস ঘোষ, লীনা ও পারমিতা সেখানে অজ্ঞাত অচিন। শ্রান্ত ওরা, তবু নিজেদের মানুষী ধর্মে ভ্রান্ত নয়।

এমন সময় ডাক এলো নেতার। আসামে যেতে হবে।

গোপন বার্তায় নেতা জানিয়েছেন, পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ইংরেজ পর্যুদস্ত। এই সুযোগে তাদের অবিলম্বে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করতে হবে। সুব্রত রায় ও চিনু মিত্র সৈনিক মাত্র, নেতার আদেশ নির্বিচারে মেনে নেওয়াই তাদের কাজ। ইংরেজকে এদেশে যুদ্ধের ঘাঁটি তৈরি করার সুযোগ দেওয়া চলে না। উই মাস্ট সাবোটেজ দি ওয়ার প্রিপ্যারেসন্‌স্‌। উই মাস্ট।

ওরা রাঁচি ছেড়ে চলে গেলো আসামে।

সীমান্ত সহর কেতনগঞ্জ। বনজ সম্পদের কেন্দ্রস্থল। চারদিকে থরে থরে গড়ে উঠেছে কমলা আর চায়ের বাগান। ওয়েস্ট এণ্ডের কাফেতে বসে পোর্সেলিনের ধূমায়িত কাপে স্বপ্ন দেখার আয়োজন হয়েছে আসামের অরণ্য-ভূমিতে। তাই বিস্তীর্ণ চায়ের বাগানে চাবুক প্র্যাকটিস করছে ডাউনিং স্ট্রিটের ক্ষুদে প্রতিনিধি ইংরেজের বাচ্চা। জাত কেউটের দাপটে ভীত সন্ত্রস্ত কুলিনামধারী জীবগুলি। সম্প্রতি গ্লাসগোর ধুরন্ধরেরা সন্ধান পেয়েছে এক ঘুমন্ত রত্নখনির—পেট্রোল আর কেরোসিন আবিষ্কৃত হয়েছে কেতনগঞ্জে।

সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছল হয়ে উঠেছে অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির যত শ্বেতপ্রেম। চতুর ইংরেজের স্নায়ুতে আজ ডেসডিমনার সোনালি দেহের চেয়েও বেশি আলোড়ন তোলে কেতনগঞ্জের পাথুরে মাটি। পেট্রোমাক্সের সতেজ আলোতে ভরিয়ে তোলা যাবে বাকিংহাম প্যালেসের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ। হিন্টারল্যাণ্ড

কেতনগঞ্জ থেকে কলকাতা—সেখান থেকে ডোভার বন্দরে পাড়ি দেবে ভারত-বর্ষের মাটির তলার স্নেহধারা।

ইংরেজের কাছে কেতনগঞ্জের মূল্য আজ অসামান্য। তাকে যে-কোনো মূল্যেই হোক্ রক্ষা করতে হবে। খেঁদা-নাক জানোয়ারগুলি সংগীন উঁচিয়ে আছে ইরাবতীর তীরে। সেখান থেকে সীমান্ত পেরুলেই ভারতবর্ষের মাটি। না, না, কেতনগঞ্জকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডের দরজা তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে সৈন্যসমাবেশ করতে হবে এক ব্যাটালিয়ন। ফলে রাতারাতি সাফ হয়ে গেলো বন-জঙ্গল। স্টিম রোলার চললো ফসলী মাঠে—মিলিটারি ব্যারাক উঠছে, এরোড্রাম হবে।

সঙ্গে সঙ্গে এলো অন্যান্য সবাই—মেজর আর লেফ্টেন্যাণ্ট, আর্মড ফোর্স আর ওয়াকি, কামান আর বারুদ, কনট্রাক্টার আর দালাল, ডাক্তার আর সিস্টার। এলো সোমারীরা পাঁচজন—এদেশের সৈন্যদের জন্য। খাস ইংলণ্ড থেকে এলো মিস্ স্টুয়ার্ট-হ্যারিসনরা। খুব সম্ভবতঃ এদের অভাবে শ্বেতকায় আর্মি অফিসারদের জঙ্গী ভাব খোলে না। আর এলো সুব্রত রায় ও চিনু মিত্র, নিরস্ত্র। শুধু বুকজোড়া সাহস ও চোখভরা স্বপ্ন নিয়ে।

কয়েকদিন সোমারীর ঘরে কাটলো সুব্রত রায় ও চিনু মিত্রের। মোংলারা ওখানে আর আমল পায় না। ঘরের কাছে গেলেই খেঁকিয়ে ওঠে সোমারী। তারা কি যেন ফুসফাস করে, মোংলারা আড়াল থেকে শুনতে পায়।

তারপর একদিন ভোর না হতেই সোমারী ছুটলো ঘরে ঘরে। সবাইকে জানিয়ে এলো অজস্র অর্থ নিয়ে এক বিবিসাহেবা মদের দোকান খুলছে। অর্ধেক দামে সেখানে নেশার খোরাক পাওয়া যাবে। সোমারীর কথা শুনে উল্লাসে নেচে উঠলো নেশাখোরের দল। নতুন স্বর্গের দ্বার খোলা হচ্ছে যেন তাদের সামনে।

সাকী ঘর। মদের দোকান। তারই মালিক এখন চিনু মিত্র। কাউন্টারে বসে দেখাশুনো করে, টাকা পয়সা আদায় করে। সোমারীর পরনের জংলী শাড়িটা ধোপদুরস্ত, গলায় পাথরের মালা। দিনের শেষে আসে মদ্যপায়ীর দল—রংকু, মোংলা, থিমায়া এবং আরো অনেকে। হেসে হেসে কথা কয় সোমারী, কিন্তু হাত বাড়িয়ে ছুঁতে গেলেই চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। ভয়ে একেবারে হিম হয়ে যায় মোংলার দল।

ভদ্রলোকের সান্নিধ্যে এসে সোমারীও কি ভদ্র হয়ে গেলো? কিন্তু রংকু, থিমায়া, ইকবাল সিংয়েরা ভুলতে পারে না বহু বিনিদ্র রজনীর মত্তমদির ইতিহাস। রাগ হয় চিনু মিত্রের ওপর, মাথায় খুন চেপে বসে। কিন্তু হাতের ডাণ্ডাটা কখন শিথিল হয়ে পড়ে যায়, রিভলভারের বেল্ট থেকে কখন আঙুলগুলি আপনিই সরে আসে।

মদ ঢালা হচ্ছে, গন্ধে আকাশ-বাতাস মাতোয়ারা। ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে

এগিয়ে আসে সোমারী। উইলসন, থিমায়া, ইকবাল সিংয়ের দল সব ভুলে যায়। গলাটা শুকিয়ে আসে—কয়েক ঢোকে একটু ভেজে মাত্র। আরো চাই—আরো। নেশা জমতে থাকে, লাল নীল ফুল ফুটতে থাকে। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে।

ঘুষ কখনো ব্যর্থ হয় না। আর কেউ না জানুক, যুদ্ধের যুগের সুযোগ-সন্ধানীরা এ কথা ভালো করেই জানে। সাকী ঘরের উদার দাক্ষিণ্যের বিনিময়ে সুব্রত রায় পেলো ব্যারাক তৈরির কাজ। বিপ্লবী এখন ছদ্মবেশী মিলিটারি কনট্রাকটার। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের তৈরী চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে আগুনের খেলায় মাতালো কেতনগঞ্জে।

পুরোদমে কাজ চলছে। জোয়ান মরদ মজুরদের নেতা মোংলা। সাকী ঘর সামলানোর ফাঁকে ফাঁকে মেয়ে-মজুরদের সর্দারি করে করে আসে সোমারী। সুব্রতর নিঃশ্বাস ফেলারও সময় নেই। লাল টালির ব্যারাকের মধ্যে লাল স্বপ্ন দেখছে তার মন। ভয়ঙ্করের সাধনায় উত্তীর্ণ হওয়ার আর দেরি নেই।

টাটানগরের ঢেউ-টিন পশ্চিমা সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায় সেই দ্বীপে—যেখানকার মানুষ উত্তাল তরঙ্গকে পর্যন্ত শাসন করতে জানে। তাই জামসেদজীর স্বপ্নলোকের মুখে লালমুখো পাহারাওলা। তা এড়িয়ে যাবার জো নেই। কিন্তু করাত তৈরির কারখানার দরজা খোলা, সেখানে নিত্য আনাগোনা রাণা প্রতাপ সিং আর শশাঙ্কের বংশধরদের। অন্যথায় সুন্দরবনের করাতকলের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। বৃথা হয়ে যাবে শালবনী, মানকুণ্ডু আর কেতনগঞ্জের সামরিক মহড়া।

মেজর উইলসন খুব খুশি। আগাগোড়া উড্‌কনস্ট্রাকশন্। এরিয়া ফেন্সিং থেকে শুরু করে ভিত পর্যন্ত কাঠের তৈরি! গেট থেকে করিডর, এ-ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়ার পথগুলি পর্যন্ত ইট-সুরকির নয়, কাঠের। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, কোনো বিল্ডিং সোসাইটির গড়া আইডিয়েল হাউসিংয়ের মনোরম মডেল। উইলসন আনন্দে পিঠ চাপড়ান সুব্রতর। সস্মিত মুখে বলতে থাকেন, বাঙালীর সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে স্কটল্যান্ডের দু'পেনি দামের উইক-এন্ড সাপ্তাহিকে রিটায়ার্ড সিভিল সারভেন্টদের সপ্রশংস গবেষণার কথা।

ব্যারাক তৈরির শেষে রঙ লাগাবার পালা। সাহেব বলেছেন, লাইট পেইন্ট ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে শত্রুরা আকাশ থেকে সার্চলাইট ফেলে তাদের অবস্থান বের করে ফেলবে। বোমা পড়বে ব্যারাকে।

যথাসময়ে পেইন্টসের লেবেল এঁটে সুব্রতর আস্তানায় এসে পৌঁছোলো কতকগুলি দরকারি মাল-মশলা। সঙ্গে সঙ্গে এলো একজন রঙের কারিগর। এই কারিগরিতে মহড়া দেবার জন্যে তাকে গোপনে বেশ কিছুদিন কাটাতে হয়েছে মধ্যপ্রদেশের পাহাড় অঞ্চলে।

সুব্রত সোমারীকে ডেকে বললো : এবার তোমার আসল কাজ শুরু। পারবে তো ?

—পারবো, বাবুসাহেব।

ছোট্ট কথা। কিন্তু চোখের ভাষা মুখর হয়ে জানিয়ে দিলো তার মনের আগুন। এই আগুনই যদি না জ্বললো তবে বৃথা সুব্রত রায়ের পাঁচ মাসের শিক্ষা।

শিথিল আঁচল কোমরে এঁটে ব্রাস নিয়ে কাজে চললো সোমারী। সঙ্গিনী দশ বারো জন। ওদিকে ফরমুলা অনুযায়ী রঙ তৈরি করেছে নতুন কারিগর। সুব্রত উপস্থিত নেই। সামনেই বড়ো দিনের উৎসব। উইলসনেরা একটু আমোদ-আহ্লাদ করবেন সেই শুভদিনে। তারই আয়োজন করতে হবে। পানীয় আর খাদ্য এসেছে প্রচুর। নিমন্ত্রণ করা হয়েছে শ্বেতাঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের। অর্ধাঙ্গিনী শব্দের সৃষ্টি এদেশে, কিন্তু প্রয়োগ ওদেশে। সুতরাং শ্বেতাঙ্গিনীদের শুভাগমন হবে সন্দেহ নেই। সুব্রতর এখনো অনেক কাজ বাকি।

সোমারী সঙ্গিনীদের ডেকে বলে : কিলো, হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্ ? ওই হাড়-বের-করা ডাল কুত্তাটাকে বুঝি ? বলেই আমেরিকান সেণ্ট্রির দিকে তাকিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

হাসলো অন্যান্য সবাই। উদ্বিগ্ন গোঁফের ফাঁক দিয়ে হাসলো শ্বেত-পুঙ্গব। ভাষার ব্যূহ ভেদ করবার সাধ্য তার নেই, কিন্তু চোখের ভাষা দেখে ভাবলো হয়তো তাকে ভালোবেসে ফেলেছে এই কৃষ্ণকায়া। একটু মিষ্টি করে হাসবার কসরৎ করলো সেণ্ট্রি।

কিন্তু ততক্ষণে পুরোদমে কাজে লেগে গেছে সোমারী। উৎসাহ তার দুর্বার। নতুন কারিগর বললো : ওগো মেয়েরা, একটু আস্তে। রঙ তৈরি করতে সময় লাগে। তোমাদের সঙ্গে পেরে উঠছি না।

—কেমনতরো মরদ তুমি, বাপু ? এ-কয়টা মেয়ের জন্যে রঙ যোগাতে পারছো না। তার চেয়ে কারিগরি ছেড়ে দিয়ে শহরে গিয়ে মরিচার ব্যবসা করো। বলে হেসে ফেললো সোমারী, হাসলো অন্যান্য মেয়েরা।

এমনিভাবে কাজ চললো এক সপ্তাহ। রঙের কাজ শেষ হয়ে গেছে। গেটের কাছে তৈরি হয়েছে ভাবী জয়ের স্মারক-স্তম্ভ। স্তম্ভের মাথায় বৃটিশ সিংহাসনের ছবি। উইলসনের খুশির অন্ত নেই। ওটার দিকে তাকিয়ে থাকেন আর ভাবেন, ভিক্টোরিয়া ক্রসের আর কত দেরি ?

বড়দিন। আনন্দের ফোয়ারা ছুটেছে মিলিটারি ব্যারাকে। উৎসবের আয়োজন নিখুঁত—মদ ও মাংস নিয়ে। সেদিন রাত্রির অন্ধকারে সুব্রত আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো সোমারীকে নিঃশব্দে।

—ভয় পেয়েছো ?

—না।

—বেশ।

পকেট থেকে সুব্রত বের করলো একটি ছবি। বললো : এই ছবি কার জানো? ইনি মন্ত্রগুরু। এঁকে প্রণাম করো।

—না।

—কেন?

—এঁর চেয়ে ভালো জানি, বাবুসাহেব তোমাকে। তোমাকেই প্রণাম করবো।

সুব্রত রায়কে প্রণাম করে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো সোমারী। এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলো চিনু মিত্র। বললো : কোথায় যাচ্ছো?

—ব্যারাকে।

—না। আমি যাবো।

—তুমি যেও না, বিবিসাহেবা। ওরা তোমাকে ছিবড়ে খাবে। মনে নেই, আজ ব্যারাক তৈরির টাকা-পয়সা মিটিয়ে দেওয়ার সময় ওরা কড়ার করে নিয়েছিলো, তোমাকে রাত্তিরে যেতে হবে ব্যারাকে।

—তোর ভয় নেই?

—না, বিবিসাহেবা, নেই। আমার হারাবার মতো আর কিছু নেই। তাই আমার কিসের ভয়! কিন্তু তোমার তো সব আছে। তুমি যাবে কেন?

চিনু মিত্র কোমরে গোঁজা রিভলবারটা বার করে সোমারীর দিকে তাক করে বললো : যদি কথা না শুনবিতো এক্ষুনি তোকে গুলি করবো। পাশের ঘরে চলে যা। আমার কাপড়-চোপড় সেখানে আছে। কাপড়জামা বদলে আমার মতো সেজে আয়। তোর কানের দুল, গলার মালা কাপড়জামা এক জায়গায় জড়ো করে রেখে আসবি। দশ মিনিট সময় দিলুম।

সুব্রত রায় নাটকের নীরব দ্রষ্টা। তার কিছু করবার নেই। চিনু মিত্র ড্রয়ার খুলে হাজার টাকার একটা বাণ্ডিল টেবিলের ওপর রাখলো।

সোমারী ফিরে এলো। ঠিক চিনু মিত্রের সাজ। কোথাও একটু ভুলচুক নেই। চিনু মিত্র একবার চোখ বুলিয়ে বললো : টেবিলের ওপর থেকে টাকার বাণ্ডিলটা নিয়ে এই মুহূর্তে পালিয়ে যা। একেবারে সীমান্তের ওপারে। নাম জিজ্ঞেস করলে বলবি : চিনু মিত্র! দেরি করবি তো পিস্তল ছুঁড়বো।

চোখের জল চাপতে চাপতে সোমারী মিলিয়ে গেলো বাইরের সীমাহীন অন্ধকারে। টাকার বাণ্ডিলটা পড়ে রইলো টেবিলেরই ওপরে।

চিনু মিত্র চলে গেলো পাশের ঘরে। সুব্রত রায় বসে রইলো জড়ভরতের মতো। মনে হলো তার শরীরে কোনো স্নায়ু নেই। মগজের ঘিলু চিরদিনের মতো শুকিয়ে গেছে। সাড়া নেই চেতনায়। তবে কি এই মুহূর্তে বিপ্লবী

সুব্রত রায় মৃত ? কোনো কালনাগিনী এসে তাকে দংশন করে তার নীলকান্ত শরীরটাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেলো কলার ভেলায় ?

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই সুব্রত রায়ের। হঠাৎ খেয়াল হলো সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে সোমারী। পরনে সেই সবুজ ঘাঘরা, গায়ে নীল ব্লাউজ, নাকে কাচের নাকছাবি, পায়ে রুপোর মল, কানে ঝুমকো দুল, গলায় পাথরের মালা। সোমারী এলো কোথা থেকে ? একটু ঠাহর করতেই চোখে পড়লো, কোমরে রিভলবার গুঁজে নিয়েছে মেয়েটি। না, সোমারী নয়, চিনু মিত্র।

সুব্রত রায়ের ঠোঁটে মরা আলোর মতো হাসি। মিয়ানো। বললো : এই কি বিদায়বেলার সাজ ?

—ছিঃ, এ দুর্বলতা বিপ্লবীকে মানায় না !

—সোমারী কি পারতো না ?

—বিপদের ঝুঁকি যেখানে আছে সেখানে সরলা সোমারীকে এগিয়ে দিলে অপরাধ হতো। চিনু মিত্র বিপ্লব-বিপ্লব খেলতে নামেনি। আজকে তার মরণ খেলা। হয় এসপার, নয় ওসপার।

—যদি ওরা তোমাকে নিয়ে বেইজ্জতি করে ?

নীরবে কোমরের রিভলবারটা দেখিয়ে দিয়ে তড়িৎবেগে বেরিয়ে গেলো। যাওয়ার আগে বাতাসে ছুঁড়ে মারলো চারটে শব্দ : খড়ো ঘরে অপেক্ষা কোরো।

চিত্রার্পিতের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুব্রত। তারপর এগিয়ে চললো নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে।

গভীর রাত্রি। বাইরের সীমাহীন অন্ধকারে সন্ধানী দৃষ্টি রেখে এক অসহ্য অস্থিরতায় পায়চারি করছে সুব্রত রায়। কেতনগঞ্জের সীমানার কাছে একটি খড়ো ঘরে। কিন্তু কোথায় চিনু ? চিনু যদি ধরা পড়ে থাকে—তবে সুব্রতর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে, পণ্ড হয়ে যাবে গত সাত মাসের অমানুষিক পরিশ্রম। এক অজানিত আশঙ্কায় আকুল হয়ে উঠেছে সুব্রতর মন।

বাইরে পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। বেরুবার আগেই ছুটে এসে সুব্রতকে জাপটে ধরলো চিনু মিত্র। বুকে তার নিঃশ্বাসের তুফান চলেছে। ঘামে ভিজে গেছে সারা দেহ।

—কাজ হাসিল হয়েছে চিনু ?

—ওই দ্যাখো।

সুব্রত তাকিয়ে দেখলো পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে উঠেছে সর্বগ্রাসী আগুনের লালশিখা। একটি কাঠিই যথেষ্ট—তাতেই পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সব। নিজের হাতে গড়া মিলিটারি ব্যারাক, দাহ্য পদার্থ তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। একটু আগুনের প্রেমস্পর্শ পেলেই সব শেষ। আর ভাবী জয়ের স্মৃতিস্তম্ভ ?

এতক্ষণে বিস্ফোরণে ধূমায়িত হয়ে উঠেছে ব্যারাকের আকাশ। বাতাস ভরে উঠেছে হাজারখানেক শরীরের পোড়া গন্ধে।

ঝিল্লীদি, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলুম এক আরব্যরজনীর গল্প। মনে হচ্ছিল, আসামের কেতনগঞ্জ আমার ভূগোল বইয়ের নতুন-পেয়েছির দেশ। কখন তুমি একপাশে এসে দাঁড়িয়েছো তা আমরা দুজনে কেউ খেয়াল করিনি।

হঠাৎ তোমার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলুম। বললে : কিরে, সুব্রত রায় চিনু মিত্রের গল্প শুনছিস তো! এই নিয়ে বার চারেক হলো।

ঝিল্লীদির কপালে লেপ্‌টে আছে একগুচ্ছ চুল। এক হাতে একটা খুরপি, অন্য হাতে একটা বড়ো মেটে আলু। দীর্ঘস্থায়ী পরিশ্রমের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে।

—ইস্, অত বড়ো একটা মেটে আলু। কোথায় পেলে? দালালদের ছাড়া-বাগানে বুঝি। আজ বেশ করে পুড়িয়ে পেট ভরে খাওয়া যাবে।

আমি স্পষ্ট দেখলুম, বিল্লুদার চোখ দুটো লোভে চক্‌চক্ করে উঠছে।

তুমি, দিদিভাই, বিল্লুদার কথার কোনো জবাব দিলে না। নিঃশব্দে মাটিতে নামিয়ে রাখলে খুরপি আর মেটে আলু। ওগুলির ভার যেন আর সইতে পারছিলে না। তেলহীন অগোছালো চুলগুলি চুড়ো করে বাঁধতে বাঁধতে বললে : ওই বাসি গল্প শুনছিস কেন বসে বসে? সুব্রত রায় চিনু মিত্র মরে কবে ভূত হয়ে গেছে। সেই ভূতের গল্প শুনে তোর কি লাভ হবে? পারিস্‌তো জ্যান্ত মানুষের গল্প শুনবি।

তাকিয়ে দেখি, বিল্লুদা একেবারে চুপ্‌সে গেছেন।

আমার নিস্তরঙ্গ মাথায় হঠাৎ কিসের যেন একটা ঢেউ খেলে গেলো। আমি উঠতে উঠতে বললুম : মরুক না সুব্রত রায় আর চিনু মিত্র। বেঁচে থাক্ আমার বিল্লুদা আর ঝিল্লীদি। তাঁদের মধ্যেই আমি খুঁজে নেবো আমার জীবনের আগুন।

ঝিল্লীদি, তুমি অসহায় মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলে। আমি উঠে চলে এলুম।

সেবার আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার বছর। জ্বরে পড়লুম বার পঁচিশেক। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখছি, জীবনটা আমার দত্তক দেওয়া আছে হাতুড়ে ডাক্তার জানকী আচার্যের কাছে। মাসে বার দুয়েকের জন্য যেন জ্বরকে বায়না দেওয়া আছে। আর তার পিছু পিছু আছে জানকীর জান-দেওয়ানো আজব মিকশ্চার। তাই এইরকম জ্ঞান অর্জন করা গেলো যে, জিভের অপর নাম নিম্বফল।

মাসখানেক অধিকারী-বাড়ি যাইনি। বোধহয়, ঝিল্লীদি, তুমি রাগ করে আছো এই ভাবতে ভাবতে গেলুম।

গিয়ে দেখি উঠোনের মাঝখানে এক রাশ শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তার চারদিকে মন্ত্র আউড়ে নাচছে ডাইনী। মাঝে মাঝে একটা পাতার মতো কি আহুতি দেওয়া হচ্ছে।

কাছে গিয়ে দেখি, ঝিল্লীদি, আর কেউ নয়। তুমি। আহুতি দেওয়া হচ্ছে এক একটা দশ টাকার নোট। কান পেতে শুনলুম মন্ত্রটা—

চিনু মিত্তির, চিনু মিত্তির করছো তুমি কি !
নিদ্রাহরণ রায়ের পায়ে মাখছো কেন ঘি ?
সুব্রতকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিলে যে,
যমরাজারই দূতের সাথে দেবো তোমার বে !

একী, এযে আমারই লেখা ছড়ার প্রতিধ্বনি ! মনে হলো বড়দার হাজতবাসে যে কষ্ট পেয়েছিলুম তাতে আমার শাস্তি অসম্পূর্ণ ছিলো। আজ সেই শাস্তি সম্পূর্ণ হলো।

তোমাকে গম্ভীরমুখে জিজ্ঞেস করলুম : বিল্লুদা কোথায় ?

আমার প্রশ্ন শুনে তুমি হা-হা করে হেসে উঠলে। সে কি উৎকট হাসি ! যেন থামতেই চায় না। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে মুখ ঘুরিয়ে বললে : জেলে।

—কে—কে বিল্লুদাকে জেলে দিয়েছে ?

—আমি।

—কেন, তুমি ঝিল্লীদি, এ-কাজ করলে ?

কান্নায় আমার গলা ধরে এসেছিলো। তুমি বললে : কাঁদছিস্ আকন্দ ! আমার কিন্তু হাসি পাচ্ছে।

বলে ছেঁড়া ব্লাউজের ভেতর থেকে একে একে বার করলে ন'টি দশ টাকার বাণ্ডিল। সেগুলি আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে তুমি বললে : আমিই নিদ্রাহরণকে বলে ওকে ধরিয়ে দিয়েছি। তার বদলে পেয়েছি ওই টাকাগুলি।

আমি চোখের জল চেপে চলে আসছিলুম। তুমি অকস্মাৎ জিজ্ঞেস করলে : হ্যাঁরে, ফাঁসি দেওয়ার আগে ওরা খেতে দেয় তো ? তাহলে লোকটা অন্ততঃ খেয়ে মরবে।

বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলে : এইরে, আমার প্রেমিক নিদ্রাহরণের আসবার সময় হয়ে এলো। আমাকে সাজতে হবে না ?

ঝিল্লীদি, তুমি দালালবাগানের ভেতর দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করলে।

ছুটন্ত সেই তোমার দিকে হাত তুলে আমি নমস্কার করলুম। তোমাকে আমার সেই-ই শেষ নমস্কার।

● ●

লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। মিথ্যা কথা। নীতিশাস্ত্রের আরো অনেক কথার মতোই শিশুপাঠ্য শ্লোক মাত্র। হালের দুনিয়ায় এসব কথার দাম কানাকড়ির সমান। এই তো সেদিন আমার ছেলে ইস্কুল-ফেরত নতুন বুলি ছাড়লো—লেখাপড়া করে যেই, গাড়িচাপা পড়ে সেই। অস্য অর্থ শ্রীমান্ অ্যাকসিডেণ্ট করে এসেছে। ক্ষতের পক্ষে ডেটল যথেষ্ট নয়, টেট ভ্যাক্ দিতে হলো। মিনি বাস নামক হাল-ফ্যাশানের রথযন্ত্রের ট্র্যাজিক ক্রিয়াটা মরণান্তক না হলেও বিষাদান্তক ছিলো। অতএব শ্রীমানের নতুন জ্ঞানোদয় বাস্তবভিত্তিক।

এই অধম আকন্দের ভাণ্ডারে বাড়তি কিছু না থাকলেও ঘাটতি কিছু ছিল না। ঠাকুরের নির্মাল্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বরমাল্যগুলি ট্রাঙ্কের তলদেশ আলোকিত করে আজো বিরাজ করছে। যেমন রত্নাকরের তলদেশকে সুশোভিত করে বিরাজ করে হীরা চুনি পান্না। কবুল করতে লজ্জা নেই, সেই শোলার মালাগুলি গলায় পরেই করে খাচ্ছি অর্থাৎ সংসার সাগরে ডুবুরির মতো হাবুডুবু খাচ্ছি। গাড়ি এখনো চড়িনি, গাড়ি চাপাও পড়িনি। ডিগ্রি নামক বয়াগুলিই আমাকে ভাসিয়ে রেখেছে।

না, পাঠক, আমি বেঢপ আকন্দ হলেও বেআক্কেল আদমি নই। প্রাতর্বাক্যের মতো আমার কথাগুলি আপ্তবাক্য না হতে পারে, কিন্তু দুঃশীলের দুর্বাক্যও নয়। আধিক্যেতা আমি করবো না, অকপটে শুধু স্বীকার করবো আমার ডিগ্রি আছে এবং পাকাপাকি চাকরিও আছে। চাতুর্মাস্য ব্রতফলের মতো আমার সাম্বাৎসরিক বৃত্তিফলও সন্তোষজনক। তবু আপনার আম ও খাস দরবারে এই আবেদন পেশ করছি যে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছি কিনা এই প্রশ্নটা যে-কোনো কমিশনের রায়ের মতো অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি রাখুন। অনুকূল পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমান রাজসাক্ষীর মতো আমি নিজেই এর সোজা জবাব দেবো। আপনাকে সওয়াল করতে হবে না।

এ-সংসারে কেউ চায় না সে কদ্‌বেল হয়ে থাকুক, সকলেই জাঁদরেল হতে চায়। তার জন্য নিজের ঢাক নিজেকেই পেটাতে হয়। কিংবা আশ্রম খুলতে হয়, পুষতে হয় কিছু আশ্রমমৃগ। রোজ সকাল বিকেল চা-এর সঙ্গে টা-এর অফুরন্ত সাপ্লাই অব্যাহত রাখলে দেখবেন—মৃগকুল স্বয়ং খ্যাতির মৃগয়ায় বেরিয়ে বিষাণ ফুঁকে বলছে: ভো ভো দেশবাসিন্! অমুকচন্দ্র শামুকের মতো নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন। উনি আত্মপ্রচারের কদাচারে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমরা অভ্রান্ত অভিজ্ঞতায় জানি, ওঁর মতো

পণ্ডিত ও বিদগ্ধ আর হয় না। আমরা পঁচিশে বৈশাখ জ্ঞানরূপা থিয়েটারে রবীন্দ্র-প্রণামের সঙ্গে ওঁকেও প্রণাম জানাবো। কারণ উনিই হচ্ছেন রবীন্দ্র-সংস্কৃতির কৃতী সন্তান। বাস্, আর বলতে হবে না। এরপর আপনিই হবেন সেলুন ইসাবেলা থেকে হরিদাস বাবাজির রাধাবিনোদ পালার উদ্বোধক। কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন, আশ্রমমৃগরা উদ্গতশৃঙ্গ হচ্ছে কখন। গুঁতোবার ধাতটা চাগা দিলেই হাতজোড় করে বলবেন: বাবারা তোমরা এরই মধ্যে যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত ও জ্ঞানঋদ্ধ হয়েছো। এখন তোমরা নিজেরাই আশ্রম খুলতে পারো। সাবধান, এর বেশি ফইজতে যাবেন না।

কিংবা আত্মপ্রচারের ডাক্তারি মেথডটাও নিতে পারেন। নিজের চোখে দেখেছি, একটা নির্মক্ষিক ডাক্তারখানার সামনে ঝুলছে রোগীহরণ বিজ্ঞাপন: ডাক্তারবাবু এখন টাইফয়েড, নিউমোনিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। দিনে দশজনের বেশী রোগী দেখেন না। টেলিফোনে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে আসবেন। এরপরে আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, ওই দাবাইখানায় মক্ষিকাদের কোলাহলে দামামা বাজছে। নোটিশটি লোপাট হয়ে গেছে।

তৃতীয় পন্থাটি আরো বিদগ্ধজনোচিত। কোনো এক রবীন্দ্রভক্ত অধ্যাপকের বাড়ির সামনে লম্বমান দেখেছি একটি ফরমান: সৈকত সান্যাল রবীন্দ্রনাথের ওপর বই লিখছেন। কাল সন্ধ্যায় লিখতে পড়তে বসেছিলেন। যখন খেয়াল হলো তখন কাক ডাকছে। এখন তিনি ঘুমুচ্ছেন। যাঁরা সভাসমিতি উপলক্ষে দেখা করতে চান তাঁরা বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে অনুগ্রহ করে আসবেন।—নীলনয়না সান্যাল। বিকেল তিনটের সরেজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে দেখি জন দশেক তীর্থের কাকের মতো বসে আছেন। এসেছেন সাঁত্রাগাছি, ক্যানিং, রঘুনাথপুর, পায়রাডাঙ্গা, রাণাঘাট ইত্যাদি কাঁহা কাঁহা মুল্লুক থেকে। নীলনয়না হাসিমুখের ও উজ্জ্বল চোখের দক্ষিণা ছড়াতে ছড়াতে দিন ধার্য করছেন এবং বর্ধিত হারে রাহাখরচসহ গাড়িভাড়া আদায় করছেন। পদ্ধতিটির কার্যকারিতায় আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনি।

এখন আমি আমার কৈশোরক অধ্যায়ের তপস্যার হিসেব কোন্ মেথডে লিখবো সেটাই সমস্যা। তিনটে মেথডের মধ্যে কোনোটাই জুতসই বলে মনে হচ্ছে না। এ হচ্ছে পাঠকের কাছে আমার জবানবন্দী। সত্য বই মিথ্যা বলবো না। আত্মহনন ও অনৃতভাষণ দুটোই মহাপাপ। অতএব যা সত্যি ঘটেছিলো তা-ই বলবো, যা ঘটেনি বা ঘটতে পারতো তা বলবো না। বুড়ো গোপাল নিয়ে যা কিছু করা যায়, বালগোপালকে নিয়ে নয়।

তখন আমার বয়স পাঁচ। বিদ্যার পঞ্চবটী বনে প্রবেশের কাল। পিতৃদেব কনিষ্ঠ পুত্রকে স্কুলে দেবার কথা ভাববার সময় করে উঠতে পারেননি, কেন না পুত্রটির জন্মাবধি তিনি সংসার জলধি সাঁতার কেটে পার হতে গিয়ে ক্লান্ত বিভ্রান্ত। বড়দা মসজিদ-আশ্রিত মক্তবে মাসিক আট টাকার হিন্দু-মৌলবী।

বাংলা পড়ান। আমি বর্ষারম্ভে সেই শিক্ষালয়ে শিশুশ্রেণীতে গিয়ে বসে পড়লুম—হাতে ঝোলানো জে.বি.ডি. বাড়িজাত কালির দোয়াত ও খাগের কলম, বগলে একগাদা কাঁচ কলাপাতা। খালি পদ, উদোম গা, পরনে ক্ষারবিধৌত জাঙিয়া। কপালে দইয়ের ফোঁটা নেই, কানে গোঁজা নেই আশীর্বাদী ফুল। সঙ্গে সঙ্গে ফেজ-পায়জামা পরিহিত হেডমৌলবীর সাদর অভ্যর্থনা: এই যে ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার! আপনি এখানে ছাগল চরাতে এসেছেন?

কটাক্ষটা স্পষ্টতঃই বগলদাবা-করা কদলীপত্রগুচ্ছের প্রতি।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির হুল্লোড়। একটি ছেলে বললো: মিঞা সাব অচিন্ত্যানন্দ স্যারের ছোট ভাই এই আকন্দ।

—ও! তা আপনি বসুন। তা পোশাকটাতো দেখছি গুলবাহার। তা আল্লার দেওয়া মেরজাই যখন পরে এলেন তখন আর কলের তৈরি জাঙিয়া কেন? একেবারে বেহেস্তের পোশাকে এলেই পারতেন।

বিশ্বাস করুন, পাঠক, আমি সেদিন কাঁদিনি। আজন্ম খোঁটা শুনে শুনে পাঁচেই অনুভূতিগুলি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো। জানি এযুগের মেয়েরা দুগ্ধবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর হাম্বাবতী থাকতে চান না। তাই বোল ফোটার পরেই নবজাতককে চুমো ও সন্দেশ খাইয়ে পাঠানো হয় মণ্টেসারিতে। আদিপর্বের পরে শাস্ত্রমতে আড়াই বছরে হাতেখড়ি। কাঁদুনে ছেলেমেয়ে ও আদুরে মায়েদের ক্ষেত্রে তড়িঘড়িও হতে পারে। তারপর চৌঘুড়িতে থুড়ি মোটরে চড়িয়ে ফীডিং বটল ও টিফিন বক্স সাহেবের খাস পিয়নের জিম্মায় দিয়ে মিস্ মণ্টগোমারির ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পাঠাতে হয়। প্রথমে কে.জি ওয়ান, তারপর টু, তারপর থ্রি। যে হারে কে. জি.-র দর বাড়ছে তাতে শেষ পর্যন্ত ওটা টেন পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াতে পারে। তারপর মন্ত্রী, আমলা কিংবা ব্যারিস্টারকে ধরে সেণ্টমাখানো কোনো স্কুলে ভর্তি করতে পার৷ে একেবারে টুয়েলভ্ পর্যন্ত নিশ্চিন্তি। হ্যাঁ ভাই, মরে গেলুম ভাই বলে মায়েদের যে হাঁসফাঁসানি তা ওই দ্বিতীয় স্টেজে। পঞ্চায়েত রাজত্বে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যাখানা ও মুদিখানা একসঙ্গে চলে সেখানে অবশ্য পরিস্থিতিটা ভিন্ন-রকমের। তবে রেডিও ও ট্রানজিস্টারের সাঁড়াশি অভিযান যেভাবে চলছে এবং টি. ভি.-র আগমন যেভাবে প্রত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে তাতে অবস্থান্তর ঘটতে দেরি হবে না।

না, বড্ড বাজে বকছি। তবে দোহাই, পাঠক, রাগ করবেন না। নিজের ক্ষেত্রে যাই-ই হোক ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে আধুনিকারা কেউ পেছিয়ে নেই। অবশ্য মোটর বিলাস বাদ দিয়ে।

—হাতের লেখা লেখো। ইংরেজী ও বাংলা।

ঘণ্টা দুই প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পর হেড-মৌলবীর কাছে দাখিল করলুম পত্রবিদ্যার নমুনা। তিনি উল্টেপাল্টে দেখে বললেন: বেশ!

তারপরেই সপাং করে একটা বেতের বাড়ি। নিরাবরণ ঊর্ধ্বাঙ্গে মারটা রক্ত না ঝরালেও কালসিটে দাগ বসিয়ে দিলো। হুংকার ছাড়লেন : র-এর পুটুলিটা অস্পষ্ট কেন ?

আসলে জে. বি. ডি-র বড়ির কালির কালিমার চেয়ে জলের মহিমা বেশি হয়ে গিয়েছিলো। খাগের কলমের অগ্রভাগে পুটুলিটা ঠিক বসতে চাচ্ছিলো না। সেই কথাটা বলতে যাচ্ছিলুম, আবার বেত্রাঘাত।

পরের দিন মনোনিবেশ করলুম বড়ির সঙ্গে জলের আনুপাতিক মিশ্রণকর্মে। তাতে যে পরিশ্রম হলো তার চেয়ে সান্নিপাতিক জ্বর হওয়া ভালো ছিলো।

যথাসময়ে প্রমোশন পেলুম শিশুশ্রেণী থেকে ক্লাশ ওয়ানে। অঙ্ক ও বাংলায় মোটকে মোট, ইংরেজীতে পাঁচ নম্বর কম। ওয়ানে বইয়ের সংখ্যা বাড়লো, কিন্তু আমার বাবার তবিল বাড়েনি। তাই ছুটির ঘণ্টা পড়ার আগে অন্যের বই নিয়ে পড়তুম। যেদিন বই পেতুম না সেদিন ক্লাশে পড়ানোটাই মনে রাখতে চেষ্টা করতুম। এতে আর কিছু না হোক্, আমার স্মৃতিশক্তিটা বেড়েছিলো।

কিন্তু মৌলবী সাহেবের মক্তবে ক্লাশ ওয়ানের বালাখানার পাট্টা অকস্মাৎ খতম হয়ে গেলো ক্লাশ টু-এর শেষ দিকে। বাবা গেলেন মারা, বড়দা অচিন্ত্যানন্দর আট টাকার অট্টহাসি প্রায় বিনা নোটিশে স্তব্ধ হয়ে গেলো। অজুহাত, ছাত্র নেই। আমি মাস দুয়েকের বকেয়া শোধ করে সংগ্রহ করলুম থ্রি-তে উত্তরণের ছাড়পত্রটি। এবার বড়ো ইস্কুলের হাঁসকলে মাথা দিতে হবে।

মাকে বলে চলে গেলুম সেক্রেটারি রতিকান্ত মিশ্রের কাছে। রুগীদের কুইনাইন খাইয়ে খাইয়ে তিনি নিম্বফলের মতো মুখ করে বসে থাকতেন ডাক্তারখানায়। আমাকে দেখে বোধহয় বিনে পয়সার রুগী বা ভিখিরি মনে করলেন। দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলেন : কে ?

—আমি ঈশ্বর মুকুন্দদাসের ছোট ছেলে।

—ও। কী চাই ?

—ভর্তি হবো। ফ্রি করে দিতে হবে।

—হবে ? তা লেখাপড়া কিছু করা হয় ?

আমি নিঃসঙ্কোচে প্রোগ্রেস রিপোর্টটি এগিয়ে দিলুম।

তিনি কাগজটায় চোখ বুলোলেন। তারপর আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। বোধহয় কাগজের লেখার সঙ্গে চেহারার রেখার কোনো মিল ছিলো না। আমি তিক্ততাকে তিতিক্ষা দিয়ে জয় করার জন্য দাঁড়িয়ে রইলুম।

এমন সময় একটি ম্যালেরিয়া রুগীর প্রবেশ।

—দাও কাগজটা।

আমি ম্যালেরিয়া রুগীর মতোই কাঁপতে কাঁপতে দলিলখানা এগিয়ে দিলুম। তিনি এক কোণে ইংরেজীতে লিখে দিলেন : অ্যাড্‌মিট। ফুল ফ্রিস্টুডেণ্টশীপ অন মেরিট গ্রাউণ্ড।

—মা বলছিলেন, রাঙাদা অব্জানন্দের মাইনেটা মাপ করে না দিলে ওঁর আর পড়া হবে না।

—তা সেই মহাপুরুষ কোথায় ?

—লজ্জায় আসেননি।

—পাশ করেছেন ?

—পাশ করেছেন। কিন্তু খুব ভালো নম্বর পাননি।

প্রেসক্রিপসান লেখার কাগজ টেনে নিলেন রতিকান্ত মিশ্র। খস্‌খস্‌ করে লিখলেন : হাফ ফ্রিস্টুডেণ্টশীপ অন পভার্টি গ্রাউণ্ড।

—বৌঠানকে গিয়ে বোলো, মুকুন্দদার কথা মনে রেখে করে দিলুম। সামনের বছর থেকে হবে না। একাজগুলো এখন থেকে হেডমাস্টার করবেন। যাও।

এর পর আট বছর বড়ো ইস্কুলে পড়েছি। ফি-বছর ওঁর কাছে একবার গিয়ে দাঁড়িয়েছি। মুখ দেখে মনে হতো, এক্ষুনি খুন করবেন। কিন্তু আশ্চর্য, একই কথা লিখে দিয়েছেন বারবার। শেষ দু'বছর সেক্রেটারি ছিলেন কামদানন্দ রায়। ওঁর আমলেও মাইনে দিতে হয়নি রেজাল্‌টের জোরে। ততদিনে রাঙাদা ম্যাট্রিক পাশ করে গেছেন।

মা'র বরাবরই শেষ ভরসা ছিলো সুপুরি। এবারও বেচেই কিনে দিলেন একটা সার্ট, প্যাণ্ট, এক দিস্তা কাগজ ও একটা ডবল এইচ বি পেন্সিল। সরস্বতী এলেন আমার জীবনে এই ভাবে ভিখিরিকন্যার মতো। তবু ম্যাট্রিক অবধি পাদুকাবিহীন পদযুগল ইস্কুলের দিকে চালাতে চালাতে তাঁকে বরাবর মা বলেই ডেকেছি। খালিপদদের কি মা নেই ? কখনো রেগে গিয়ে ভেবেছি, যারা 'জুতো জুতো' করে তাদের জুতিয়ে ঠাণ্ডা করবো একদিন। মজার কথা, আমি নিজেও এখন জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটি।

এর পরের বিদ্যাচর্চার ইতিহাস স্কুলপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের মতোই একঘেয়ে কথার পুনরাবৃত্তি। থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। লম্বা একটানা টিনের ঘরের একেকটা ঘর পার হয়েছি আর ভেবেছি, মাগো আর কতদূর! সবশেষে যখন ম্যাট্রিক ক্লাশে কোঠাবাড়িতে প্রবেশাধিকার পেলুম তখন দেহমনে একটা পরিবর্তন অনুভব করলুম। আজকালকার ভাষায় কেমন যেন একটা মস্তান-মস্তান ভাব! ঠিক ফাইন্যালের আগে বহুকালের রীতি অনুযায়ী দু'মণ বাতাসা দিয়ে হরির লুট দেওয়া হলো – তখন বিদায়ের সুর বেজে উঠলো মনে। শেষ বারের মতো বিদ্যাদায়িনী মানস-সরস-বাসিনীকে বলতে ইচ্ছে করলো, জননী গুণ্ঠন খোলো দেখি তব মুখ।

পাঠক, কোনো এক তুচ্ছ আকন্দদাসের জ্ঞানান্বেষণে আপনার কৌতূহল না থাকাই স্বাভাবিক। যদি সে ইস্কুল-পালানো ছেলে হতো ও বড়ো কবি হতো তবে আপনার ঔৎসুক্যের হুতাশন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতো। কিন্তু অকিঞ্চন আকন্দ ইস্কুল থেকে পালায়নি, বড়ো কবিও হয়নি। তাই তার একরঙা বৃত্তান্ত নিয়ে বিদ্যাসম্ভব কাব্য রচনা করবো না। গেজেট যখন বেরোলো তখন দেখা গেলো আকন্দদাসের ঘাটতি বাজেট না হলেও উঠতি বাজেট নয় – একমাত্র সংস্কৃতে সে অশীতিপর বৃদ্ধ, আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক অঙ্কে বাহাত্তুরে বুড়ো। ইংরেজী বেজীর মতোই জেদী – ঘাটের কোঠা মাত্র পার হলো। তবে পঞ্চাশোর্ধে বনে পাঠালো বাংলা। ইতিহাস হাসায়নি, ভূগোলে গোল হয়েছে ভালোই। কিন্তু মাস্টারমশাইরা বিষণ্ণ। তাঁরা ভেবেছিলেন পরীক্ষাক্ষেত্রটি আরো সুফলা হবে।

তবে আমার পাঁজরের জোর এলো কোথা থেকে ?

নাইন থেকে টেনে ওঠার প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেখে সেজদা মকরন্দ বললেন : একেবারে ফার্স্ট ! বাঁশবনে শেয়ালরাজা। কলকাতার মিত্র স্কুলে পড়লে তোমার কনিষ্ঠ পুত্র বোধহয় লাস্ট হতো, মা।

আমি ফোঁস করে উঠলুম : ভালো স্কুলে পড়লে রেজাল্ট আরো ভালো হতেও পারতো। কম্পিটিশান থাকলে রেজাল্ট খারাপ হয় না। আর শেয়াল রাজার কথা বলছেন ? খড়ো মাঠে খেলতে খেলতেই মোনা দত্ত একদিন মোহন-বাগানের খেলোয়াড় হয়েছিলেন।

আজ সেজদা নেই। সমস্ত মৌচাকটাকে খালি করে দিয়ে মকরন্দ চিরদিনের জন্য চলে গেছেন। কী আছে আমার ? রূপ নেই, গুণ নেই, বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই। সংসারে আছি শুধু বিশ্বাসের জোরে। মনে আছে সেজদা সেদিন আমার কথা শুনে বলেছিলেন : যদি ভবিষ্যতে কিছু পারিস্ তবে তা করতে পারবি এই আত্মবিশ্বাসের জোরে। আমি জানি তিনি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তার কথাই বোধহয় আমাকে আজো বাঁচিয়ে রেখেছে।

অনেক কথাই তো বললুম। এবার দু'একটা পাপের কথা বলি।

তখন বোধহয় দরিয়া আদ্দেক পার হয়েছি, আছি টিনের ঘরের মাঝামাঝি জায়গায়। বাড়িতে দোয়াত-কলমে হোম টাস্ক করি। কিন্তু স্কুলে গিয়েতো আর সান্-বাস্ক করা যায় না! সেদিন কাগজ ছিলো, পেন্সিল ছিলো না। বর্ষারম্ভে এইচ এইচ বি-র যে দক্ষিণা পেয়েছিলুম তা খরচ হতে হতে প্রায় উবে গেছে। তার অবশিষ্টাংশ দিয়ে এমন কি ভগ্নাংশও করা যায় না। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলুম, তাঁর ঝুলিতে ঘষা পয়সাও নেই। অতএব কী করি ? নিধিরাম সর্দার হয়ে যদি ক্লাশে যাই তবে অঙ্কের ঘণ্টায় গিরিধরবাবু গিরিগোবর্ধন হয়ে তুলে আছাড় মারবেন। সীতানাথবাবু বানরের ল্যাজে বেঁধে লঙ্কায় পাঠিয়ে দেবেন। গোলপণ্ডিত সোরগোল তুলে

পাণ্ডবদের সঙ্গে বনবাসে পাঠাবেন। তাই গেলুম প্রীতীশের কাছে। ও বাড়িতে নেই, বাজারে গেছে। দেখলুম ওর টেবিলে পড়ে আছে তিনটে আস্ত পেন্সিল। একটা তুলে নিয়ে ভাবলুম, প্রীতীশকে বলবো, একটা আমি নিয়েছি। ওর সাদা মন, ও আর যা-ই বুঝুক, জিলিপির প্যাঁচ বোঝে না।

চান্ করে স্কুলে যাচ্ছি। হঠাৎ শুরু হলো চৌধুরীকাকার হুংকারধ্বনি ও খড়মপিটুনি। মা হতভম্ব, আমি স্তম্ভিত। একটা কথা বার বার কানে এলো : চোর! চোর! চোর!

পাঠক, জুতোপেটা কাকে বলে আপনারা হয়তো জানেন। কিন্তু খড়মপেটা? ওটা খেলে মনে হয়, মরে গেলেই তো চুকে যায় সব ল্যাঠা।

একসময় বোধহয় চৌধুরীকাকা প্রচণ্ড পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। একপাটি খড়ম সশব্দে দূরে ফেলে দিয়ে বললেন : প্রীতীশের পেন্সিল চুরি করেছিস্?

—নিয়েছি। চুরি করিনি।

—না বলে নিলে ওকে কী বলে, তোর লম্বু মহারাজকে জিজ্ঞেস করিস্? তুই হারামজাদা তো হয়েছিস্ ওঁর সাঙ্গাত।

পিঠে জ্বালা নিয়ে মনে ভাবলুম, না আমার বাবা মুকুন্দদাস হারাম ছিলেন না। তিনি শুধু ছিলেন গরিব। হারাম যদি কিছু থেকে থাকে, সে হচ্ছে আরাম।

অবাল্য আমার আতুরতা ত্রিভঙ্গমুরারির মতোই ত্রিধাবিভক্ত—আমি সময়ে অসময়ে জ্বরাতুর, রাগাতুর ও চিন্তাতুর। বছরে ক'বার জ্বরে পড়তুম গুণে রাখতে পারতুম না। রাগলে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকতো না। আর চিন্তার পোকাগুলি যখন-তখন মাথায় কিলবিল করতো। সেদিন পিষ্ট পিঠ নিয়ে বিদ্যালয়-যাত্রায় আমার ভাবনঘরে একটি মাত্র হাওয়ার ঘূর্ণিপাক : চুরি কাকে বলে? তবে সেদিন প্রীতীশ যে আমার ডাঁশা পেয়ারাটা না বলে খেয়ে নিলো, তবে তাও কি চুরির মধ্যে পড়ে?

পিঠের জ্বালা ও রাগের পালা কমে আসার পর বুঝলুম : কাজটা ভালো করিনি। যে গরিব চুরি করে সেও করে পেটের তাগিদে। পড়ার তাগিদে নিলেও পেন্সিলটা আমি চুরিই করেছিলুম। স্মরণ হলো নীতিবাক্য—না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়।

দূর থেকে চৌধুরীকাকাকে প্রণাম জানালুম।

আজ অবশ্য আমার বনে যাওয়ার বয়স। তবে তার বোধহয় আর দরকার নেই। মানুষের জঙ্গলে অনেকদিন বাস করে দেখলুম—চোর আমরা সবাই। কেউ বড়ো চোর, কেউ ছোট চোর। একজন জানা চোর, আরেকজন অজানা চোর। বেসরকারি ব্যবসার খাতা ও সরকারি লটারির পাতা ওল্টালেই তার কিছু নজির পাওয়া যাবে।

আমার দ্বিতীয়া পাপবধূ আরো রাগাত্মিকা প্রাণঘাতিকা।

সহপাঠী শশাঙ্ক কর সরস্বতীর কর ঠিকমতো দিতে পারতো না। পরীক্ষার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে নামতে এবং আমরা ধাপে ধাপে ওপরে উঠতে উঠতে যখন ক্লাস এইটের ল্যাণ্ডিংএ একত্র হলুম তখন শশাঙ্ক শ্মশ্রু-গুম্ফশোভিত যুবাপুরুষ। শারীরিক ও জাগতিক ব্যাপারে সে ততদিনে ঊর্ধ্বতন পিপ্পলবৃক্ষে সমারূঢ়। কিন্তু পরীক্ষা-বৈতরণী উত্তরণের কায়দাটা সে মোটেই রপ্ত করতে পারতো না। ক্লাশে লিখতে হলে তার কনুইয়ের হূলে সকলকেই কণ্টকিত হতে হতো। একদিন সে সংস্কৃতের ক্লাশে বললো: দেবনাগরী হরফটা পড়তে পারছি না। বল্‌তো, আজকের ব্যাখ্যাটা কোন্ গল্প থেকে দেওয়া হয়েছে।

—বিরক্ত করিস্ না। লিখতে দে।

—আচ্ছা, দেখে নেবো।

মাস ছয়েক পরে অ্যানুয়েল পরীক্ষা। হলে গিয়ে দেখি, শশাঙ্ক বসেছে আমার ঠিক পাশে। ও ভালো ছেলের মতো পরীক্ষা দিলো। আমার খাতার সঙ্গে লুজ সীট সেলাই করার সময় সাহায্য করলো পিয়নকে।

রেজাল্ট বেরোবার ঠিক আগের দিন আমার ডাক পড়লো স্টাফ রুমে। জহিরুল সাহেব আমার বাংলা খাতাটার পাতা উল্টে এক জায়গায় থামলেন। বললেন: এই হাতের লেখাটা তোমার?

এক নজর দেখে নিয়ে বললুম: হ্যাঁ।

তিনি আবার পেছনের দিকের পাতা উল্টে দেখালেন: এই হাতের লেখাগুলি তোমার?

—হ্যাঁ।

—তাহলে হাতের লেখা দু'রকমে হলো কি করে? সব উত্তর তাড়াতাড়ি লেখা, একটা ধীরে সুস্থে লেখা। কালিও ঠিক এক রকমের নয়। তবে কি শেষের উত্তরটা বাড়ি থেকে লিখে এনে খাতার সঙ্গে স্টিচ্ করে দিয়েছো?

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম: খাতাটা একবার দিন্ স্যার।

কিন্তু ভালো করে দেখেও কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলুম না। এমন সময়ে পেছনে লাঠির বাড়ি। হেডমাস্টার বগলাচরণ মজুমদার।

মাথায় হাত দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলুম: ছেলেটা ছিলো বেশ ভালো। শশাঙ্কের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় গেছে।

হঠাৎ আমার কী মনে পড়ে গেলো! পরীক্ষার সময় শশাঙ্ক আমার ঠিক পাশেই বসেছিলো। এর পেছনে তার কোনো কারসাজি নেই তো?

উপেন দাসের বাড়ির পাশ দিয়ে ফিরছি। সহপাঠী কাদেরের সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখে আঁতকে উঠলো: আকন্দ, তোর হাতে মাথায় রক্ত কেন রে?

—হেড স্যার মেরেছেন।

—কেন?

—নকল করেছি বলে?

—নকল করেছিস্? তুই?

ব্যাপারটা খুলে বললুম।

শুনে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো কাদের। আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো: তুই আমার গুনাহ্ রেয়াত করিস্, আকন্দ!

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম।

—তোর মনে নেই। মাস ছয়েক আগে আমিই তোকে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধের সারমর্ম লিখে দিতে বলেছিলুম। তুই লিখে দিয়েছিলি। কিন্তু শশাঙ্ক যে এমন কাণ্ড করবে ভাবতে পারিনি।

—শশাঙ্ক?

—হ্যাঁ। তুই লিখে দিয়েছিস্ শুনে বললো, জানিস্ তো কাদের, গেলো বছর ফেল করেছি। ওটা আমাকে দে, টুকে নিয়েই তোকে ফেরত দেবো।

—ফেরত দিয়েছিলো?

—হ্যাঁ। তবে তোর হাতে-লেখা কপিটা নয়, ওর নকল-করা কপিটা। মনে হয়, তোর এই শাস্তির পেছনে আছে শশাঙ্কের চক্রান্ত।

আমি আর দাঁড়ালুম না। সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। মনে পড়ছে, পরীক্ষার সময় শশাঙ্কের পাশে বসা। খাতা স্টিচ্ করার সময় ওর সাহায্য করা। দেবনাগরী হরফ যে শশাঙ্কের রূপ ধরে আমার গায়ে কলঙ্ক লেপে দেবে তা আমার বুদ্ধিসুদ্ধির বাইরে ছিলো।

পাঠক, আপনি কী ভাবছেন জানি না। কিন্তু সেদিন আমি কী ভেবেছিলুম বলতে পারি। দোষ স্পষ্টতই শশাঙ্কর। কিন্তু আমি কি ছিলুম একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা? কী এমন পয়লা নম্বরী ছেলে আমি? কাদেরকে বুঝিয়ে দিলেই পারতুম, লিখতে গেলুম কেন? তাও আবার ফুলস্ক্যাপ সাইজ কাগজে! সেইজন্যই তো অমোঘ কবিবাক্য শোনা গেছে—শতং বদ, মা লিখ। আজ অবশ্য আমাদের সংবিধানের মতো বাক্যটি সংশোধন-সাপেক্ষ বলে আমি মনে করি—মা বদ, মা লিখ। অর্থাৎ বোবা ও কালা হয়ে সংসারে থাকো। তবেই শান্তি পাবে।

এবার দফে দফে পঠদ্দশার হিসেব কষি। রোজকার ভোজ আখরোট দিয়ে হতো এমন কথা বলবো না। ইতিহাসের পাঠ ছিলো, দাসবংশের কুলজি মুখস্থ করতে হতো। বারবার গুলিয়ে যেতো আর ঘোড়ার বাচ্চা গরুর পালে ঢুকে পড়তো। রাগ করে ভাবতুম, আমার ঠাকুর্দা যে ফলস্ কুলজিটা ছাপিয়েছিলেন তাতে সিংহসদৃশ কাশীদাসকে মানসিংহের সঙ্গে কেন জুড়ে দিলেন? দাসবংশের সংগে জুড়ে দিলে তাঁর সুযোগ্য পৌত্র আকন্দদাসের সব ল্যাঠা

ঢুকে যেতো! মুখস্থের অস্বাস্থ্যে না ভুগে তখন সে আত্মগৌরবী ভৈরবী শুনতে আনন্দ পেতো। যাঁর দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেতো, হিন্দু-মুসলমানকে এক জোয়ালে বেঁধে দিতে তিনি এত ভয় পেলেন কেন?

একদিন ইতিহাসের পাতায় চোখ বোলাচ্ছি, সহপাঠী বীরেশ্বর এসে বললো : কী পড়ছিস্?

—ইতিহাস।

—ওটা বি এ.-তে পড়িস্। এখন ছেড়ে দে।

—কেন?

—দ্যাখ্, ম্যাট্রিকে আকবরের বাবা যিনি. বি এ-তে তিনিই আকবরের বাবা।

বলে জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ হিসেবে দুটো বই আমার সামনে খুলে ধরলো। দুটো বই-ই ভারতবর্ষের ইতিহাস। হুবহু একই বই, শুধু কভার দুটো আলাদা। একটার ওপরে লেখা ম্যাট্রিক কোর্সের জন্য, অন্যটার ওপরে ডিগ্রি কোর্সের জন্য। আমি তাজ্জব বনে গেলুম। কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র নই আমি।

বললুম : তুই যখন ক্লাস ফাইভে পড়তিস্ তখন তোর বাবার নাম ছিলো হরনাথ বর্ধন। এখন টেন-এ পড়ছিস্। তোর বাবার নাম কি বদলে গেছে?

বীরেশ্বর ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো। কী উত্তর দেবে ভেবে পেলো না। আমার দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হেনে সরে পড়লো।

অঙ্কের ক্লাশ।

ওটা ছিলো সকলের কাছে ভূলুণ্ঠিত হওয়ার ঘণ্টা। গিরিধর সাহা ছিলেন পাকাপোক্ত শিক্ষক। কোন্ অঙ্কে কে ধরাশায়ী হবে তা ছিলো তাঁর নখদর্পণে। লসাগু গসাগুতে সন্তোষের ডেঙ্গু জ্বর, জ্যামিতির প্রতিপাদ্যতে নিরাময়ের আমাশয়, ফ্যাক্টর-এ প্রীতীশের আলসার, ঐকিকে অমিতের স্নায়বিক পীড়া এবং একস্ট্রাতে আমার হিস্টিরিয়ার কথা জানতেন তিনি। এমনিতে ছিলেন ভালোমানুষ, কিন্তু অনৈষ্ঠিক কর্ম দেখলে তিনি রোগ অনুযায়ী ব্যবস্থা করতেন। ফলে গিরিধর সাহা ছিলেন শাস্তিধর চুহা। কিন্তু তাঁর ওষুধ প্রয়োগ যতই জেল্লা ধরানো হোক্ না কেন তিনি অঙ্ক গিলিয়েছিলেন বেশ কড়াপাকের।

একদিনের কথা। গিরিধরবাবু ক্লাশে আসতেই অনেকেই বলে উঠলো : স্যার, ফাইনালের আর বেশি দেরি নেই। কি করলে, অঙ্কটা ঠিক কব্জা করতে পারবো?

গিরিধরবাবু বললেন : সত্যিই জান্তে চাস্?

—হ্যাঁ, স্যার।

—তবে শোন্, ল্যামের একটা গল্প। এক চীনা ছেলে আগুন নিয়ে

খেলতো। একদিন আগুনের ফুলকি উড়ে গিয়ে তাদের খড়ের ঘর পুড়িয়ে ফেললো। আর সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে মরলো ন'টা শুয়োরের বাচ্চা। ছেলেটা বুঝলো একটা নতুন গন্ধ তার নাকে আসছে। পোড়া শুয়োরের গায়ে হাত দিতেই তার আঙুলে ছ্যাঁকা লাগলো। জ্বলুনি কমাতে ছেলেটি মুখে পুরে দিলো আঙুলটি। আঃ, কী মধুর নতুন স্বাদ! এর আগে চীনারা কাঁচা মাংস খেতো।

ছেলের কাছ থেকে শুনে তার বাবারও হলো একই অভিজ্ঞতা। পোড়া শুয়োর খেতে যে এত ভালো তা তার বাবাও জানতেন না। আর খোসমেজাজে সেদ্ধ মাংস খাওয়ার লোভে তাদের বাড়ি পুড়তে লাগলো ঘন ঘন। এর ফলে তারা হলো শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার। বিচারক সুবিচার করতে গিয়ে সেদ্ধ মাংসের আস্বাদ নিলেন এবং আসামীদের বিনা সর্তে দিলেন মুক্তি। এর পরে শুধু বিচারকের বাড়িই নয়, সহরের আরো বাড়িঘর পুড়তে লাগলো। সকলেরই এক লোভ—সেদ্ধ মাংস খাবে।

সব শেষে একজন জ্ঞানী ফতোয়া দিলেন-সেদ্ধ শুয়োরের মাংস খাওয়ার জন্য বাড়ি পোড়াবার দরকার নেই। লোহার জালের উনুনেই মাংস ঝলসে নেওয়া যেতে পারে। এই হচ্ছে উনুনের জন্মকথা।

এই বলে তিনি আমাদের দিকে পেছন ফিরে বোর্ডে অঙ্ক কষতে লাগলেন।

আমরা গল্পের মর‍্যালটা ঠিক ধরতে পারলুম না। ফিস্‌ফিস্ করে একে অন্যকে জিজ্ঞেস করছিলুম। তিনি বুঝতে পারলেন আমরা ধাঁধায় পড়ে গিয়েছি। তাই চক্ হাতে আবার আমাদের দিকে ফিরলেন। বললেন: সব গল্পেরই মর‍্যাল থাকবে এমন কোনো কথা নেই। তবে ল্যাম বোধহয় বলতে চেয়েছিলেন-রান্নার উন্নততর সভ্যতার সন্ধান আকস্মিক, তবে উনুনের আবিষ্কার হয়েছে আকস্মিককে বুদ্ধিসিদ্ধ করার চেষ্টা থেকে। আমি বলি কি, যদি অঙ্কের সেদ্ধ মাংস খাওয়ার লোভ তোদের থাকে তবে বুদ্ধির উনুন তোদের মধ্যে একদিন-না-একদিন জ্বলবেই।

অন্যের কথা বলতে পারবো না, এর পর থেকে বুদ্ধি খাটিয়ে একস্ট্রার সমাধান করতে লাগলুম। বিষয়টা আগের মতো আর তত কঠিন বলে মনে হয়নি।

পঠ পুত্র ব্যাকরণম্।

নির্দেশটা ফলো করা যত সহজ, তার চেয়ে ফার্লো নেওয়া বেশি সহজ। এক ণত্ব ও ষত্ব বিধি মনুষ্যত্ব নামক পরম নিধিটি বিধ্বস্ত করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সব মিলিয়ে এগারো দফার সঙ্গে রফা করা আর বাসের ছাদে বসে গরফা যাওয়া একই কথা। ধরুন দুর্নীতি। এই সমাসে 'র' থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পদে 'ন'-ই হবে, 'ণ' হবে না। বেশ। কিন্তু শূর্পণখা? এতে ব্যাপার একই, অথচ

'ণ'-ই হবে, 'ন' হবে না। এর পেছনে গায়ের জোরের যুক্তি ছাড়া আর কিছু যুক্তি আছে? না কি শূর্পণখার ভয়ে এই কন্‌সেসান? অবশ্য দুর্নীতিকে কন্‌সেসান দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। কারণ ওটা আমাদের ধাতস্থ হয়ে গেছে।

ফলে বাংলার মাস্টার কামিনী পণ্ডিতের ক্লাশে বেত চলতো সপাসপ্।

শান্তিরঞ্জন একদিন মরিয়া হয়ে বলে উঠলো: স্যার, বানান শুদ্ধ না হলে ক্ষতি কি? বুঝলেই হলো। আপনার নাম শ্রীকামিনীকুমার চক্রবর্তী না লিখে যদি শ্রি কামিনিকুমার চক্রবর্তি লেখা হয় তবে কি বোঝা যাবে না আপনার কথা বলা হচ্ছে?

কামিনীবাবু অনাবিল হাসি হাসলেন, বেত ওঠালেন না। আমরা অবাক হলুম। কারণ বাংলার মাস্টারের হাসি ও পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দুটোই ছিলো বিরল বস্তু। তিনি কাউকে তোয়াক্কা করতেন না।

বললেন: ক্ষতি আছে। শুনবি?

—হ্যাঁ, স্যার।

—ধর একটা শ্লোকের এক ছত্র। স্বজনঃ শ্বজনো মা ভূৎ সকলং শকলং সকৃচ্ছকৃৎ। এখানে 'স্ব' মানে আপন, 'শ্ব' মানে কুকুর, 'সকল' মানে 'সমস্ত' শকল মানে 'অংশ', 'সকৃৎ' মানে 'একবার', 'শকৃৎ' মানে 'বিষ্ঠা.'। এখন তোরাই বল্ স্ব, সকল, সকৃৎ এর বদলে শ্ব, শকল, শকৃৎ লিখলে কি ক্ষতি হয়?

আমরা একেবারে থ বনে গেলুম।

শান্তি তখনো নাছোড়বান্দা। বললো: এখানে না হয় মানলুম। কিন্তু নামের ক্ষেত্রে? মেয়ের নাম হয় সবিতা, অথচ আপনিই বলেছেন শব্দটি পুংলিঙ্গ।

—ভুল রাখা হয়।

—অঞ্জলীর কি হবে, স্যার। অঞ্জলি লিখলে লোকে ভাববে মেয়ে নিজের নাম ঠিক মতো লিখতে পারেনি।

—আমার ক্ষমতা থাকলে অঞ্জলী কেটে অঞ্জলি করে দিতুম।

—স্যার, নামের বানানে কিছু যায় আসে না। উইলিয়াম শেক্সপীয়ার নামের লিখিত বা উচ্চারিত রূপ কী? বঙ্কিমের লেখায় শেক্ষপীর পড়েছি।

—ওটা ঠিক জানি না। হেড স্যারকে জিজ্ঞেস করিস্। আমার ধারণা, ইংরেজী অনেক নামের কোনো অর্থ নেই। তবে কোনো মহিলার নাম যদি হয় সোফিয়া গ্রেস তবে হয়তো দিব্যজ্ঞানী দয়াকে খুঁজে পাবি।

—স্যার বাংলা নাম?

—বাংলা নামের অর্থ আছে। ধর দেবদত্ত বসু। দেব=দেবতা, দত্ত= দেওয়া, বসু=ধন। অর্থাৎ দেবতার দেওয়া ধন। শুদ্ধ বানানে ঠিক ঠিক লিখলে প্রত্যেকটি নামের অর্থ পাওয়া যাবে।

—স্যার, মুসলমান নামেরও কি অর্থ আছে ?

—মৌলবী সাহেবকে শুধিয়ে নিস্। আমি যতটা জানি, বলছি। নুরজাহান—নুর মানে আলো, জাহান মানে জগৎ। অর্থাৎ জগতের আলো। হিম্মত আলী—অবাধ সাহস। আকবরউদ্দিন—মহত্তমের প্রকাশ।

এই কামিনী চক্রবর্তীর কাছেই বাংলা শিখেছিলুম। তিনি যত্ন করে সব শেখাতেন। বলতেন, ব্যাকরণের সূত্র যদি নাও জানিস্, চোখ দুটোকে তৈরি করে রাখিস্। পড়ার সময় প্রত্যেকটি শব্দের চেহারার ওপর নজর রাখ্‌বি। ভুল হলে নিজের চোখেই ধরা পড়বে। বলতেন, 'সবিশেষ সংবাদ' লিখ্‌বি না—লিখ্‌বি 'আসল খবর'. 'জনারণ্য' লিখবি না—লিখ্‌বি 'মানুষের জঙ্গল'। তা হলে 'ন ণ' 'শ ষ স'-এর গোলমালে বেশি পড়তে হবে না। ভুল কম হবে। তাঁর প্রত্যেকটি উপদেশ মনে রেখে উপকার পেয়েছি অনেক।

কোনো এক শরীর খারাপের দিনে তিনি পড়ালেন না। বাংলা বানান লিখতে দিলেন গোটা পঞ্চাশেক। কিন্তু দুরদৃষ্ট আমার, একটা বানান ভুল হয়ে গেলো! বিদ্যাসাগর রসিক মানুষ ছিলেন, কোনো এক ভদ্রলোকের 'দুরাবস্থা' তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 'আ-কার' দেখেই। কিন্তু আমার 'ব্যাভিচারের' পরিমাণ 'আ-কার' দেখে মাস্টার মশাই শুধু অনুধাবন করলেন না, তা সংশোধনের পদ্ধতিটি সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করলেন। বেত নয়, চিমটি। হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে পেটের নরম চামড়া ঘষে ঘষে তুলে ফেললেন। বিশ বেতের ঘা তার চেয়ে কম কষ্টকর ছিলো। তিনি সেদিন নিজস্ব 'দাওয়াইটি' এমন মর্মান্তিকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন যে, তার ঘা শুকোতে মাসখানেক সময় লেগেছিলো। তারপর থেকে আমি বাবা নামের বানান ভুল করতে পারি, কিন্তু 'ব্যভিচার' বানান ভুল করিনি। শব্দটি লিখতে গেলেই আমার পেটের দিকে চোখ পড়ে। এরই নাম মূল চিকিৎসা!

কিন্তু আমার বাংলা বিদ্যাচর্চার সিদ্ধাচার্য কামিনী পণ্ডিতের নিজের ব্যভিচারের সাক্ষী আমি। তিনি বানানে তুখোড় হতে পারেন, কিন্তু চৌর্য-বিদ্যায় ছিলেন ভুঁইফোঁড়। তা না হলে হাটের মধ্যে ধরা পড়ে পাইকারী হারে বকুনি খাবেন কেন? এ-সংসারে কে না চৌরপঞ্চাশিকার রচয়িতা—অথচ দিব্যি বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সবাই। ইনাম ইজারা দিয়ে এমন কি বাড়তি দু'পয়সা কামিয়েও নিচ্ছেন। অথচ সেদিন বেগুনে আগুন লেগে কামিনী চক্রবর্তীর পাণ্ডিত্যের স্বোপার্জিত সম্পত্তিটুকুও নষ্ট হয়ে গেলো।

ব্যাপারটা খুলে বলি। মা বললেন, আজ হাট বার, একবার বাজারে যা দেখি। কিছু মাছ তরিতরকারি কিনে অন্‌বি।

উরুভঙ্গের পর দুর্যোধনের মুখের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে

গিয়েছিলো। মা'র কথা শুনে আমার মুখের অবস্থা তার চেয়ে সুদৃশ্য ছিলো না। আমি একরাশ নিমপাতা মুখে পুরে বসে রইলুম খানিকক্ষণ। কোনো যাদুমন্ত্রবলে যদি পরশুরামের সঙ্গে তখন দেখা হতো, তবে নিশ্চয়ই তাঁকে বলতুম : জেণ্টলম্যান, আপনার কুঠারটা একবার ধার দিন তো। কাজটা সেরেই অস্ত্রটা আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো। কিন্তু ভদ্রলোকের ঠিকানা জানি না. অতএব বাজা র যেতেই হলো।

অথচ আমার তখন মরণদশা। কামিনী পণ্ডিত দৃষ্টান্তসহ ভাবসম্প্রসারণ করতে দিয়েছেন তিনটি বাছা বাছা নীতিবাক্য - সদা সত্য কথা বলিও, না বলিলে দণ্ড পাইবে ; বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে ; অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে। ফলে আমার সেদিন কাছা খুলে যাওয়ার অবস্থা। কামিনীবাবু কোনো ওজর আপত্তি শোনবেন না। চিমটি যদি নাও কাটেন, খামচি দেবেনই। অথচ আমাকে যেতে হচ্ছে লাউডগা, মরিচের ভাগা, কাঁচকলা আর ভোলা মাছের সন্ধানে। এর চেয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে ঘুরতে যাওয়াও ভালো ছিলো।

আধঘণ্টার মধ্যে বাজার শেষ। শুধু কচি লম্বা বেগুন বাকি। ওই অখাদ্যটি আমার মা জননীর প্রিয় খাদ্য। বেগুনের দিকটায় ঢুকতে গিয়ে শুনি, প্রচণ্ড হৈ চৈ। বচসা। যে হেটো ব্যাপারী আলু-বেগুনের কারবারী সে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন কামিনী পণ্ডিতকে। বলছে : রোজ রোজ ধারে নেবেন। দুটো সিকি পাবো। আজ একেবারে চুরি! যান্ যান্, মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে ডাকাতি ধরুন।

বলে মাস্টার মশাইয়ের কোঁচড় ধরে টান। ধুতির খুঁটটা খুলে গিয়ে ঝুর্‌ঝুর্ করে পড়ে গেলো আধসের খানেক বেগুন।

আমি নিঃশব্দে সরে এলুম। পাকা বড়ো পুলের কাছে এসেছি, বন্ধু যতীন সাহার সঙ্গে দেখা। গল্প করছি, এমন সময় দেখলুম মাথা নিচু করে যাচ্ছেন কামিনী পণ্ডিত। আমাকে দেখে বললেন : এই আকন্দ, শোন্ !

এগিয়ে গেলুম।

—তোর 'ব্যাভিচারের' আ-কার দেখেছি। আমার ব্যভিচারের আকার তুই দেখিস্‌নি। ওর পরিমাণ দু'সিকি নয়. ওর পরিমাণ অনেক অনেক সিকি। বাজারের ওই দিকটায় যাওয়ার কোনো উপায় নেই। মাসে কুড়ি টাকায় আর চলছে না রে! ওতে ছাগলেরও পেট ভরে না।

বলে হন্‌হন্ করে চলে গেলেন।

আমি বাড়ি ফিরে এলুম। হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসলুম। ভাবসম্প্রসারণ করতে গিয়ে শুধু একটা কমা সরিয়ে দিলুম - সদা সত্য কথা বলিও না, বলিলে দণ্ড পাইবে।

ভূগোলক দেখে যারা ভূগোল পড়েন তারা তালেবর পড়ুয়া। আমাদের

ইস্কুলের ইজ্জত ছিলো, কিন্তু গ্লোব ঘুরিয়ে ভূগোল পড়ানোর হুজ্জত এড়িয়ে চলতেন বসিরউদ্দিন সাহেব। বোধহয় লর্ড ক্লাইভের আমলের খান চারেক মানচিত্র ছিলো, কিন্তু তাদের কোনো মানমর্যাদা ছিলো না। মনে হয় ওগুলি ছিলো ইন্‌স্‌পেকসানের সময়ের শো-পীস্‌। সুতরাং বাবুরবাজারের ভূগোলের মধ্যে থেকেই আমাদের পড়তে হয়েছিলো পৃথিবীর ভূগোল—যেন বিষয়টা দ্রষ্টব্য নয়, শুধু স্মর্তব্য। তাছাড়া বলারই বা কী আছে ভূগোলের মাস্টার বসিরউদ্দিন আহ্‌মেদ বি. এ, বি টি, এফ. আর. জি এস. (লণ্ডন)। যেলো অব দি রয়্যাল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটিকে ফলো করতে না পারা ছোটখাটো অপরাধ নয়—একেবারে হিমালয়ান ব্লাণ্ডার!

আজও মনে পড়ে কত কি জেনেছিলুম স্কুলে থাকতে। কর্কটক্রান্তি বৃত্ত থেকে মকরক্রান্তিবৃত্ত, সমভূমি থেকে মালভূমি, সমবর্ষণ-রেখা থেকে সমোষ্ণ-রেখা, ব দ্বীপ থেকে উপদ্বীপ, পলিজ থেকে খনিজ ইত্যাদি নানা জাতের নানা আকারের জ্ঞানকাণ্ডে আমাদের অধিকার পরীক্ষা করতে গিয়ে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে আনতেন বসির সাহেব। উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের শিরায় কখনো বইতো উষ্ণপ্রবাহ, কখনো হিমপ্রবাহ। হিমশৈলের সঙ্গে হিমমুকুটের ভেদ টানতে গিয়ে আমাদের ভেদবমি হওয়ার উপক্রম হতো। যেদিন বসির সাহেব পানামা ক্যানাল কাটার রোমহর্ষক বিবরণ দিলেন সেদিন মনে হলো, আমারও হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হতে আর দেরি নেই। কী দরকার ছিলো মগজে খাল কেটে কুমীর আনার! আহা, ঈশ্বর যদি সেখানে অনেকগুলি লক্‌গেট বসিয়ে দিতেন, কী ভালোই না হতো!

শুক্রবার। নমাজের পরের পিরিয়ড ভূগোলের ক্লাশ। বসির সাহেব এসেই বললেন : আজকের পাঠ্যবিষয় খগোল। ছেলেরা ভূগোল শুনেছে, গণ্ডগোল শুনেছে, শোরগোল শুনেছে। কিন্তু খগোল? কখনোই নয়। মাস্টারমশাই সন্তোষকে পাকড়াও করলেন : বলতো খগোল কাকে বলে?

সন্তোষদের পরিবার বৈষ্ণব। বাল্যকাল থেকে খোল কথাটা শুনে এসেছে। সে ভাবলো খোলের বৃহত্তম সংস্করণ খগোল। সে বললো : স্যার, বড়ো আকারের খোল।

—স্ট্যাণ্ড আপ অন্‌ দি বেঞ্চ।

এবার নিরাময়ের পালা। সে বললো : জানি না, স্যার।

বসির সাহেব তাকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করালেন না।

একে একে জন তিনেক বেঞ্চের ওপর দণ্ডায়মান হলো। অকপট স্বীকারোক্তি যারা করলো একমাত্র তাদেরই উপবিষ্ট থাকার অধিকার তিনি স্যাংশান করলেন। আমি পড়ে গিয়েছিলুম দণ্ডায়মান সদাপ্রসন্নর আড়ালে। বসির সাহেবের নজর পড়লো এবার আমার ওপর। বললেন : মহাপ্রভু আকন্দদাস কী বলেন?

—স্যার, খগোল মানে আকাশমণ্ডল।

—নিরাময়, সার্চ।

অর্থাৎ আমি ডিক্‌সিনারি দেখে বল্‌ছি কিনা তা-ই তদন্তের নির্দেশ।

—স্যার, আকন্দের কাছে অভিধান নেই। পুর্ণাঙ্গ তদন্তের পর নিরাময়ের প্রকাশ্য রিপোর্ট।

—তা শব্দটির অর্থ তুই জান্‌লি কি করে?

—স্যার, 'খ' মানে 'আকাশ' জানি। বাল্যশিক্ষা বা বর্ণপরিচয়েও মনে পড়ছে শব্দটি পড়েছি। তাই 'খ'-এর সূত্র ধরে আকাশমণ্ডল অর্থটি ধরে নিয়েছি। আবহাওয়ার কথা ভূগোলের মধ্যে পড়ে বলেই জানি।

বসির সাহেব উত্তর শুনে মনে হলো খুশি হলেন। দণ্ডায়মানেরা হলেন ক্রুদ্ধ। তাদের হাবভাব বলছে, এক মাঘে শীত যায় না।

আরেকদিন।

বসির সাহেব জিজ্ঞেস করলেন: কোন্ জলবায়ুতে গম হয়?

আমি ঠিক উত্তরটি জানতুম না। তাই নীতিবাক্য অনুসরণ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলুম। বললুম: নাতিশীতোষ্ণ।

মাস্টারমশাই হাসলেন।

আবার প্রশ্ন করলেন: আসানসোল কোথায় ও কিসের জন্য বিখ্যাত?

উত্তর দিলুম: বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা। এখানে প্রচুর পরিমাণে চা, কফি ও পাট উৎপন্ন হয়।

বসির সাহেবের মুখ তখন আগ্নেয়গিরির মতো। ঘূর্ণবায়ুর মতো চোখ ঘুরিয়ে বললেন: দু'কানে হাত দিয়ে বেঞ্চির ওপর উঠে দাঁড়া। ফার্স্ট বয় নয় তো, মরা কটাল! অপদার্থ কোথাকার!

যারা আগের দিন দাঁড়িয়ে ছিলো বেঞ্চির ওপর, তারা আজ মওকা পেয়েছে। কানের লতি ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলুম তাদের হাসি-মস্করা, টিটকারি। কিন্তু জন্ম-দরিদ্রকে হজম করতে হয় সবকিছুই। শুধু শ্রুতিধর হয়ে লেখা-পড়ায় নীলরতন ধর হওয়া যায় না। তার জন্য বই চাই, বই পড়া চাই। ম্যাট্রিকে হ্যাট্রিক করার মতো একটাও বই ছিলো না আমার।

ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখতুম বড়ো হয়ে প্রবালদ্বীপে যাবো রাজকন্যার খোঁজে। ভূগোলের ভূসংস্থানে তখনো প্রবালদ্বীপের খোঁজ পাইনি, রাজকন্যাতো দূরের কথা। শুধু পেয়েছি আমার মনের আকাশভরা মেঘ। দুঃখের ঘনত্ব অনুযায়ী তার স্তরবিন্যাস—কোথাও নিম্বো স্ট্রেটাস, কোথাও অল্‌টো স্ট্রেটাস, কোথাও বা সিরো স্ট্রেটাস।

এই তো আমার অকৈশোর নানা রঙের দিনগুলি। কিছু জানা, অনেক অজানার ইতিহাস। তবু এরই মধ্য দিয়ে মন আমার ধরতে চেয়েছে উত্তমাশা

অন্তরীপ, নায়েগ্রা জলপ্রপাত, অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী, আকস্মিক উল্কাপাত। সুখদুঃখের নানা আলোয় আলোকিত হয়েছে আমার চেতনা।

ম্যাট্রিকের শেষ ক্লাশ। লম্বু মহারাজ পড়তে বললেন যার যার খুশি-মতো একটা কবিতা। আমি পড়লুম :

"No check, no stay, this Streamlet fears ;
How merrily it goes !
'T will murmur on a thousand years,
And flow as now it flows.

And here, on this delightful day,
I cannot choose but think
How oft, a vigorous man, I lay
Beside this fountains brink.

My eyes are dim with childish tears,
My heart is idly stirred,
For the same sound is in my ears
Which is those days I heard.

Thus fares it still in our decay :
And yet the wiser mind
Mourns less for what age takes away
Than what it leaves behind.

● ●

আপনি নাচ জানেন ? উহুঁ, তাতে হবে না। আপনাকে নৌকোবাইচ জানতে হবে। যদি গান জানেন তবে স্টেনগান চালানো শিখে নিতে হবে। দার্শনিক হলে কমিক আর্ট রপ্ত করে নিতে হবে। ওস্তাদ খেলুড়ে যদি হয়ে থাকেন তবে মাঝে মাঝে বেলুড়ে গিয়ে সংস্কৃত শ্লোকসহযোগে যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা না

করলে আপনার পায়ের তলায় মাটি থাকবে না। আপনি রাজনীতি করেন? আপনার বকযন্ত্রে পঞ্চতন্ত্রের বাটালি ব্যবহার না করলে প্র্যাক্‌টিস হবে না। আর সংস্কৃতির বাটলই যদি রোজ নাড়াচাড়া করেন তবে আপনাকে সারিডনের খুন্তিটি সম্পর্কে আমরণ অবহিত থাকতে হবে।

হাল আমলের জীবনদর্শন হচ্ছে, কোনো বিষয়ে মাস্টার হতে হবে না, বিশগজী সবজান্তা হতে হবে। র'কফি ও চারমিনারে সমারূঢ় হয়ে কাফ্‌কার সঙ্গে ডব্‌কা ছুঁড়ির, সল্‌ বেলোর সঙ্গে ডোয়ার্কিনের বেলোর, সাগর সেনের সঙ্গে তানসেনের, নটরাজ শঙ্করের সঙ্গে উদয়শঙ্করের, শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে মেয়ে-কবিয়াল আদুরীর, লাঙ্গলকন্ধর জীবনধর্মের সঙ্গে মৃণালসুন্দর আর্টফর্মের, অপরাধ-বিজ্ঞানের সঙ্গে অপসংস্কৃতির মিল-অমিলের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতেই হবে। তা না হলে আপনার দফা শেষ। কবুল করতে লজ্জা নেই, এক সময় তাগা-তাবিজ বেঁধে আকন্দদাসও কমার্সের সঙ্গে সোবার্সকে মেলাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকমতো কব্‌জা করতে পারেনি। জ্ঞানোদয়ে সে দেখতে পেয়েছে, সে সংস্কৃতির মেন স্ট্রিম্‌ থেকে অনেক দূরে। বাই-স্ট্যাণ্ডার। হাজব্যাণ্ড ও ভ্যাগাবণ্ড হয়ে সে জলোৎক্ষিপ্ত কই মাছের মতো কান্‌কো দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

হতাশ হয়ে সে পালিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু পালাবে কোথায়? তার জীবনকে জীবনানন্দ কোনো আশ্বাস দেননি।

> কোথাও পাবেনা শান্তি—যাবে তুমি এক দেশ থেকে দূরদেশে?
> এ-মাঠ পুরোনো লাগে—দেয়ালে নোনার গন্ধ—
> পায়রা শালিক সব চেনা?
> এক ছাদ ছেড়ে দিয়ে অন্য সূর্যে যায় তারা—লক্ষ্যের উদ্দেশে
> তবুও অশোকস্তম্ভ কোনো দিকে সান্ত্বনা দেবে না।

না, না, পাঠক, এ-পৃথিবীকে আমার পুরনো লাগেনি, এ-কালের দেয়ালে নোনার গন্ধ পাইনি। আমি বোকা। কিন্তু এত বোকা নই যে, যেখানে বসে আছি সেই ডালটি কেটে ফেলবো। আর চাইলে কি কাটতে পারবো? আমার সাধ্য কতটুকু!

আমি শুধু কোনো দূরদেশে কিছুক্ষণের জন্য পালাতে চাচ্ছি। কান্‌কো দিয়ে আর চল্‌তে পারছি না। আমি ছেলেবেলার আলোকস্তম্ভ ধরে একটু বুক ভরে নিঃশ্বাস টানবো। সেখানে আর যাই হোক্‌, আত্মপ্রবঞ্চনা নেই। দয়ালু পাঠক, আপনি সৃষ্টির বনহংস, আপনি কি অমৃত চান, জানি না। তবু আপনাকে আমার সহযাত্রী হতে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ছেলেবেলা থেকে কতগুলি বর্ষা দেখলুম। কি-বর্ষায় জলও পড়েছে, পাতাও নড়েছে। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'-র ঝংকার আমার বালসুলভ চৈতন্যে ফিরে ফিরে সুরের জাল বোনেনি। যদি বুনতো

তবে আকন্দদাস না হয়ে হতুম আনন্দ ঠাকুর। আমার জীবনে প্রথম কবিতা লক্ষ্মী, শনি ও সত্যনারায়ণের পাঁচালি। সুর করে পড়বার সময় ভক্তি কতটা উদ্রিক্ত হতো জানি না, তবে একটা তানা-না-না শ্রবণে প্রবেশ করতো মৃতসঞ্জীবনীর মতো। প্রথম পাঠের পর দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয়েছিলো রামায়ণ ও মহাভারত দিয়ে। গল্পগুলো বেশ ভালো লাগতো। সীতার বনবাস পড়তুম, মা চোখের জল ফেলতেন। আমার গলাও ভারি হয়ে উঠতো। সীতাহরণে রামের বিলাপ পড়তে পড়তে সেই অল্প বয়সেই মনে হতো আমারও সীতা হারিয়ে গেছে—

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা জাগে মনে ॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ ॥...
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে ॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে ॥

ছুটির দিনে দুপুরে আম গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপরে বসে থাকতুম। বোলের গন্ধে বাতাস ভরপুর। সেই গন্ধের সুতো ধরে মনে মনে খুঁজতুম সেই সীতাকে যে কিনা সোনার চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ায়, নানা ছাঁদে খোঁপা বাঁধে, চোখে কাজল দেয়, খোঁপায় গোঁজে কনকচাঁপা। কখন বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়তুম। স্বপ্ন দেখতুম রূপকথার রাজকন্যাকে। না, ক্ষীরসমুদ্রের তলায় হীরকপুরীতে সোনার পালংকে সে ঘুমিয়ে নেই। সে মনোহরণ চপলচরণ সোনার হরিণ হয়ে দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। আমি ছুটছি পিছে পিছে— ডাকছি— সীতা, সীতা! হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতো— ভয়ানক রাগ হতো কৈকেয়ী আর রাবণের ওপর। বড়ো হয়ে জেনেছি—স্বপ্নসীতারা সব সময়েই হারিয়ে যায়, কেননা সংসারে ওৎ পেতে বসে আছে কেকয়নন্দিনী ও নিকষানন্দনের দল।

কখনো পড়তুম মহাভারত। বড়োদের বড়ো চোখে এর কদর যাই হোক্ না কেন, ছোটদের ছোট চোখে এর তেমন আদর নেই। আজো মনে পড়ছে, বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি দিয়ে সবেমাত্র বাক্যরচনায় হাতেখড়ি হয়েছে। তখন পাক্ খেয়েছি কাশীদাসী গোলকধাঁধায়—

আলিঙ্গনে যুগল শরীর হৈল এক।
অর্ধ শশি-শুক্ল শ্যাম হইলা অর্ধেক ॥
অর্ধ জটাজুট ভেল অর্ধ চিকুর।
অর্ধ কিরীট অর্ধ ফণী-দণ্ড-ধর ॥

কৌস্তুভ-তিলক অর্ধ অর্ধ শশিকলা।
অর্ধগলে হাড়মালা অর্ধ বনমালা॥
মকর কুণ্ডল কর্ণে কুণ্ডলি কুণ্ডল।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন অর্ধ শোভিত গরল॥

যুক্তধ্বনিতে হোঁচট খেতে খেতে সেই হৈ-হৈ-করা বয়সে হরিহরামৃত পান করে যে সুখ পেয়েছিলুম তার চেয়ে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দিলে বেশি সুখ পেতুম।

আমাদের ভদ্রাসনের পাশেই ছিলো প্রজ্ঞাকুলতিলক বলহরি আচার্যের বাড়ি। তিনি ছিলেন সর্ববিদ্যাবিশারদ। নবজাতকের ঠিকুজি-কোষ্ঠী বানাতেন, বিবাহ-উপনয়ন-অন্নপ্রাশনের দিনক্ষণ ঠিক করে দিতেন। সরস্বতী কার্তিক মনসার প্রতিমা গড়তেন, লক্ষ্মীর সরা আঁকতেন, মেছো জাল বুনতেন, তাবিজ-কবচ দিতেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন গার্হস্থ্য-ব্যঞ্জনের হলুদ। তাঁর বাড়িতে শ্রাবণের শেষদিন থেকে তেরাত্তির মনসার ভাসান হতো। নিজেই সুন্দর প্রতিমা গড়ে পুজো করতেন। তখন আমাদের নাওয়া-খাওয়া বন্ধ, দিবারাত্রি পড়ে থাকতুম ওখানেই। সুর করে পুঁথি পড়তো ওঁর দ্বিতীয় ছেলে। গলাটা মন্দ ছিলো না, শুনতে ভালোই লাগতো। যখন স-খোল স-করতাল ধুয়ো গাওয়া হতো, তখন গলা মেলাবার চেষ্টা করতুম। কিন্তু মা সরস্বতী সুর-অবতার হয়ে আমার কণ্ঠে যে অবতরণ করেননি, সেটা জেনেও ভান করতুম না জানার।

চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলে বিজয়গুপ্তই ছিলেন মনসার ভাসানের একমাত্র ভাষয়িতা। মনে আছে দু'অক্ষরের নামটি থেকে থেকে কানে এসে ধাক্কা মারতো। কী আশ্চর্য গল্প! শুনেছি লক্ষ্মী উঠেছেন সমুদ্র থেকে। কিন্তু কানী উঠেছেন কোথা থেকে? এমন ভয়ংকরী ঈর্ষা! সপ্তডিঙ্গা ডুবে গেলো, লোহার বাসরে কালনাগিনী দংশন করলো লখিন্দরকে, চম্পকনগরের আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠলো সনকার আর্তনাদে। সোনার প্রতিমার মতো মেয়ে বেহুলা—সে কিনা মরা স্বামীকে নিয়ে গাঙ্গুড়ের জলে ভাসলো অমরার উদ্দেশে। কানী মনসার ওপর রাগ হতো, তাঁর ঈর্ষা দেখে বর্শা শানাতে ইচ্ছে করতো। সবচেয়ে ভালো লাগতো চাঁদবেনেকে—একটা হেঁতাল নিয়ে কী লড়াই না করে গেছে! রাগের চোটে একবার বেশ কয়েকটা পাবওয়ালা বাঁশ দিয়ে একটা লাঠি বানিয়ে ফেললুম। ভাবলুম, আসুক না কানী, একবার আমার এই হেঁতাল নিয়ে দেখে নেবো! কিন্তু হায় রে, সাপের দেশের ছেলে আমি। রাত হলেই মনে পড়তো কানীর চেলাদের কথা! মা শোয়ার সময় তিনবার উচ্চারণ করতেন—মা বিষহরি! মা বিষহরি! মা বিষহরি! মায়ের কাছ ঘেঁষে ঢিপ্-ঢিপ্ বুক নিয়ে শুয়ে পড়তুম।

আজো আমার মনে পড়ে সেই কবেকার অন্ধকার বাবুরবাজার অঞ্চলে শোনা দুটি অবিস্মরণীয় ছত্র—

কোথা লখাই কোথা লখাই বলে সদাগর।
চম্পকের রাজা আমার বালা লক্ষ্মীন্দর॥

বুকফাটা কান্নার এমন মর্ম-কাড়া পয়ার-লাচাড়ীর ঝুড়ি ঝুড়ি দৃষ্টান্ত আমি লায়েক হয়েও শুনতে পাইনি। তবে গোল বাধিয়েছিলো মান্দাস' এর অর্থোদ্ধারে আমাকে করতে হয়েছিলো অনেক আয়াস। কলার ভেলা যে এত শক্ত তার আগে জানতুম না।

আরো পেছনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই, আমি দুলে দুলে মুখস্থ করছি সীতানাথ বসাকের বাল্যশিক্ষার সেই ছন্দোবদ্ধ পদ্যটা—'দুষ্টমতি লঙ্কাপতি হরি নিল সীতা সতী।' 'তি', 'তী', তিরতির করে আমার কানে যে মধুবর্ষণ করেছিলো তা আজো মনে পড়ে। কে একজন কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়েছিলো বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়। বইটি আমাদের ওদিকে বিক্রি হতো না। সুবোধ বালক গোপালের গল্প পড়ে মনে হলো, আমি গোপাল হবো। তাই দিন দুই পাঠশালা থেকে ফিরে গিয়ে মা যা দিতেন তা-ই খেতুম। কিন্তু সুবোধ থেকে কুবোধ হতে আমার দেরি হয়নি। কারণ খিদে কোনো কালেই আমার মিতে ছিলো না। তবে গোপাল না হই, নাড়ুগোপাল তো হয়েছি। এবং নাড়ু জিনিসটা মিষ্টদ্রব্যের মধ্যেই পড়ে।

বিনোদের মুড়ি কেনার আখ্যান পড়ে আমি লাফিয়ে উঠলুম। আরে, এ যে আমাকে নিয়ে লেখা গল্প! বিদ্যাসাগর মশাই দিব্যদৃষ্টিতে বোধহয় ভাবী আকন্দ-অবতার অবলোকন করেছিলেন। কিন্তু গোলমাল দেখা দিলো ওই খোঁড়া মানুষটিকে নিয়ে। আমি বেশি দূর হাঁটতে পারতুম না। কিছুটা গিয়েই খোঁড়াতে শুরু করতুম। মা রেগে গিয়ে বলতেন, তুই ঘোড়া দেখলেই খোঁড়াতে শুরু করিস্। এখানে ঘোড়া মানে মা বা বড়দার কোল। তারপর থেকে খোঁড়া দেখলেই ঘোড়ার কথা মনে পড়ে যেতো। গল্পের বিনোদের মায়ের চুমো ও মুড়ি কেনার পয়সা জুটেছে। কিন্তু আমার ঘোড়া কেনার পয়সা দেবে কে? আমরা যে গরিব!

পাঠক, এখানে সবিনয়ে নিবেদন করছি, আমাকে কেউ কেউ কখনো সখনো বিনোদ নামে ডাকতেন। গল্পের বিনোদের সঙ্গে আকন্দের এখানেই মিল। যেটুকু মিল ছিলো না সেটুকু করে দিয়ে গেছেন বিদ্যাসাগর। তিনি বিনোদ নামের নামাবলীটি বরাবরের জন্য গায়ে চড়িয়ে দিয়ে আমার জীবনকে খোঁড়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে গেছেন। তারপর থেকে শুধুই লেংচাতে লেংচাতে চলেছি।

যাক্ সে-কথা। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, গল্পরসের মৌচাকটি আমার সামনে তুলে ধরেছিলো গোপাল আর বিনোদ। তারা আমার প্রথম গল্পপ্রেমের যুগ্মনায়ক।

আবার এগিয়ে যাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে যে একজন কবি আছেন তাঁর

সংগে আমার পরিচয় হয়েছিলো কতকটা আচম্কা। তার আগে পাখি সব রব করে গেলো, কাননে কুসুমকলি সকলই ফুটে গেলো। এমন কি কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা জুটলো অলিকুল। কিন্তু তারপরেই এসেছে শরৎ হিমের পরশ। দেখলুম কবির নাম রবীন্দ্রনাথ। কবিতাটি পড়েই কবিকে ভালো লেগে গিয়েছিলো। শুনলুম মস্ত বড়ো কবি, পৃথিবীজোড়া নাম। একে একে রসচক্রে ঢিল ছুঁড়ে চললুম - মধু পান করলুম আকণ্ঠ। আজো আমার সেই ঢিল ছোঁড়া শেষ হয়নি। ভদ্রলোক অভদ্ররকমের দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং অসভ্যরকমের সভ্য কবিতা লিখে গিয়েছেন। আকন্দের হৃদয়কন্দরে তার সব রস ধরবার মতো জায়গা কোথায় এবং সেই অমৃতরস আস্বাদনের রসনাও কি অধমের আছে ?

কিন্তু কৈশোরকালের কোলাহলে কবিগুরু ডমরু বাজিয়ে মাঝে মাঝে তুফান তুলেছেন। কী জানি কেন, মহাভারত পড়ে কর্ণকে বর্ণচোরা আম বলে মনে হয়েছিলো। কিন্তু ইস্কুলের উঁচু ক্লাশে উঠে কর্ণকুন্তীসংবাদ পড়ে তাঁর প্রেমে পড়ে গেলুম। বরং কুন্তীকে মনে হলো ফাঁসির আসামী না হোক্, বিড়ালতপস্বী গোস্বামী। কিন্তু ঝামেলায় পড়ে গেলুম 'মন্দুরা' আর 'স্কন্ধাবার' শব্দ দুটি নিয়ে। মন্দুরার মোকাবিলা করা গেলো অশ্বখুরের সাহায্যে। ছোট্ট অভিধানেও সমর্থন পেলুম। কিন্তু স্কন্ধাবার ? আমার অভিধানে নেই।

ইস্কুলে গিয়ে জহিরুল ইসলাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলুম। উনি অংশটা পড়ে নিয়ে বললেন : ও, 'স্কন্ধাবার' ? ওর অর্থ পিলসুজ। দেখছো না তার আগে 'দীপ' শব্দটা আছে। পিলসুজের ওপর ছাড়া দীপ জ্বলবে কোথায় ?

—কিন্তু 'স্কন্ধাবার' শব্দের আগের শব্দটি 'স্তব্ধ'। তাহলে সব মিলিয়ে কুন্তীর উক্তিটির অর্থ কি হলো ?

—কেন ? সবই তো ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে—ওই অপর পারে ধূসর বালুকাতটে পিলসুজের ওপর প্রদীপ জ্বলছে। তুমি 'স্তব্ধ শব্দটির কথা বলছো ? ওটা অতিশয়োক্তি। আর মনে রেখো 'স্কন্ধ' শব্দের অর্থ 'কাঁধ'। পিলসুজ জিনিসটা দেখতে অনেকটা কাঁধের মতো।

বলে তিনি নিজের দুই কাঁধ দেখিয়ে দিলেন।

আমি একথা ততদিন জেনে গেছি - কবিতায় কিছু কিছু বাড়তি কথা থাকতে পারে, এমন কি অশুদ্ধ শব্দও থাকতে পারে। তাছাড়া জহিরুল সাহেব বাংলার দুর্ধর্ষ এম. এ.। তবু বরাবর দেখেছি, অভিধান না দেখা পর্যন্ত আমার খুঁতখুঁতানি যায় না।

ইস্কুলে মোটা জ্ঞানের অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান ছিলো। লম্বু মহারাজকে বলতেই তিনি বার করে দিলেন। ঠিক পাতাটা খুলতেই

চমকে উঠলুম। 'স্কন্ধাবার' শব্দের অর্থ দেওয়া আছে -'শিবির'। 'স্তব্ধ' শব্দের সঙ্গতিও খুঁজে পেলুম।

সুতরাং পাঠকের দরবারে কবুল করছি, রবীন্দ্রনাথই আমাকে পরোক্ষে শিখিয়ে দিয়েছেন যা জানি না তা বলা উচিত নয়। সংসারে সবাই সব কিছু জানে না, জানা সম্ভব নয়। যা জানা নেই তা নিয়ে কর্দানি না করাই ভালো।

মনে আছে, এ নিয়ে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে হাসাহাসি করেছিলুম।

আর একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিলো। তখন অবশ্য আমার বয়স বেশ কম।

স্কুলে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হবে। কবিতার নাম বীরপুরুষ। ঝরঝরে মুখস্থ হয়ে গেছে, কোথাও ঢোক গিলতে হচ্ছে না। একে ওকে বই ধরাচ্ছি আর কণ্ঠের হোস পাইপ খুলে দিচ্ছি। প্রীতীশ অভিনয় করে। ও বললে, অ্যাকসান দিয়ে বলবি। ভয়ের কথায় বুকটা দেখিয়ে দিবি, কানে গোঁজা জবার জায়গাটায় কান ধরে টানবি, ঠাকুরদেবতার কথা ওঠালেই জোড় হাতে প্রণাম করবি ইত্যাদি ইত্যাদি।

তথাস্তু।

নাইট এর্র্যান্টদের গল্প পড়ে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো ডন কুইক-সটের। তার সখ হয়েছিলো নাইট-এর্র্যান্ট হওয়ার। তার সুবিধেও ছিলো বেশ। বাবার ঠাকুর্দার আমলে শিরস্ত্রাণটায় কার্ডবোর্ড লাগাতেই হয়ে গেলো হেলমেট। হাড়-জিরজিরে একটা ঘোড়াও ছিলো। কিন্তু স্কয়্যার? খেতমজুর সাঙ্কো পাঞ্জা চললো গাধার পিঠে চড়ে ডন কুইকসটের অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী হয়ে। শত্রুপক্ষ? লম্বা লম্বা হাতওয়ালা উইন্ডমিল পাওয়া গিয়েছিলো দৈত্য দানা হিসেবে। সুতরাং লড়াইটাও জমেছিল বেশ মজাদার রকমের।

গল্পটা শুনেছিলুম লম্বু মহারাজের কাছে। প্রীতীশের কথায় মনে পড়ে গেলো ডন কুইকসটের অ্যাডভেঞ্চার। আচ্ছা, বীরপুরুষের মহড়াটা দিলে কেমন হয়? চৌধুরীদের ছিলো ডাণ্ডাভাঙা দুলকি চালের একটা পালকি। সেটাকে সদলবলে উদ্ধার করা গেলো পোড়ো কোঠাবাড়ির পইঠা থেকে। ডান্ডা দুটোকে মেরামত করা হলো জামগাছের কান্ড দিয়ে। ঘোষেদের ছিলো একটা শিংভাঙা বলীবর্দ, ফর্দ মিলিয়ে সেটাকেই করা হলো তুরঙ্গম। কিন্তু 'হাঁরে রে রে রে রে' বলে আসবে কারা? হাতের কাছে ডাকসাইটে ডাকাত পাওয়া গেলো না! বরুণ বললো: ওই বড়ো কাঁঠালগাছটার রসাল ফলগুলিকেই দস্যুর দল বলে ধরে নে।

বালকবুদ্ধিতে পরামর্শটা লজেঞ্জুসের মতোই লোভজনক বলে মনে হলো। সেবার ফলনও হয়েছিলো আপাদমস্তক। সুতরাং ডাকাতের পরিমাণ

বীরপন্থর পক্ষে রোমহর্ষক ছিলো। কিন্তু মা পাই কোথায়? কনকবৌদিকে পোস্টটা অফার করলুম। তিনি হেসে বললেন: বৌ হয়ে এসে একবার পাল্‌কিতে চড়েছিলুম। এবার মা হয়ে আবার চড়বো? আমি বলি কি, ও পোস্টটা নন্দরানীর জন্যই রিজার্ভ থাকুক।

ব্যাজার মুখে বসে রইলুম। সমস্ত প্ল্যানটাই যে ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম! নন্দদি যদি মা হবেন তবে গলরজ্জু বলীবর্দটিকে টানবে কে? শিবঠাকুরের বাহনটি যে আপনা আপনি নট নড়নচড়ন। প্রীতীশ ও বরুণ হবে দুই বেহারা। অবশেষে বহু গবেষণার পর আমাদের হুলো বেড়ালটিকে নির্বাচন করা হলো। ততদিনে লিঙ্গ-পরিবর্তন পড়ে ফেলেছি। হুলোর নির্বাচনে লিঙ্গের যে গণ্ডগোল রয়ে গেলো তা বুঝতে পারলুম। তবে সর্বাঙ্গীণ প্রয়াসেও একটি মেনীর হদিস পাওয়া গেলো না। বুঝলুম আমাদের পুরুত ঠাকুরের মতো গঙ্গাজলের অভাবে নর্দমার জল দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

পরিস্থিতিটা ছিলো খুবই ড্রামাটিক। আমি বাখারিনির্মিত তলোয়ারসহ বলীবর্দে সমারূঢ় হয়ে বসেছি। নন্দদি রজ্জুহস্তে হ্যাট্ হ্যাট্ করছেন। যুগল বেহারা স্টার্ট দিয়েছে। নন্দদি ষাঁড়টিকে অসাড় দেখে গতর খাটিয়ে কন্টকীনগর সমীপে আনয়ন করেছেন। আড়াল থেকে কনকনন্দন নান্টু শিক্ষামতো 'হাঁরে রে রে রে রে' গর্জনও শুনিয়ে দিলো। এমন সময় ঘটলো সেই অঘটনটি।

কাকচঞ্চুক্ষত সুপক্ক কাঁঠালের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পাল্‌কিবাসিনী মা জননী হুলো ফুলতে লাগলেন এবং এমন জোরে উল্লম্ফন দিলেন যে, তার পদযুগল-স্থিত শাড়ির পাড়রূপিণী দড়ি ছিঁড়ে বলীবর্দে উপবিষ্ট আকন্দের হাতের ওপরে এসে পড়লেন। কিন্তু বাখারিবংশজাত তরবারি ব্যবহারের আগেই কোমল হস্তে সাদরে নখরাঘাত করে উচ্চবৃক্ষচূড়ে আরোহণ করে কাঁঠালের রসালো আস্বাদনে মনোনিবেশ করলেন। ততক্ষণ আমার করমণ্ডল রক্তাক্ত। বীরপুঙ্গবের সাড়ম্বর মহড়া যে এমন রক্তারক্তি কাণ্ডে পরিণত হবে আগে ভাবতে পারিনি। আজো আমার হাতে সেই নখরাঘাতের চিহ্ন জাজ্বল্যমান।

হলুদ চুন লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করতে করতে কনকবৌদি বললেন: পাগল ছেলে কোথাকার! কবির কল্পনা কি কখনো সত্যি হয়?

পরে কবিতাটি আবার পড়লুম। রবীন্দ্রনাথ তো বলেই দিয়েছেন বালকরা এমন অনেক কিছু কল্পনা করে যা সত্যি হয় না—

রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না আহা।

আজ যখন বালক বয়সের সেই ছেলেমির কথা ভাবি তখন মনে হয়, ডাকাতরা রে রে' করে আসার সময় বীরপুরুষ আদপেই মায়ের সঙ্গে ছিলো

না। আসলে সমস্ত কবিতাটিই একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, দাঙ্গা ইত্যাদিতে আমাদের খোকাদের ভূমিকা দেখলে সকলকে বীরপুরুষ বলে ভাবতে ভালো লাগে বৈকি!

মহাকবি বেদব্যাসের মহাভারতে বালপর্ব নেই, কিন্তু বালকবি আক্রন্দদাসের বরাতে ছিলো ব্যাণ্ডেজপর্ব। অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাবে কে! সেদিন থেকে ঠিক করলুম, আমি কাব্যপাঠেই থাকবো—কাব্যনাট্যে আর ঘণ্টাকর্ণ হবো না।

বয়স যখন দ্বাদশ পেরিয়ে গেলো তখন দেখলুম আমি আর শিশু বা শিশু ভোলানাথ নেই। তখনো লীলাসঙ্গিনীর সন্ধান পাইনি বটে—তবে মোর ধরণীর প্রজাপতিটির পাখা ভালোবাসতে শুরু করেছি, বুঝতে শিখেছি কেন স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা। দ্বাদশই যখন ষোড়শে প্রলম্বিত হলো, ততদিনে ওই রবীন্দ্র ঠাকুর আমার মনের বীণার আলম্ব হয়ে উঠেছেন। তখন কথায় কথায় রবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় উচ্চারিত হচ্ছে। অবশ্য কৈশোরক কোরকে কোনোকালেই কুসুমগন্ধের অফুরন্ত উড়ুনি ওড়ে না।

তবে চুপি চুপি বলে রাখি কোথায় ছিলো বয়ঃসন্ধির সানন্দ অনুরাগ। কস্তাপেড়ে শাড়ির চেয়ে নক্‌শাপেড়ে শান্তিপুরী মেয়েরা যেমন বেশি ভালোবাসে, তেমনি কাব্যের ঝলমলে ঝিলিমিলির চেয়ে গল্পের চটক্‌দার সিংহদ্বার আমি ভালো বাসতুম বেশি। বালভোগে কাজুবাদামের রুচি ভালো, তার চেয়ে ভালো ঘিয়ে-ভাজা লুচি। একে একে শেষ করলুম পাঁচকড়ি দে, হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং আরো কতকজনকে। যখন যেটা পড়লুম তখন মনে হলো আমিই তার নায়ক। কখনো বিমানবোটে বোম্বেটে, কখনো দস্যু মোহন, কখনো রবীন হুড। বুঝতে পারলুম বাবুরবাজারের বাইরে আছে এক পৃথিবী। এক মস্তবড়ো সোনালি স্বপ্নের দেশ। সেখানে নিত্য কত অঘটন ঘটে এবং তা অফুরন্ত আনন্দেরও বটে! ইস্কুলের লাইব্রেরিতে পেলুম শেক্সপীয়ারের নাটকের গল্প—সহজ বাংলায় লেখা, কার লেখা মনে নেই। ইংরেজিতেও পাঠ্য ছিলো ল্যাম্‌স টেল্‌স ফ্রম শেক্সপীয়ার। যত পড়েছি তত আনন্দ পেয়েছি।

বাংলা উপন্যাসে আমার হাতেখড়ি বঙ্কিমকে দিয়ে। সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ অপরাহ্ণ, শৈলেশ্বরের মন্দির। সুদর্শন অশ্বারোহী জগৎসিংহ, রূপপ্রতিমা তিলোত্তমা। বারবার পড়লুম, তবু আশা মিটলো না। জানিনা কোথায় গড় মন্দারণ, তবু সেই অজানা দেশেই উধাও হলো আমার জোনাকি-স্বপ্ন। আর আয়েষা? সেতো রক্তমাংসের মেয়ে নয়, ফুলকুমারী রাজকন্যা। আমার মন পবনের নাও থেকে থেকে দুলে উঠতে লাগলো একটি ধ্বনির উত্তাল ঢেউয়ে—বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।

কিংবা সেই অগাধ জলে সাঁতার।

প্রতাপ ডাকিল. শৈবলিনী – শৈ !

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে 'শৈ' বা 'সই' বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। কতকাল পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী যত বৎসর সই শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনীর সেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্র তারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, 'প্রতাপ। আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন ?'

শাস্ত্রমতে, ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত বাল্যকাল। আমার এখনো ষোলো হয়নি। বাল্যকালে প্রতাপ শৈবলিনীকে 'শৈ' বা 'সই বলে ডাকতো। আমি ডাকবো কাকে ? পড়তে পড়তে ইচ্ছে করলো কোনো সৌন্দর্যের ষোলকলাকে ডাকি--'সই, আমার সই।' কিন্তু গরিব প্রতাপ শৈবলিনীকে—অমূল্য রূপরাশিকে—পায়নি। শৈবলিনীই যখন ভাবলো – প্রতাপ আমার কে ? তখন এই দুনিয়ার সহেলীর দলও বলবে—কোথাকার কে এক আকন্দ ? তার জন্য ডুববো কেন ?

কিংবা সেই স্তিমিত প্রদীপে এক অনুতপ্ত হৃদয়ের হাহাকার !

প্রতিচিত্রে নগেন্দ্র সূর্যমুখীকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে পড়িল যে. উমার কুসুমসজ্জা দেখিয়া সূর্যমুখী একদিন আপনি ফুল পরিতে সাধ করিয়াছিলেন। তাহাতে নগেন্দ্র আপনি উদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া স্বহস্তে সূর্যমুখীকে কুসুমময়ী সাজাইয়াছিলেন। তাহাতে সূর্যমুখী যে কত সুখী হইয়াছিলেন - কোন্ রমণী রত্নময়ী সাজিয়া তত সুখী হয় ? .. নগেন্দ্র ইহা মনে করিয়া কত কাঁদিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান করিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দিকে চাহেন —সেই দিকেই সূর্যমুখীর চিহ্ন।

পাঠক, অসময়ে কুন্দনন্দিনীর বিয়ে দিয়ে বঙ্কিম আশঙ্কা করেছিলেন আপনি বড়ো বিরক্ত হবেন। আমার আশঙ্কা আমার অকালপক্কতায় সতর্ক অভিভাবকের মতো আপনি হবেন বেশ ক্রুদ্ধ। আপনাকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি, বিষবৃক্ষে অমৃতফল ফলাবার শতমূলী চিকিৎসায় আমার উপকার কিছু হয়নি. কিন্তু বঙ্কিম-পাঠের পাকামিতে আর যাই হোক্ নষ্টামির পিত্তশূলী রোগেও আক্রান্ত হইনি। আমি বদলালুম কোথায়, জানেন ? বাবুরবাজারের বাবুবৃত্তান্তে কিংবা মোচার ঘণ্ট এতকাল সুখ খুঁজেছি। এবার যেন দেখতে পেলুম, রাধারানীর ছোট্ট খোঁপায় তেপান্তরের বৃত্ত। তাতে আছে গন্ধরাজের মেলা, ফুলঝুরি সুখ।

রসিক পাঠককে বলতে হবে না, এই রাধারানী আর কেউ নয়—আমারাই শামলী মন।

সে যেন গ্রামের নদী
বহে নিরবধি
মৃদুমন্দ কলকলে ;
তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, আবর্তের ঘূর্ণি নাই জলে ;
নুয়েপড়া তটতরু ঘনচ্ছায়া-ঘেরে
ছোট করে রাখে আকাশেরে।
জগৎ সামান্য তার, তারি ধূলি-'পরে
বনফুল ফোটে আগোচরে,
মধু তার নিজমূল্য নাহি জানে
মধুকর তারে না বাখানে।
গৃহকোণে ছোট দীপ জ্বালায় নেবায়,
দিন কাটে সহজ সেবায়।

ছেলেবেলা থেকে জেনে এসেছি, রবিঠাকুর কাব্যি করেন। কিন্তু ওই দেবতার মতো মানুষটি যে মানুষেরও গল্প লেখেন তা জেনেছি চোদ্দর চৌহদ্দি পেরিয়ে। আমাদের পাঠ্য বইয়ে অপাঠ্য অনেক লেখা থাকতো। কিন্তু রবি-ঠাকুরের গল্প থাকতো না। বোধহয় ওগুলি পাঠ্যতো নয়ই, অপাঠ্যও নয়, দুষ্পাচ্য। হঠাৎ হাতে এলো একটি গল্প--পোস্ট মাস্টার। পড়ে চমকে উঠলুম -বারো তেরো বছরের রতন নামে মেয়েটির বুকের ভাষা আর আমার বুকের ভাষায় কোথায় যেন মিল! দেখেছি আমারও হৃদয় বুদ্ধিহীন, ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচেনা, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে। তাই বারবার পড়লুম সেই মর্মছেঁড়া বাক্যটি পৃথিবীতে কে কাহার! কী সুন্দর সেই অশ্রুসজল কাহিনী :

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে একটা অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।

বিশ্বব্যাপী মর্মব্যথার কথা জানি না, কিন্তু আকন্দব্যাপী মর্মব্যথার কথা জানি। তাতে এক তিল মিথ্যা নেই।

আর একটি গল্প পড়েছিলুম। ক্ষুধিত পাষাণ। গা ছমছম্-করা আরব্য উপন্যাসের সহস্র রজনীর ধূপছায়ালোক যেন খুঁজে পেলুম জীবনে সেই প্রথম। একটি পরিত্যক্ত প্রাসাদ, নিষ্ফল কামনার অভিশাপে প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত হয়ে আছে। জীবন্ত মানুষ পেলে পিশাচীর মতো তাকে

খেয়ে ফেলতে চায়। ভাবলুম একি ভূতের গল্প ? ভূতের গল্প আগে যেমনটি পড়েছি ঠিক তেমনটি তো নয়। তবে কী নাম দেবো এর ? পড়তে পড়তে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলো, অথচ আগাগোড়া ছড়িয়ে আছে কী এক আশ্চর্য স্বাদ ! বারবার পড়লুম সেই রাত্রির অভিসারের বর্ণনা : ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না—কেবল জাফরান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির চটি-পরা দুইখানি ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ গোলাপি মখমল-আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম।…ঘরের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব ধূপের একপ্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

বহুদিন ভুলতে পারিনি সেই দুটি সুন্দর চরণ। আধ-দেখা আধ-ঢাকার মধ্যে রহস্যের এক অশ্রুতপূর্ব বৈতালিক !

রাজর্ষি পড়েছিলুম। তাতে রাজসিক আয়োজন থাকলেও আমার ফলার ফাঁদালোগোছের হয়নি। ফলদার সংগ্রহে পেলুম নৌকাডুবি আর গোরা। ডুবোজাহাজে হজ হয় না, তাতে মক্কার বদলে অক্কা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওই কমলা বলে মেয়েটা মরেও মরলো না, রমেশের জীবনের অঙ্ক কষায় ভাগ-শেষের মতো ঝুলে রইলো অনেকদিন। টোপে ঠোকর মারলো, ফাৎনা নড়লো। কিন্তু টোপ গিলতে গিয়ে দৌড় মারলো নিরাপদ পাঁকের তলায়। পড়তে গিয়ে, বিশ্বাস করুন পাঠক, সেই অল্পবয়সেই আমার মনে হয়েছিলো—এ মেয়েতো মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়। কিংবা পিশাচী। অভয় দিন তো সাহস করে বলি, কমলাকে আকন্দদাসের একদম ভালো লাগেনি। রমেশ দিলো মোহর, কিন্তু আকাঁড়া চালও তার কপালে জুটলো না। ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হলে বলতুম, ভদ্রে, আপনার কাছে কী দোষ করেছিলো ওই হতভাগা রমেশ ? যে মুহূর্তে জানলেন কোনো এক অদেখা নলিনাক্ষের কথা অমনি সব সোহাগ উবে গেলো কর্পূরের মতো ? আপনি রক্তমাংসের মানবীতো ?

গোরা পড়ে ভড়কে গেলুম। মনে হলো কালবোশেখীর ঝড়ের মুখে পড়েছি। একটা মানুষ এত বক্ বক্ করতে পারে এবং সেই বক্‌বকানির এত তোড় ? লোকটা কি হিজ মাস্টার ভয়েসের রেকর্ড ? পিন্ লাগানোই আছে। রাগ করবেন না, দয়ালু পাঠক, যেখানেই মাথা-ধরানো বক্তৃতা শুরু হয়েছে সেখানেই নিশ্চিন্তে পাঁচ ছয় পাতা উল্টে গেছি। অবাক হয়ে দেখেছি, গল্প যেখানে ছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আর ওই সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে সুচরিতা ? বড়ো বেশি ভারিক্কি ! ওই একই বয়সের শিঞ্জিনী অনেক বেশি চনমনে মেয়ে। তবে হ্যাঁ, ললিতা মেয়েটা বেশ ! ও যেন একটা চট্‌পটে চড়ুই পাখি। বারবার পড়লুম :

ললিতা কহিল, 'আমি কলকাতায় যাব—আমি কিছুতেই থাকতে পারলুম না।'

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, 'ওঁরা সকলে ?'

ললিতা কহিল, 'এখন পর্যন্ত কেউ জানেন না। আমি চিঠি রেখে এসেছি—পড়লেই জানতে পারবেন।'

ললিতার এই দুঃসাহসিকতায় বিনয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সংকোচের সহিত বলিতে আরম্ভ করিল, 'কিন্তু—

ললিতা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল, 'জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে, এখন আর 'কিন্তু' নিয়ে কী হবে! মেয়েমানুষ হয়েছি জন্মেছি বলেই যে সমস্তই চুপ করে সহ্য করতে হবে সে আমি বুঝিনে।…

তখন রাত দশটা। পড়তে পড়তে মনে হলো, বিনয় নয়, আকন্দদাস নামে এক ব্যক্তি ছিলো ললিতার সেই স্টিমারযাত্রায় সহযাত্রী। গল্প এমনি করেই পাঠককে টানে। তাকে হাসায়, কাঁদায়। ভুলিয়ে দেয়। সেই রাত্রে আমিও ভুলেছিলুম।

তবু অকপটে বলি, বঙ্কিম আমাকে যা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা দেননি। সব বুঝতেও পারতুম না। আকন্দের আনন্দভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের কথাকলি সিকি আধুলি মাত্র দিয়েছে। তাঁর গল্পকথাকে মনে হতো সোনার মত ভালো-বাসার ধন। নুনের মতো ভালোবাসার ধন নয়।

সেই নুনের মতো ভালোবাসা আমার জাগালো শরৎচন্দ্রকে নিয়ে। তিনি কমলার জন্য ক্যামেলিয়া ফুটিয়ে শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল মেয়ের কানে গুঁজে দেননি। হরতনকে রুহিতনের সঙ্গে পাশিয়ে দিয়ে আর যাই হোক বুদ্ধির ঝিলিকে কিস্তিমাৎ করার চেষ্টা করেননি তিনি। তার চেয়ে বরং চোখের জলে পার্বতীকে ভাসিয়েছেন, ভাসিয়েছেন কিশোরপাঠক আকন্দদাসকে। বখে-যাওয়া ছেলে দেবদাস ফিরে এসেছে হাতীপোতায়—পার্বতীদের জমিদার বাড়ির সামনে অশ্বত্থতলার বাঁধানো বেদীটার ওপর পেতেছে জীবনের শেষশয্যা। এ-কাহিনী পড়ে আমি অঝোরে কেঁদেছি—কাঁদবো যে, তা শরৎচন্দ্র জানতেন: তোমরা যে-কেহ এ কাহিনী পড়িবে হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মতো এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই হোক, যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহ-করস্পর্শ তাহার ললাটে পেঁছে—যেন একটুও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়! মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।

না, রমাকেও ভুলিনি। জানি, পোড়াকপালী মেয়েটা বেণী ঘোষালের হেঁসেলে অনেক খিচুড়ি পাকিয়েছে, মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে, মাছের ভাগা নিয়ে তাগা-তাবিজ বেঁধেছে। তবু মনে পড়ে, সেই তারকেশ্বরের অবিস্মরণীয় দিনটি। একটা বেলার মধ্যে রমেশের জীবনটি যে আগা-গোড়া বদলে দিয়েছে।

সেই দিনটি রমেশের জমা-খরচের খাতায় চিরদিনের জন্য রয়ে গেলো নিন্দা সুখ্যাতির বাইরে।

তবুও শেষ রক্ষা হলো না। রমাকে যেতে হলো। বিশ্বেশ্বরী ঠিকই বলেছিলেন: কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন!

পড়া শেষ হলো গভীর রাতে। সে রাতে আর ঘুমোইনি। দোষ কার? রমার? না। রমেশের? না, তাও নয়। তবে কার—কার? আজ হলে ব্যঙ্গ করে বলতুম: সমাজতো ফাঁকা আওয়াজ! ভজুয়ার তেল-খাওয়ানো লাঠি আর হাল আমলে আইনের মাপকাঠি দুই-ই শিশুগাছের সন্তান। সুতরাং দোষটা নিরাকার ব্রহ্মের। কেননা ও ভদ্রলোক বড়ো সেয়ানা!

রবীন্দ্রনাথ কোনো এক মালতীকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য উকিল ধরেছিলেন শরৎচন্দ্রকে। কারণ কাঁচা বয়সের জাদুকে কলমের জাদুতে সপ্তরথিনীর ব্যূহ ভেদ করে শেষতক ঢেউয়ের ওপর দিয়ে পালের নৌকোর মতো তরিয়ে নিয়ে যাওয়াতো সহজ কথা নয়! মালতীর স্বপ্নসম্ভব নটেশাকটি শেষ পালায় মুড়িয়ে গেলো। সাধারণ মেয়ে বিজয়িনী মেয়ে হলো না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নিজের হাতে গড়া বিজয়া? বিলাসের রজ্জুতে সে তো প্রায় বাঁধ ই ছিলো। কিন্তু 'অস'-খাওয়া জগদীশের ছেলে গরিবীয়ানার দিওয়ানা নরেনবাবু রেসে জিতে গেলেন কোন্ দৌলতে? কৌশলটি লক্ষ্য করুন—প্যাকাটির মতো দেখতে ছেলেটি সরস্বতীর খালে মাছ ধরে, অথচ ম্যালেরিয়া ওঁকে ধরে না। সে এখনও বেকার অথচ বিলেত ফেরত ডাক্তার। সরু সরু হাত, কিন্তু তাতে এমন অসামান্য জোর যে, অনায়াসে বন্ধ জানালা খুলে ফেলে। সে প্র্যাকটিস করে না বটে, কিন্তু পথ চলতে চলতে চকিত চমকে দেখেও অব্যর্থ প্রেস্ক্রিপসান্ লিখতে পারে। তার দেওয়া ওষুধ খেতে হয় না, ব্যবস্থাপত্রে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই অসুখ সেরে যায়। সে বিজয়াকে জয় করবে না তো জয় করবে আখুটে বিলাস, ফেলনা হরিদাস, না অকিঞ্চন আকন্দদাস? বিজয়ার সঙ্গে বিয়ে নরেনের না হয়ে যদি হতো বিলাসের তবে আমি সেই কাঁচা বয়সে হয় ঠাকুরের কাছে হত্যে দিতুম, নয় আত্মহত্যা করতুম। আর আমি আকন্দদাস না হয়ে যদি বিজয়াদাস হতুম, তবে প্রভাত মুখুজ্জের গল্পের সেই অকালপক্ক প্রেমিকের মতো প্রণয়-পরিণামে পেটভরে লুচিসন্দেশ না খেয়ে ইন্দ্রনাথের মতো উধাও হয়ে যেতুম। এঁদেশে কাছে থাকলে মা মনসা, না থাকলে ফা ফলসা। ওই লোকটি হাওয়া হয়ে গিয়ে শ্রীকান্তকে ঘুরিয়েছে, রাজলক্ষ্মীকে কাঁদিয়েছে। মরেও মরেনি।

অনেকক্ষণ আপনার দিকে নজর দিইনি, পাঠক। আপনি এতক্ষণে হয় হেঁচোক তুলে, নয় ভুরু কুঁচকে বসে আছেন। আমার আবেগের সার্ফে আপনার

সর্বাঙ্গে বরফির মতো ফেনা জমে উঠেছে। আপনি তো আর দর্জিপাড়ার 'ঠুং ঠুং পেয়ালা' নতুনদা নন। আর আপনার পায়েও নতুন পাম্‌স্‌ জুতো নেই। আপনি হচ্ছেন হাল আমলের মগজওয়ালা যাচনদার। অশ্রুজলের তরফদার শরৎচন্দ্র আপনার বুদ্ধিযন্ত্র ঘোরে না। হাতে গোল্ড কফির কাপের তুফানে গোল্ডকোস্ট এবং এক্সপেরিমেন্টাল সাহিত্যের গোলপোস্ট ছাড়া আর কিছুতেই আপনার রুচি নেই। আপনি বৌদ্ধবিহারতন্ত্র থেকে জেনে গেছেন, শরৎচন্দ্র শিশুপাঠ্য উপন্যাস লিখেছেন। আপনার অকাট্য যুক্তি আমি মেনে নিচ্ছি। তবে মেহেরবানি করে মনে রাখবেন, আমি যে বয়সের কথা লিখছি সেটা ছিলো আমার কৈশোরকাল। সুতরাং আটত্রিশে শরৎচন্দ্রের পূর্ণগ্রাসের পর আমি যদি আটগজী দড়কাঁচা প্রবন্ধ দিয়ে আমার নিষ্ফলা সাহিত্য-জীবন শুরু করে থাকি তবে আমাকে ক্ষমা করবেন। আর ভয়ে ভয়ে বলি, আজ যদি উনি বেঁচে থাকতেন তবে কড়চা লিখে কেঁচে যাওয়ার আগে তাঁকেই লিখতে দিতুম। বলতুম : পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো, তুমি শরৎবাবু, নিতান্তই সাধারণ আকন্দদাসের গল্প।

থাক্ থাক্, গল্প-উপন্যাসের কথা থাক্। আমাদের জীবনে গল্প নেই, তাই বালিশে শিরস্ রেখে মতিবিবির সঙ্গে খুনসুটি করতে বাঙালীর ভালো লাগে। ভালো লাগে বিনোদিনীকে প্রণয়িনী ভাবতে। আর কুমারসাহেবের তাবুতে পিয়ারী বাইজী বিদ্যুদ্‌গতিতে যার পথ আগ্‌লে ছিলো, সে শ্রীকান্ত নয়, যে-কোনো বঙ্গসন্তান। তাই তিস্‌রি কসম্, কুলসমদের কথা আর বলবো না।

আমাদের যখন তিন কোঠাওয়ালা পাকা ঘর হলো, তখন একটা কোঠায় দক্ষিণের বেড়ায় জানালা ছিলো না। সেই বদ্ধকোঠায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠতো। তাই জানালা কাটানো হলো অনেক হুজ্জত করে। তখন দাক্ষিণা হাওয়ার সে কী দাপট! বিছানায় বসে বসে দেখতুম 'ভুতো' আমগাছে দীর্ঘ বোঁটায় আম দুলছে। জামরুলের সফেদ সোহাগে নুড়ে পড়েছে নরম ডাল। ঝড় হচ্ছে কাঁচা লঙ্কার ঝাড়ে। অনেক অনেক দূরে উড়ে যাচ্ছে চিল। তার ডানায় যেন পড়ন্ত রোদের আভা ঝিকমিক করছে। দক্ষিণের বাতায়ন আমার সামনে খুলে দিয়েছিলো এক অদেখা জগতের বন্ধ দুয়ার। ঠিক এই কথাটি মনে হয় যখন সারদাচরণ দত্তের কথা ভাবি। তিনি ছিলেন বাবুরবাজারের রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে দক্ষিণের বাতায়ন। জনারণ্য গোলাপবাগ।

আজ সংস্কৃতি মানে তো নাচ, গান আর অভিনয়। তিনিই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সংস্কৃতির অপর নাম শোভন জীবন। সে জীবন শুধু বুদ্ধি ও চর্চা দিয়ে পাওয়া যায় না। তাকে পেতে হয় সমস্ত সত্তা দিয়ে—চলনে বলনে বিচারে বুদ্ধিতে ভাবে ভাবনায় তাকে নিঃশেষে আত্মসাৎ করতে হয়। ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবী ও সাদা চুলে সেই ছোটখাটো মানুষটিকে আমার মনে হতো এক

রাশি কালো জলের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্ন সবুজদ্বীপের মতো। সারদাচরণ শুধু বিদ্যাবতী ব্রহ্মচারীর নিঃশব্দ উপাসক ছিলেন।

তাঁর কাছেই প্রথম দেখেছি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা চিঠি: প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও বসুমতীর অজস্র সংখ্যা। বিকেলের দিকে যেতুম তাঁর কাছে। তাঁর নাতনী পাশে বসে পড়তেন। আমি পড়তুম প্রবাসীর নতুন সংখ্যা। ওটার তিনি নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। ডাকে আসতো।

জিজ্ঞেস করতেন: কী পড়ছো?

—নীলাঙ্গুরীয়।

—বিবিধ প্রসঙ্গ পড়বে। অনেক কিছু জানতে পারবে। ওটা রামানন্দবাবু নিজে লেখেন।

আরেকদিন। প্রবাসীতে হাত দিতেই বললেন: শুধু নীলাঙ্গুরীয় পড়বে?

—না। সব পড়বো।

—বিবিধ প্রসঙ্গ কেমন লাগছে?

—খুব ভালো। আমি এতদিন কোনো কাগজের সম্পাদকীয় পড়তুম না। এবার থেকে ভাবছি পড়বো।

—বইয়ের রিভিউ পড়ছো?

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগছে?

—অনেক বইয়ের খবর পাচ্ছি। কিন্তু বইগুলি কি কোনোদিন পড়তে পাবো?

উনি মৃদু হাসলেন। বললেন: সেটা নির্ভর করছে তোমার ওপর।

যে সংখ্যায় নীলাঙ্গুরীয় শেষ হয়ে গেলো সেদিন ওঁর ঘরে বসে বসে ভাবছিলুম। ঘৃণায় মেশানো ভালোবাসা? ভালোবাসার এমন রূপের কথা কই আগে কখনও পড়িনি। নীল আংটির সঙ্গে পাঠানো মীরার চিঠিটি বারবার পড়লুম।

এমন সময় সারদাবাবু ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে আরেক ভদ্রলোক। ঢোলা পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরেছেন। রং কালো, মোটাসোটা মানুষ, কাঁচা পাকা চুল। বললেন ইনি শ্রীকালীমোহন ঘোষ। শান্তিনিকেতনে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদেশে গেছেন।

আমি প্রণাম করলুম। সারদাবাবু বললেন, আমার স্বর্গত বন্ধুর ছেলে।

বিকেলে কালীমোহনবাবুর বক্তৃতা শুনলুম। বিষয় পল্লীসংগঠন। লোকজন সংখ্যায় কম ছিলো। আস্তে আস্তে সহজ ভাষায় বললেন।

ইনি রবীন্দ্রনাথের সহচর? আমি ছত্রিশ সালে দূর থেকে একবার কবিগুরুকে দেখেছি। আমার বয়স তখন খুব কম।

ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলুম। সারদাবাবু, কালীমোহনবাবু, রবীন্দ্রনাথ! মনে হলো আমার মাথার ওপরের আকাশটা বড়ো হয়ে যাচ্ছে। আমি যেন আর পোড়ো ভিটের আকন্দ নই।

● ●

বিষ্ণুপুর বা গৌরীপুর কোনো ঘরানার কাছেই আমার নজরানা দেওয়া নেই। আমার কাছে ভীমপলশ্রী ও বাগেশ্রী দুইই সমান—কারণ দুটোতেই শ্রী আছে। কিংবা দুটোই সমান বিশ্রী। মিঞা তানসেনের গান শুনলে বৃষ্টি নামতো। আমার গান শুনলে ছেলে দরজা বন্ধ করে পাছে বৃষ্টির বদলে পাড়ায় অনাসৃষ্টি কাণ্ড হয়। অতএব তামাম দুনিয়া ছেড়ে হামামে আমার এখন অব্যাহত সঙ্গীতচর্চা। ওখানে ছেলে নেই, পাড়াপড়শী নেই, কোনো ঘরানার নৈষ্ঠিক নির্দেশনা নেই। কলের জলের ধারাবর্ষণে যে নহবত বেজে ওঠে, তার সঙ্গে তাল রেখে বেতালপঞ্চবিংশতি গাইলেও দাঙ্গাহাঙ্গামার কোনো সম্ভাবনা নেই। বিশেষ করে শীতের কামড় যত বাড়ে আকন্দী সঙ্গীতের স্বরগ্রাম তত ডিণ্ডিম রূপ পরিগ্রহ করে। অন্য ঋতুতে ঋষভে থাকতেই ভালোবাসি, কারণ বাথরুমি সঙ্গীতকলায় এই অধম ভারতবর্ষভ।

অতএব, রসগ্রাহী পাঠক, বুঝতেই পারছেন সঙ্গীতশাস্ত্রে আকন্দদাসের বিলক্ষণ ঔদাসীন্য আছে। এই অশাস্ত্রীয় অরুচির রোকড় আপনার কাছে দাখিল না করা পর্যন্ত আমার রেহাই নেই জানি। অক্ষরমালার বর্গী হাঙ্গামায় ট-বর্গ সর্বকালেই টাটুঘোড়া চড়েছে। যাকে বলি কালচার তা প্রাচীনকালে তুলট কাগজ আর ধ্রুপদ ঠাটে ভর করে চলতো। আমার ছেলেবেলায় সেই কালচারের আলো ছড়িয়ে পড়তে দেখেছি ঘষামাজা লপেটায়, চুনটকরা ধুতিতে, তেলেখাওয়ানো টেরিতে। কেউ কেউ এর সঙ্গে চুরুট টানার কায়দা যোগ করতেন। হাল আমলে এসেছে স্টিরিয়ো, টি. ভি, টয়েটা, ম্যাক্সফ্যাক্টর ইত্যাদি ইত্যাদি। এর সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত স্ট্যালিনকে যোগ করলে কালচারের হালচাল আরো চৌকশ হয়। মড্‌রা আর চুমো খেয়ে নয়, টা-টা করে কালচার-শিকারী দুগ্ধপোষ্যদের তুলে দেন সবজান্তা ফাদারদের টাটামার্কা ছিমছাম গাড়িতে। তা না হলে যে টি টি পড়ে যাবে!

আকন্দের পাপড়ি মেলার কালে বাবুরবাজারের কালচারের হাল সুবিধের ছিলো না। কমল-হীরের পাথর ছিলো নানা প্রকার আর আকারের—কিন্তু নাচ-গানে তার আলো ঠিক ঠিকরে পড়েনি। আমি আঁতুড় ঘরের সামনে শাড়ি-পরিহিতা হিজড়েদের ও বিজয়া সম্মেলনে শাড়ি-লুন্ঠিতা পঞ্চমী-ষষ্ঠীদের নাচ ছাড়া আর কোনো নাচ দেখিনি। সুতরাং নৃত্যকলায় আমার অনুরাগ-বৃদ্ধির হার ছিলো আমাদের জাতীয় আয়বৃদ্ধির হারের মতোই নিম্নাভিমুখী।

যে গান বোঝে না সে খুন করতে পারে। আমিও খুন করেছি—তবে সোনার মাছি নয়, আমার সূর্যকান্তমণি আত্মাকে। ওটা এখন শুধু শুকনো কাঠ। রণরঙ্গিনীর জিহ্বা, মৃগনয়নার কটাক্ষ, রত্নাবলীর কণ্ঠ সৌষ্ঠব, আধ-আধ ভাষিণীর আলতো হাসি—সব কিছুতেই যেমন আমি পোড়া কাঠ হয়ে থাকি, তেমনি আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতেও সেই পোড়া কাঠ সরস হয়ে ওঠে না। কারণ কাঁচ ঘাসতো ব্রহ্মডাঙ্গায় জন্মায় না! আমি পনেরো পেরিয়েও তালেবর কাউকে রোজ সকালে রেওয়াজ করতে দেখিনি। আজমীঢ়-ফেরৎ লোক দেখেছি, কিন্তু সেতার-কসরতের মিড় শুনিনি। যেটুকু দেখেছি শুনেছি, তার কথা পরে বলছি।

পাণ্ডবেরা যে সেই মহাভারতের কালে বাবুরবাজার দিয়ে মণিপুর যাননি, এটা ধ্রুবসত্য। তা না হলে আমাদের দেশটা পাণ্ডববর্জিত এই কথাটা ছেলে-বেলা থেকে শুনতুম না। তবে তাঁরা যে মৈমনসিংহ থেকে কুমিল্লা অঞ্চল দিয়ে মণিপুর গিয়েছিলেন এবং ফিরেছিলেন, এটা সুনিশ্চিত। প্রমাণ চান? ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, শৈলদেবী, শচীন দেববর্মণ, হিমাংশু দত্ত সুরসাগর। না, নামের মালা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। বেদব্যাসের না হয় আকন্দদাসের পূর্বপুরুষের প্রতি রাগ ছিলো, কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ? ওঁর তো ছিলো অঘটনঘটনপটিয়সী প্রতিভা। উনি নইলে সন্ধ্যাতারা উঠতো না, কাননে ফুল ফুটতো না। মৎস্যচক্ষুবিশারদ গাণ্ডবীকে দিয়ে যে সংগান নাচন নাচিয়েছেন তাতে মনে হয় তৃতীয় পাণ্ডব আসলে ছিলেন নৃত্যগীতবিশারদ কাদম্বী। সুতরাং তিনি যদি অনুগ্রহ করে অর্জুনকে মণিপুর-ফেরৎ বাবুরবাজারের রাস্তা ধরিয়ে দিতেন তবে পেটা-লোহা আকন্দদাস নাচগান না বোঝার দায়ে আজ এহেন নাস্তানাবুদ হতো না। সুরূপা না হোক কুরূপা চিত্রাঙ্গদার আসঙ্গ সংলাপের সঙ্গে একটু পরিচয় হতো মুকুন্দদাসের কুরূপ পুত্রের।

কী বলছেন, পাঠক? নাচগানের সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের সম্পর্ক কোথায়? পার্থের সঙ্গে অব্যর্থ সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েই গেছেন। বাকি সব? যদি অনুমতি দেন তবে কবিগুরুর অসম্পূর্ণ কাজ আকন্দিক গবেষণায় সম্পূর্ণ করি।

মনে রাখুন, মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবের চরিতকথা। তারপর ভেবে

দেখুন—ধীর লয় এসেছে কোথা থেকে ? নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠির থেকে। যুদ্ধেও যিনি স্থির থাকতে পারেন, ধীর লয়ে চলাই তাঁর স্বভাব। ভীমপলশ্রীর পিতা নির্ঘাত ভীম। তার জন্ম বোধহয় দক্ষিণভারতে। তাই অধস্তন সন্তান হিসেবে দ্রাবিড়ী রীতি অনুযায়ী নামের দৈর্ঘ্যশ্রী বেড়েছে। নকুল ঘরানার শাহানা বাউল। সহদেবকে ফেলনা ভাববেন না—সঙ্গীতকলায় তাঁর অনবদ্য দান ভৈরব। উনিই তো ভীষ্মদেবকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন দেবমাহাত্ম্যে বিভূষিত করে। আর পঞ্চপাণ্ডবের পাঞ্চালী দ্রৌপদীর গর্ভজাত হচ্ছে দীর্ঘস্থায়িনী ধ্রুপদী। গুণী পাঠক, দুঃশাসন ও সদারঙ্গের রঙ্গপ্রিয়দের কনসাল্ট করলেই জানতে পারবেন দ্রৌপদীর শাড়ি ও ধ্রুপদীর সুরের বিস্তার দুই-ই শেষ হইয়াও না হইল শেষ।

সুতরাং আকন্দদাস যে রাগরাগিণীর দাস হলো না তার জন্য পয়লা দায়ী পর্ববিশারদ বেদব্যাস ও সর্ববিদ্যাবিশারদ সারদাদাস।

এই পর্যন্ত শুনে গৌরীপুর ঘরাণার রণেশ দাস বললেন : গানের গলা সবারই থাকে না। কিন্তু কান থাকলে বুঝতে কষ্ট হয় না। আসলে আপনি জন্মকালা।

আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে স্বীকারোক্তি করলুম : একদম নির্জলা সত্য। যদি শ্রবণেন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয় সজাগ থাকতো তবে চারদিকে যা শুনছি তার ফলে আত্মহত্যা করা বা খুন করা ছাড়া আমার আর উপায় থাকতো না।

যাক্ সে কথা।

গানে আমার অনীহার দ্বিতীয় কারণ ডোয়ার্কিনের সঙ্গে আমার খুড়তুতো ভগ্নী পিয়াললতার অভঙ্গ ষড়যন্ত্র। সে সূর্যোদয়ের আগে থেকে হারমোনিয়াম সহযোগে রোজ গানের সঙ্গে কুন্তিত লুতো- পুষ্প ফোটে কোন্ কুঞ্জবনে। সুরটা সে শিখেছিলো তার এক স্বশিক্ষিত ওস্তাদ মামাতো ভাইয়ের কাছ থেকে। আর স্বশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই যে সুশিক্ষিত, তা হাল আমলের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলেই বোঝা যায়! পিয়াললতার কণ্ঠে ছিলো বাঁশফাটার আওয়াজ। তাতে কোনো আশা-ভৈরবী কিম্বা পিলু বারোঁয়া পেখম মেলতে চাইতো না। একতাল, চৌতাল, ঝাঁপতাল সব তালগুলো পাকিয়ে বেতাল হয়ে যেতো। ওর গলার গরবিনী যদি চলতো পুবে, তবে হারমোনিয়ামের সারেগামা ধ্বনি চলতো পশ্চিমে। সেই দুই ফ্রান্টিয়ারযাত্রী গ্যালপিং এক্সপ্রেসের ঝংকার শুনে নিশ্চয়ই সূর্যদেব অশ্রুতকণ্ঠে বলতেন : ভদ্রে, পুষ্প আর যে বনেই হোক্ পিয়াল বনে কখনো ফুটবে না। কিন্তু ভগ্নী আমার কুছ্ পরোয়া নেহি ভঙ্গিতে পাক্কা তিন ঘণ্টা প্র্যাক্টিস করতো। ঠিকমতো মহড়া না দিলে কনে-দেখা আলোতে সে ফাইন্যাল দৌড় দৌড়োবে কি করে ? পিয়াললতা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো, গান জিনিসটা আসলে নির্জ্ঞান

সাধনা। বোধশক্তির কিছুমাত্র দরকার নেই। কণ্ঠের পেশীশক্তি দেখলেই সুর-সুন্দরী খুশি। এর নির্জলা ফল সঙ্গীতশাস্ত্রে আমার ন্যায্য অনধিকার।

এই অরসিকেষু আকন্দে গানের রসনিবেদন যে ব্যর্থ হয়ে গেলো তাতে সেজদির চড়ের বহরেরও কিছু ভূমিকা আছে। আমার যখন চোদ্দ ওর তখন সাড়ে সতেরো। হঠাৎ দেখা গেলো দিদি আমার গানের কলি নিয়ে রামকেলি শুরু করেছে। উঠতে বসতে খেতে শুতে দুটি শব্দ নিয়ে সুরসহযোগে লোফালুফি করছে : জীবনের তরুশাখে। বাকি কথাগুলি শুনতে পেতুম না কিংবা দিদিভাই ইচ্ছে করেই শেষ করত না।

সেদিন সকালে মেজাজটা ভালো ছিলো। জ্যামিতির সবগুলি একস্ট্রা মিলে গেছে। এমন সময় আবার সেই বহুশ্রুত বাণী। উঠে গিয়ে বললুম : হ্যাঁরে, সেজদি কাকে ডাকছিস্ গাছের ডালে? কাক না কোকিল?

সেজদিকে সেই প্রথম দেখলুম, এক রাগী যুবতী। আমার গালে সজোরে চড় মেরে বললো : অসভ্য ছেলে কোথাকার! লঘুগুরু জ্ঞান নেই।

গালে হাত বুলোতে বুলোতে সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলুম : যে মল্লারেই বৃষ্টি নামুক, যে কেদারাতেই কোকিল বসুক আমি শুকনো রিঠে হয়েই থাকবো। গানের রসে ভিজে ফেনিল হবো না কোনোদিন।

তবে মেজদার চাকুরীর সুবাদে হিজ মাস্টার ভয়েসের উপঢৌকন কলের গান আমাকে দিয়েছে কিছু গীতসুধারস। ভবানী দাসের বন্দেমাতরমের উদারা মুদারা তারা, পঙ্কজ মল্লিক ও কনক দাসের রবীন্দ্রগীতির দখিন হাওয়া, কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠসুধার ধারাবর্ষণ আমার নিস্পৃহতায় ধস নামিয়েছে। মন-কেমন-করার ক্ষণে রেকর্ড চালিয়েছি,—শুনেছি 'তুমি যে গিয়াছ বকুল-বিছানো পথে', 'একদিন যবে গেয়েছিল পাখি ছায়াঘেরা নদীতীরে।' বেতালা মন উতলা হয়েছে সহজ মিষ্টতায়। অনুভব করেছি, আমারো যেন কেউ দাঁড়িয়ে আছে গানের ওপারে। মন তাকে ছুঁই-ছুঁই করতো। কিন্তু গান-উদাসীন আকন্দের গাজন আর বেশি এগোয়নি।

কিন্তু উনপঞ্চাশ বায়ু সগৌরবে পার হয়ে আজ মনে হচ্ছে, সাধের লাউকে যদি সেই কাঁচ বয়সে আর একটু বেশি করে ভালোবাসতুম তবে প্রতিজ্ঞার কাছে এতদিন লয়্যাল থাকতে পারতুম না। ফুলের চাষের চেয়ে সাধের লাউয়ের চাষ আমাদের ওদিকটায় বেশি হতো। সুতরাং ডুগডুগির অভাব হতো না। তবে সাধের লাউ আমাকে রাগী না বৈরাগী বানাতো, তা হলফনামা দিয়ে বলতে পারবো না। সঙ্গীতজগতে লাউ-প্রীতি দেখে আমার ঘোরতর সন্দেহ, নধরকান্তি লাউয়ের কবি বসিরউদ্দিন সাহেব একটু নজর দিলে সঙ্গীতজ্ঞ হতে পারতেন। হায়, রবীন্দ্রনাথ চাঁদের হাসির বাঁধভাঙাই দেখে গেলেন, নরম নরম লাউয়ের মরমকথা শুনে গেলেন না!

নাচের ধাঁচ আকন্দের রোচে না, একথা শুরুতেই বলেছি। তবে মেয়েদের নাচ আমার ভালো লাগলেও পুরুষের নাচ আজো আগুনের আঁচের মতোই অসহ্য মনে হয়। পাঠিকারা অভয় দেনতো কারণটা খুলে বলি। কুমারী কন্যারা নাচেন—নাচতে নাচতে ধরুন লাজরক্ত হৈল কন্যার পেরথম যৌবন। সঙ্গে সঙ্গে অবিবাহিত পুরুষের বুকের রক্তও নাচে। এর পর তিনি তুমি হন। প্রথমের পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে গিয়ে দেখুন—কে নাচে আর কে নাচায়! লাজরক্ত রাগরক্তে পরিণত হয়—তাই বেচারা পুরুষটি তখন নাচেন আর তাকে নাচান রমণীরত্নটি। তাই আপিস কামাই করে 'সেই একদিন যখন নারী ছিলুম'-এর টিকিট কাটতে হয়, একশ' পঞ্চাশ টাকা দিয়ে শাড়ি কিনে বাড়ি এসে বলতে হয় চল্লিশ, বাহাত্তর টাকা কেজির চিংড়ি ঝুলিয়ে জামাইষষ্ঠীতে ছুটতে হয়। তাই পুরুষরা যখন স্টেজে উঠে নাচেন, তখন আমার খুব খারাপ লাগে। সংসার-মঞ্চে নিত্যকার নাচই তো আছে, আবার কেন? তা ব্যক্তিটি নটরাজ শঙ্কর বা উদয়শঙ্কর, কেলুচরণ নায়ার বা তিরুপতি আয়েঙ্গার যিনিই হোন না কেন?

এসব আমার আজকের কথা। বাল্যশিক্ষার সংস্কৃতিতে নাচ ও গানকে তেমন করে না পাওয়ার বেদনা থেকে যে হাসি-মস্করা করলুম, তার জন্য অপরাধ নেবেন না পাঠক। আমার কাঁচা সংস্কৃতির ফাঁক ও ফাঁকিটুকু একটু হাসি মিশিয়ে আপনাদের কাছে তুলে ধরলুম। কী পেয়েছি কী পাইনি আজ যে আকন্দদাস তারই হিসেব কষতে বসেছে। তার বুকের প্রচ্ছন্ন ব্যথার কোনো আভাসই কি আপনি পেলেন না পাঠক?

নাচ-গানের কথা থাক্। এবার নাটকের কথায় আসি। পাঠক, আপনি শেক্সপীয়ারী ঢংয়ে বলতে পারেন—সমস্ত জীবনটাই তো একটা নাটক, আসমুদ্র পৃথিবীটাইতো রঙ্গমঞ্চ। সুতরাং আলাদা করে আবার নাটকের কথা কেন? ঠিক ঠিক, হাল সন অবধি অভিনয়তো মন্দ করলুম না! আর ভূমিকাও কত বিচিত্র! শাজাহান হয়েছি, ফলস্টাফ হয়েছি, চাণক্য হয়েছি, শাইলক হয়েছি, বিদ্যাসাগর হয়েছি নিতাই কবিয়াল হয়েছি, এবং ইন্দ্রজিৎ হয়েছি। তবে সবচেয়ে সার্থক অভিনয় আমার হাজব্যান্ড ও ভ্যাগাবন্ডের ভূমিকায়। তালি-দেওয়া পোশাকে হাততালির শিলাবৃষ্টি উপভোগ করেছি বারবার। আট হাজার রজনী চলছে চলবের শিরোপাটি ঘাপটি মেরে বসে আছে আমার বসার ঘরে দুর্লভ কিওরিও হিসেবে।

এই বছর দুয়েক আগেকার কথা। ছেলে এসে বললো: বাবা, মর্নিং শো'তে দ্য সাউন্ড অব মিউজিক দেখতে যাবো।

—হপ্তাখানেক আগে জুলিয়াস সীজার দেখেছিস্ না?

—হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে? ক্লাশের সব ছেলের দেখা হয়ে গেছে। আমি দেখবো না?

—ছাত্রাবস্থায় এত সিনেমা দেখা কি ভালো ?

—তোমার সব কিছুতেই শুধু না আর না। বন্ধুরা বলে, তোর বাবা বড্ড কন্‌জারভেটিভ।

—আমাদের আমলে—

ছেলে বাক্যটি শেষ করতে দিলো না। তুখোড় সাঁতারুর মতো ডাইভ মেরে বললো : তোমার কালে যা হতো আমাকে তা-ই করতে হবে ? যুগ পাল্টে গেছে। এখনকার আমাকে এখনকার মতো চলতে দেবে না ?

—তাছাড়া পয়সা—

—তোমার ওটা বুলি হয়ে গেছে, বাবা। তোমার বাবার পয়সা ছিলো না, তাই কিছু করতে পারোনি। আমার বাবা তো আর তোমার বাবার মতো গরিব নয়।

ছেলে তার মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সিনেমা দেখতে চলে গেলো।

আমি বসে বসে ভাবলুম। ছেলে কিছু ভুল বলেছে কি ? মুকুন্দদাসের ছেলের কপাল ছিলো মন্দ, তাই ভালোমন্দ কিছু খেতে পায়নি। কি পেটের খাদ্য, কি মনের খাদ্য ! কিন্তু তার জন্য আকন্দদাসের ছেলে পুষ্পেন্দুদাস ভুগবে কেন ? সে দু'হাতে লুটে বেড়াবে গন্ধসার। একাল তো আর সেকাল নয়। এখন সংস্কৃতির মা-ঠাকরুন আসেন গাঁদা ফুলের মালা পরে নয়, টুনি বালবের চাঁদমালা পরে।

ফ্ল্যাশব্যাক্।

ভাদ্রমাসের তালপাকা গরম চলছিলো কয়েকদিন ধরে। আজ ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টি। হঠাৎ হেডস্যারের কাছ থেকে একটা স্লিপ এলো। সীতানাথবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : আকন্দ, আজ তোর ছুটি। চলে যা। বাইরে তোর দাদা অনিন্দ্য দাঁড়িয়ে আছে।

মনটা কেমন করে উঠলো। আসার সময় দেখে এসেছি মায়ের লিভারের ব্যাথাটা বেড়েছে। তাঁর কিছু হয়নি তো ?

ফুলদা বললেন : চল্, শহরে যাবো।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, ঝাউতলার সামনে খালের ধারে লগিতে চৌধুরীদের নতুন নৌকোটি বাঁধা। তাতে বামাকণ্ঠের অবিশ্রান্ত কলকলানি।

গলুই পেরিয়ে ছইয়ের ভেতরে ঢুকতেই বৌ ঝিদের বহুস্বরা অভ্যর্থনা। সবাই এক সঙ্গে কথা বলতে চায়। মিনিট দুয়েক নিঃশব্দ প্রতীক্ষার পর সমবেত কণ্ঠনিনাদ থেকে যা উদ্ধার করা গেলো তা হচ্ছে : আমরা শহরে টকি দেখতে যাচ্ছি।

হাটের দিনে টী এক্সপানসান্ বোর্ডের প্রচারচিত্র দেখেছি। দেখেছি পাট চাষের সচিত্র ইতিহাস—বীজ বোনা থেকে কেনাবেচা পর্যন্ত ধারাবাহিক ছবি। কিন্তু সে-সবই সাইলেণ্ট পিক্‌চার। টকি বস্তুটা কী, তা টফির মতো আস্বাদ্য

কিনা, তখনো জানি না। সুতরাং জমিদার ও জামাইকুলের প্রমীলাবাহিনীর মতো ঠিক টকির সম্মোহিনী আকর্ষণ অনুভব করলুম না। তাছাড়া সীতানাথবাবু লিজেন্ডস অব গ্রীস এন্ড রোমের শেষ অধ্যায়ে বিচরণ করছেন। ম্যাট্রিকের বছরে টকির আর্কটিকে ঘুরে বেড়ানো কি ঠিক?

তাকিয়ে দেখলুম কেউ বাদ পড়েননি—কনকবৌদি, নতুনবৌদিরা, মেজদি, —সেজদি, ছোড়দি, পিয়াললতা, এমন কি পুনর্মুষিক নন্দদি পর্যন্ত। শহরে বিদ্যুতের শুভাগমনের প্রথম 'অবদান' টকি শো হাউস ছায়ানট ও চিত্রলেখা। প্রলম্বিত খাল ও ডাকাতিয়ার হাঁসুলিবাঁক পেরিয়ে যখন ছায়ানটে পৌঁছোলুম, তখন বিকেলের শো শুরু হতে আর দশ মিনিট বাকি। তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে ঢুকে পড়লুম। বইয়ের নাম 'মায়া'। পুরনো বই। স্মৃতির অতলে ডুব দিয়েও মনে করতে পারছি না গল্পটা কী ছিলো। শুধু মনে পড়ছে যমুনা দেবী ছিলেন নায়িকা।

প্রথম শো-এর পর দ্বিতীয় শো চিত্রলেখায়। সময় হাতে নেই। কুমড়োর ছক্কা দিয়ে হাতরুটি খেয়ে নিলুম দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে। বৌদিরা খেলেন না কিছু, তাঁদের শিবরাত্তির করার অভ্যেস আছে। টকির নাম বিদ্যাপতি। এর গল্পটা স্পষ্ট মনে পড়ছে। ছিলেন কাননবালা, ছায়াদেবী, পাহাড়ী সান্যাল। ঠিক বলছি তো, সতর্ক পাঠক? একেবারে মশগুল হয়ে দেখলুম বইটা। চৌঘুড়ি করে চলেছেন বিদ্যাপতি ঠাকুর। ঘাঘরা পরে ছুটতে ছুটতে এলো একটি আশ্চর্য-সুন্দর প্রায়-যুবতী মেয়ে। মৃদুকণ্ঠে শুধোলো: বিদ্যাপতি ঠাকুর, ভালোবাসা কি পাপ? দৃশ্যটি দেখে সেদিনের কিশোরমনে সে কী মধুর দোলা লেগেছিলো! মাসখানেক ধরে গানের কলির মতো মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে একটি ভুলতে না-পারা সংলাপ: বিদ্যাপতি ঠাকুর, ভালোবাসা কি পাপ? আর ভুলতে পারিনি সংলাপের আলাপী কাননবালাকে।

এখানে চুপি চুপি পাঠককে একটা কথা বলে রাখি। সেদিন গরচা লেনে মামাশ্বশুরবাড়িতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। পাশেই গাড়ি থেকে নামলেন এক প্রায়-বৃদ্ধা। মোটা শরীর, মোটা চশমা, পাকা চুল। মুখের দিকে দৃষ্টি দিতেই মনে হলো: যেন চিনি গো চিনি। শ্যালিকা মিতু বললো: ওই তো নাবলেন কাননদেবী।

চমকে উঠলুম। অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানে একই ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে এক প্রায়-যুবতী। বাইরে তাকিয়ে দেখি সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এক প্রায় বৃদ্ধা দুজনে কি এক? মিতুকে সে কথা বলতেই বললো: নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছো?

সত্যিই তো!

ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে চলে গেলুম। বড়ো আয়নায় তাকিয়ে দেখলুম:

একটি পঞ্চাশ-উত্তীর্ণ মানুষের মুখ। মাথা ভর্তি একদম পাকা চুল। কোথায় গেলো সেই হ্যাফ-প্যান্ট পরা-আকন্দদাস নামে ছেলেটি? হায়রে, গঙ্গায় এরই মধ্যে অনেক জল বয়ে গেছে!

শুধু ছেলেকে মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে: তোর জুলিয়াস সীজার ও সাউন্ড অব মিউজিক তোকে যা দিয়েছে, আমার মায়া ও বিদ্যাপতি আমাকে তার চেয়ে কম দেয়নি। সত্য বটে, আকন্দ গরিবের ছেলেকে নিয়ে বড়ো বেশি লুকোচুরি খেলে। কিন্তু যখন ধরা দেয় তখন গরিব-বড়লোক বাছবিচার করে না। একেবারে নিঃশেষে উজাড় করে দেয়। শুধু তাকে ধরবার জন্য একটা তাজা মন থাকা চাই। ভগবান মুকুন্দদাসের ছেলেকে অনেক কিছুই দেননি—না রূপ, না গুণ—কিন্তু একটা তাজা মন দিয়েছিলেন। সেটা আজ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলেও একদিন ছিলো কচি ঘাসের মতো।

দেখুন, পাঠক, ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে নিলুম। তবে ভরসার কথা, আজকের এক্সপেরিমেন্টাল শিল্পের যুগে নাটকেরও কোনো নির্দিষ্ট ফ্রন্টিয়ার নেই। মেলোড্রামা থেকে অ্যাবসার্ড, নায়িকা সংবাদ থেকে মারীচ সংবাদ, একাঙ্ক থেকে দশরূপক, অ্যাকসান থেকে সাবকনশাস সব সহযোগিতার সঙ্গে সহাবস্থান করছে। এমন কি যাত্রারও মাত্রাবিচার চলছে। চ্যাপলিনের কোনো উত্তরসূরি যেদিন মার্ক্সের ক্যাপিটাল নিয়ে বই করবেন সেদিন দেখবেন চিৎপুর তার ফতেপুর হয়ে উঠেছে। সুতরাং নাট্যশিল্পে সিনেমাশিল্পে কোনো দূরপাল্লার দৌড় নেই।

আমার কৈশোরক বিলিবন্দেজে একটি বাৎসরিক উৎসবের প্রীতিভোজ ছিলো। তার নাম বিজয়া সম্মিলনী। কোনো এক সময় বিবাদী বয়স্কদের মারুতি-মারে তা বাঙালীর যৌথ ব্যবসায়ের মতো দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো—একটি আদি গঙ্গা বিজয়া সম্মিলনী, অন্যটি কাটা গঙ্গা হিতকরী সভা। কিন্তু উৎসবের সতীদেহ জরাসন্ধের দশাপ্রাপ্ত হলেও আমার মতো ছোটোদের আনন্দ-জননী ভাগের মা হয়ে রইলেন না। বড়োদের নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে আমরা কনিষ্ঠরা মধুমত্ত ভৃঙ্গের মতো দুই মহলেই হামেশা হামলা করেছি। কারণ বিজয়া-উৎসব হচ্ছে ছোটদের পক্ষে দড়িছেঁড়ার কাল। অন্যের কথা ঠিক বলতে পারবো না, আমি নিজে আকণ্ঠ সুধা পান করেছি উৎসবের দিনগুলিতে।

যে যেমন খুশি সাজো। বেশ মজার খেলা। প্রীতীশ ওস্তাদ খেলুড়ে। বরাবর প্রথম। কিন্তু সেবার দুপুর থেকে ওর দেখা নেই। বিকেল পাঁচটায় প্রতিযোগিতা শুরু হবে। আমরা সবাই জড়ো হয়েছি ফুটবল মাঠে। একজন হয়েছে থুড়থুড়ে বুড়ি। চিনতে পারলুম না। আর একজন স্বামীজি। তোড়ে ইংরেজী বক্তৃতা করছে—ব্রাদার্স এ্যান্ড সিস্টার্স অব আমেরিকা। শিকাগো বক্তৃতাটা ঝাড়া মুখস্থ করে এসেছে। বুঝলুম গেরুয়ার আড়ালে নিরাময় সরকার। তন্ময় হয়ে দেখছি এমন সময় সেই অঘটনটা ঘটলো।

গালে চড় খেয়ে তাকিয়ে দেখলুম গোলপণ্ডিত। চোখ পাকিয়ে বললেন: আজ বাদে কাল ফাইন্যাল পরীক্ষা। এখানে বসে বসে ইয়ার্কি হচ্ছে?

আমি কাঁদো-কাঁদো সুরে বললুম: স্যার, রোজই তো সকালে পড়ছি।

—বলো, হন্ ধাতু লোট+হি কি হয়?

—জহি।

—বেশ। এবার বলো: শ্লোকটার মানে কি?

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্র প্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

—হাতে লীলাকমল, অলকে—। স্যার, আর বলতে পারবো না।

গোলপণ্ডিত কান মলে দিয়ে বললেন: পারবো না, স্যার! ফার্স্টো বয়! কাল থেকে লাস্ট বেঞ্চিতে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমার অর্ডার।

বলে চটি খট্‌খট্ করতে করতে চলে গেলেন। সদা হাস্যময় গোলপণ্ডিত তো এমন ছিলেন না! হঠাৎ আজ কড়া মেজাজ দেখালেন কেন?

প্রতিযোগিতা কিছুক্ষণ পরে শেষ হলো। চোঙে ঘোষণা করা হলো: প্রথম হয়েছেন প্রীতীশ চৌধুরী। গোলপণ্ডিতের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় অনবদ্য। তবে তার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন আকন্দদাস। প্রীতীশ চৌধুরীর ইচ্ছা অনুসারে তাকে আকন্দদাসের সঙ্গে যুগ্মবিজয়ী বলে ঘোষণা করা হলো।

আমার আনন্দ আর তখন ধরে না। ছুটে গিয়ে জাড়িয়ে ধরে বললুম: হ্যাঁরে, প্রীতীশ, শ্লোকটা মুখস্থ করলি কখন?

—দুপুরে সুপুরি বাগানে বসে। পাক্কা দু' ঘণ্টা সময় লেগেছে। বাব্বাঃ, একী আমার কম্ম! একটা খটোমটো সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করার চেয়ে চারটে আস্ত সুপুরি খাওয়া সহজ। আমার পুরো পাঁচটা লেগেছে।

এতো গেলো নাট্যাভিনয়ের মিনি-সংস্করণ।

ম্যাক্সিতো একটা দুটো নয়, কম পক্ষে গোটা পাঁচেক স্মৃতির ধড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টার কথা বলবো? সবগুলিই যে চেকনাই।

বহরাদিয়ার নবনী ঘোষ, পুকুরদিয়ার বনমালী দত্ত, সপ্তকাঠির মনোতোষ আর প্রীতীশ চৌধুরী, আড়কাঠির নবকুমার রায়, কামানকাটির আলীবাদি খাঁ, খৈসাদীর খুদু মিঞা আর খলিসাডুগির বৈরাগী দাস—এঁরা সবতো ছিলেন কুষি আমের মতো সুস্বাদু কুশীলব। স্টেজ ছিলো ওদের সহজ বিচরণস্থল। কথা ছিলো ডালভাত। নাটকে যা আছে এবং যা নেই তা তাৎক্ষণিক উচ্চারণে

এত স্বাভাবিক হয়ে উঠতো যে, আমার মতো বালখিল্যদের মনোহরণে বিলম্ব হতো না। আমরা ঘটি ঘটি রস আহরণ করেছি অনায়াসে।

নবনী ঘোষ সীন আঁকা থেকে অডিটোরিয়ম ঢাকা পর্যন্ত সব কাজে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নাটুকে রামনারায়ণকে দেখিনি, দেখেছি নাটুকে নবনী ঘোষ ও বনমালী দত্তকে। ওঁরা ছিলেন বাবুরবাজার অঞ্চলের শিশির ভাদুড়ী ও নরেশ মিত্র। বাড়াবাড়ি করছি, না পাঠক? গ্রামজীবনের রামায়ণে ওই নটযুগলের ভূমিকা ছিলো রাম-লক্ষ্মণের মতো। তবে বিশ্বাস করুন, আপনাদের স্টারের এক্সপ্রেসো কফির ফেনার চেয়ে আকন্দদাসের বাক্যস্রোতের ফেনা বেশি নয়।

আমি কাব্যে যেমন আখ্যাত হয়েছিলুম কপি বলে, তেমনি নাট্যেও প্রখ্যাত হয়েছিলুম কপি বলে। সর্বসাকুল্যে একটি মাত্র সংলাপ ছিলো সরমা নাটকের বানর সৈন্যের 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী হে।' মনে আছে, সংলাপ শেষে প্রীতীশ ও বরুণ এমন জোরে হাততালি দিয়েছিলো যে আমিও মনে মনে প্রার্থনা করেছিলুম: মা, ধরণী, দ্বিধা হও। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এই আমার প্রথম ও শেষ পিলে-চমকানো অভিনয়।

বাবুরবাজারের কালুকাকা খুবসুরত মন্দা-নুরজাহান। রাজপুত্রের ভূমিকায় তাঁর চেহারা ছিলো মানানসই। কিন্তু মঞ্চে উঠলেই তাঁর কণ্ঠ-মালঞ্চ শুকিয়ে যেতো, পদযুগল কাঁপতে শুরু করতো বাণবিদ্ধ হরিয়ালের মতো। একবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে আনা হলো নাট্যাভিনয়ের কসাইখানায় জবাই করার জন্য। তিনি নবনী ঘোষের প্যায়ে বহু নবনী মাখিয়ে রাজপুত্রের বেত্রকণ্টক থেকে রেহাই পেলেন, তিত মুখে ভগ্নদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে রাজি হলেন। লোকমুখে শোনা গেলো, বারদশেক তাঁর একক সংলাপটি বনমালীবাবুর কাছে রিহার্সেল দিয়েও তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করছেন না। রায়খুড়ি বাড়ির পোড়ো ভিটেয় অহোরাত্র বিড়বিড় করে দুষ্পাচ্য ডায়লগটি আত্মস্থ করার চেষ্টা করছেন। সেই দুরূহ নাট্যাংশটি এই রকম:

রাজা। কী সংবাদ, ভগ্নদূত?

ভগ্নদূত। মহারাজ, আমি দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি। সেনাপতি নিহত।

নির্দিষ্ট দিনে অভিনয় শুরু হলো। কালুকাকার অভিনয় দেখার জন্য অনেকেই উদগ্রীব হয়ে আছেন। আমি প্রম্টার। রাজা সিংহাসনে বসে আছেন রাজকীয় ভঙ্গিতে। ড্রপসীন উঠলো। আমি যে ধারে উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান দিয়ে ভগ্নদূত ওরফে কালুকাকা ঢুকলেন। রাজা তাকে ঢুকতে দেখেই বললেন নিজের সংলাপটি। আমি প্রম্ট্ করার আগেই কালু-কাকা বলে উঠলেন: 'মহারাজ, আমি নিহত'। মাঝখানের শব্দগুলি বেমালুম লোপাট হয়ে গেছে।

আমি হতভম্ব। এর পর কী প্রম্‌ট্‌ করবো বুঝতে পারছি না। বাইরে অডিটোরিয়ামে তখন হাসির হুল্লোড়। কাল্লুকাকা ততক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। ফলে গোঁ গোঁ শব্দে পতন ও মূর্চ্ছা! দড়িটা ছিলো খুদু মিঞার হাতে। তিনি ড্রপসীন ফেলে দিলেন। রাজবেশী বনমালীবাবু চোঙায় ঘোষণা করলেন: ভগ্নদূতের অকস্মাৎ হার্ট অ্যাটাক্‌ হয়েছে। এর ওপর কারো কোনো হাত নেই। আপনারা শান্ত হয়ে অপেক্ষা করুন। এক্ষুণি ড্রপসীন উঠবে।

পাঠক, কাল্লুকাকার হার্ট-অ্যাটাকের কারসাজি আপনি দেখলেন, এবার দেখুন নবনীদার হিট্‌-নাটকের ভোজবাজি। বইটার নাম মনে পড়ছে 'সিন্ধু-গৌরব'। পাত্র-পাত্রীর নাম ধাম গোত্রগোষ্ঠী জিজ্ঞেস করে আপনার সঙ্গে আমার হার্দিক সম্পর্কটা হালুইকরের বিনা-চিনি হালুয়ার মতো বিস্বাদ করে তুলবেন না। তবে স্মৃতি যদি রাধাবিনোদিনীর মতো যমুনাপুলিন-সন্ধানী না হোন তবে কতকটা নির্ভয়ে বলতে পারি, ওতে বোধহয় রাজা হাম্বিরের মুখে হাম্বির রাগিণী শুনেছি। অবশ্য হাম্বিরই হোন আর আলমগীরই হোন আমার কথকতার কোনো হেরফের ঘটবে না। দৃশ্যে ছিলেন পিতা-পুত্র। নবনীদা পিতৃত্বের অধিকার নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ। অভিনয় চলছে।

পুত্র। পিতা, যুদ্ধ জয় হয়েছে মোদের,
পলায়িত শত্রু-সৈন্য নিশীথের ঘন অন্ধকারে।
পিতা। আশ্চর্য হইনু বৎস, বীরত্বে তোমার!
এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে আক্রমণ করিলে ওই শত্রুসেনা দলে?

বল্‌তে বল্‌তে তিনি অন্য উইংসে চলে গেছেন। সেদিকের প্রম্‌টার একেবারে হতবাক্‌। অনর্গল বলে চলেছেন নবনীদা যা বইতে নেই। তিনি বল্‌ছেন:

দ্রোণাচার্য দিয়েছিল বিদ্যা অর্জুনেরে
সর্ববিধ, মৎসচক্ষু বিঁধিবার অদ্ভুত কৌশল
শেখায়ে দেছেন তারে বহু যত্ন করি।
গাণ্ডীবীর ধনুর্বিদ্যা গুরুপদে নিত্য নমস্কার।
আমিও দিয়েছি তোমা রণবিদ্যা তীব্র ভয়ঙ্করী।

স্বরচিত এই অংশটি উপস্থিত মতো রচনা ও আবৃত্তি করতে করতে নবনীদা আবার আমার দিকে চলে এলেন। আমি ধরিয়ে দিলুম বাকি অংশটুকু:

বুঝিলাম এতদিনে শিক্ষা মোর হয়নি নিষ্ফল।

তখন পুত্রের ডায়লগ চল্‌ছে। দাদা নিম্নকণ্ঠে আমাকে বললেন: ব্যস্ত হোস্‌ না, আকন্দ! আমি ঠিক সময়ে তোকে ক্যাচ্‌ করে নেবো।

নবনীদার এই নট-নৈপুণ্যের কথা বলতে গিয়ে বনমালীদার বুদ্ধি-চাতুর্যের কথা ভুললে চল্‌বে না। যোগেশ চৌধুরীর সীতা। প্রসঙ্গ শম্বুকবধ।

রামের ভূমিকায় যিনি, কিছুতেই তাঁর মারছে না। বোধহয় ডিরেক্‌শান ভুলে গেছেন। শম্বুকরূপী বনমালীদা স্টেজের ওপর শুয়ে পড়লেন। সাধারণ দর্শকরা বিভ্রান্ত, স্বয়ং রামচন্দ্র হতচকিত। কিছুক্ষণ পর তিনি ধীরে ধীরে উঠে বসলেন ও দাঁড়ালেন : তার পর কাঁপানো গলায় স্বরচিত সংলাপের আলাপ শোনালেন :

মূর্চ্ছামাত্র গিয়েছিনু হেরি তব তূণ,
ওহে অযোধ্যা-নন্দন, হানো বাণ,
মরি এইবার।

শ্রীমান্ রামচন্দ্রের তখন মনে পড়লো, তাঁকে বাণ ছুঁড়তে হবে। তিনি যথা-কর্তব্য করলেন এবং শম্বুকবধ হলো। শুধু আহাম্মক দর্শকরা বুঝতে পারলো না, বিগত দু'এক মিনিটের মধ্যে বনমালীদা উপস্থিত বুদ্ধির বলে শম্বুকবধের বদলে সীতাবধকে কেমনভাবে রুখে দিলেন।

জানি, পাঠক, জানি। আপনি হাসছেন না। আপনি গদি-আঁটা চেয়ারে বসে এয়ারকণ্ডিসনড্ হতে হতে রাত্রির রেলগাড়িতে চৌকো আলোর তাপসী খেলা দেখেছেন। কয়লাখাদে জলকল্লোল শুনে উৎপলের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। রুদ্র রোদে ফুটবলের প্রসাদে পেয়েছেন সরবতের আরাম। ক্যাবারে ডান্সের হংসলীলায় আস্বাদন করেছেন রাসবিহারীর বৃন্দাবনী পালার মধু। বাবুরবাজারের বাজারে নাটুকেপনায় আপনার মন ভরবে কেন ? তবে অনুরোধ করছি, অধম আকন্দকে পেয়ার করে বছর চল্লিশেক পেছিয়ে গিয়ে পোকা-আকীর্ণ হ্যাজাকের পাশে ছেঁড়া শতরঞ্জিতে একটু বসুন এবং শেয়াল-ডাকা অন্ধকারে মশার কামড় খেতে খেতে অপেক্ষা করুন। তবে দোহাই আপনার, চল্লিশ বছর আগেকার মনটা সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ক্লাশরুমের নড়বড়ে প্ল্যাটফর্মে তৈরি মঞ্চ ও আনাড়ী হাতের আঁকা দৃশ্যসজ্জার মাঝখানে অভিনয় নামে যে হাতুড়ে শতরঞ্জ খেলা চল্‌বে তাতে আপনার মনের পদ্মপাতা আমারই মতো ভরে উঠবে। আর যদি আপনি বয়সে নাগাল না পান (অনেকেই পাবেন না, জানি) এবং হালফিল পরিবেষিত কৃষ্টির কেতায় আপনি দুরস্ত হয়ে থাকেন তবে লিখে রাখুন, আপনার ক্ষীরসমুদ্রে একফোঁটা দিলুম শিশির।

অতএব আমার কথা ফুরোলো। গান, নাচ, নাটকের নটেশাকটি মুড়োলো।

● ●

ডাক্তারিশাস্ত্রে এখন একটা নতুন শব্দ উঠেছে। এলার্জি'। বারোমেসে সর্দি' আপনার! সিলিন থেকে পেনিসিলিন খেলেন গাদা গাদা। ভিটামিন সি ইনজেক্‌সান নিলেন গোটা দশেক। কিন্তু সর্দি' সুরাবর্দি'র মতো গদি ছাড়তে চাইবে না। আপনি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন : ডাক্তারবাবু, আমার কী অসুখ? তিনি নির্বিকার উত্তর দেবেন, এলার্জি'। আপনার মাঝে মাঝে হাঁপের মতো হয়। সিলিন তো আছেই, তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন বেনাসাইড ফোর্ট। বাড়াবাড়ি হলে পেরিয়াক্‌টিন্‌ খেয়ে ঘুমিয়ে থাকলেন। মনে রাখবেন, ফিজিসিয়ান ফতোয়া দিয়েছেন আপনার অ্যাজ্‌মায় মদত দিচ্ছে আর কিছু নয়, এলার্জি'। অসুখ যখন সুখ দিচ্ছে না এবং অসুখের কল যখন ঠিক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন হাতের ভাঁজ খুলবেন ডাক্তারবাবু—রেসিপিতে লিখে রাখবেন এলার্জি'। রোগটি মানুষকে ভোগাচ্ছে, কিন্তু বাঁচিয়ে দিচ্ছে ফিজিসিয়ানকে। এলার্জি' একই সঙ্গে রুগী-ভোগানী ও ডাক্তার তারণী।

কিসে এলার্জি' হয় না, জ্ঞানী পাঠক, বলতে পারেন? চিংড়িতো এলার্জি'র তিংড়ি নাচন নাচায়। ডিমে তা দিন্‌ ক্ষতি নেই, কিন্তু খবরদার খাবেন না। আপনার গায়ে ফুটে উঠবে এলার্জি'র দাগড়া দাগড়া ডিম। বেগুন, ঢ্যাঁড়শ, আনারস, টম্যাটো খাচ্ছেন? নিশ্চিন্ত থাকুন, এলার্জি' সুন্দরী যথেষ্ট এনার্জি' নিয়ে টম্‌টমে চড়ে আপনার ভিটামিনচর্চি'ত সবল শরীরে স্থায়িভাবে বসবাস করতে ছুটে আসবেন। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন যদি আপনার মনস্কামনা হয়ে থাকে তবে সেভেন জিরো সেভেন চড়ে আপনাকে পাঁচ হাজার ফুট ওপর দিয়ে এভারেস্টের চূড়োয় চলে যেতে হবে। কারণ ওখানে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধূলিসাৎ ধুন্ধুমার ও বাস-লরির ধূম্রলোচন এক্সহস্‌টের ধারাপাত নেই। লেন-বাইলেনও জ্বালামুখী আথাসথী ধোঁয়াবাহিনী নিয়ে আপনার নাসিকাদেশ আক্রমণ করে বসবে। সুতরাং হ্যাঁচর হ্যাঁচর শব্দে এলার্জি'র মর্জি' টের পাবেন উঠ্‌তে বস্‌তে। পালাবেন কোথায়?

আমারও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো এলার্জি'র জগঝম্প আছে। যুবক পাঠক ও যুবতী পাঠিকা, আমার সরল জবানবন্দীতে আপনারা অনুগ্রহ করে নাসিকা কুঞ্চন বা নর্তন-কুর্দন করবেন না। জানি, আপনারা আছেন খোলা আকাশের নীচে, পারমিসিভ সোসাইটির জেটিতে। কিন্তু আজকের চাল্‌সে চোখ নিয়েও দেখতে পাচ্ছি, আমি এবং আরো অনেকে চল্লিশ বছর আগে ছিলুম শামুকের খোলসের ভাঁজে। আমার ওপর আপনাদের অনুরাগ যদি নাও হয়, রাগ যেন না হয়। মনে রাখবেন, ধানের খেতে বেগুন হয় না।

আরূঢ় ভণিতা থাক্, সরল সত্যের পলিতাটি জ্বালাই। চিংড়ি নয়, ডিম নয়, বেগুন নয়—কপাল-বেগুণ্যে আমার এলার্জি অষ্টাদশ সংখ্যাটি নিয়ে। সমস্ত শুনে আপনার যদি মনে হয়—আমি শুচিবাইয়ের কথা বলছি—আপত্তি করবো না। অবশ্য আকন্দদাসের গবেষণালব্ধ মত হচ্ছে, শুচিবাইয়ের চেয়ে বড়ো এলার্জি আর কিছু নেই এবং সেই দুরারোগ্য ব্যাধির মূলে আছেন জলাবতার নারায়ণ। জল ছাড়া জীব বাঁচে না। অতএব জলঘটিত শুচিবাই ওরফে এলার্জি জীবনের জন্মসঙ্গী। কী, পাঠক-পাঠিকা, অবাক হচ্ছেন? সংখ্যাটি অশুভ তের বা সাড়ে চুয়াত্তর হলে আপনারা বুঝতে পারতেন। কিন্তু আঠারো? আপনারা ধাঁধায় পড়েছেন নিশ্চয়ই।

না, ব্যাপারটা খুলেই বলি। তবে মোগলাই পরোটার কথা বলতে গিয়ে যদি মোগল সম্রাট থেকে শুরু করি, তবে রাগ করবেন না তো? কী করি বলুন, নিখাদ বঙ্গসন্তান আপনাদের এই আকন্দদাস!

আকন্দদাসের বংশানুক্রমিক শত্তুর বেদব্যাস ওই অত বড়ো একটা কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে তুললেন—কী কাণ্ডটাই না ঘটলো! তার আয়ুষ্কাল কতদিন জানেন? আঠারো দিন।

ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করুন—অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার খিলজী জয় করেছিলেন গৌড়বঙ্গ। ফ্যাসীবাদী হিটলার ফ্রান্স পুরোপুরি দখল করেছিলেন মাত্র আঠারো দিনে—যদি পেত্যয় না হয়, তবে মর্শাল পেত্যাঁকে প্লানশেটে ডেকে শুধিয়ে নিন্। বাঙালীমাত্রই কর্মবীর—কারণ স্মরণাতীত কাল থেকে তার বারো মাসে নয়, আঠারো মাসে বছর। আর আঠারো বসন্তের দাপট কতখানি কালিদাস কাব্যাচার্য থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য পর্যন্ত সকল ধীমান্ সে-বিষয়ে আপনাদের সাবধান করে দিয়েছেন। শ্রীমতী শকুন্তলা যেভাবে দুষ্মন্তের গায়ে আঠার মতো লেগেছিলেন তাতে তার বয়স নির্ঘাৎ ছিলো আঠারো। আর এত বড়োরকমের যে একটা গৃহদাহ হয়ে গেলো তার চকমকি অচলার বয়স কত ছিলো জানেন? শরৎবাবু ভদ্রতা করে বলেছেন সতেরো-আঠারো। আসলে ওই সতেরোটা হচ্ছে পাহারাদার সাঁজোয়া গাড়ি। আঠারোটাই পুষ্পধনুর শরনিক্ষেপের প্রথম পদক্ষেপ। সবচেয়ে হক্ কথা, দুনিয়াটাই একটা বড়ো চিড়িয়াখানা। আর সেই চিড়িয়াখানার চিত্রল থেকে রয়েল যে-কোনো বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা।

এতক্ষণ আঠারোর বসন্ত-পিঠ দেখলেন, এবার তার অশান্ত-পিঠ দেখুন। ঘাই-হরিণের ডাক শুনলেই তো চলবে না, কিরণ-কাঁটার খোঁচাও খেতে হবে।

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।...

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে ॥

আকন্দদাসের সমবয়সী সুকান্ত ক্ষণজন্মা পুরুষ। ওঁর জীবনেও বসন্ত এসেছিলো। কিন্তু অস্ফুট স্বপ্নের ফুলগুলিকে তিনি নিষ্ঠুর প্রগল্ভ হতাশায় ঝরতে দিলেন, উড়তে দিলেন বসন্তের পাখিগুলিকে। ওঁর বুকের পাঁজরা ঝাঁজরা হলে কী হবে, বাসন্তীমরণে মরেন নি তিনি, মরেছেন রক্তদানের পুণ্য নিয়ে। কিন্তু আমার বুকের পাটা আটাশ, মনের পাটা চোদ্দ। এ-নিয়ে আর যা-ই হোক্ বিস্ফোরণের বড়াই করা যায় না, লড়াই করা যায় না তুফানের সঙ্গে। বড়জোর স্বপ্নসম্ভব চম্‌চম্ খাওয়া যায়। তাই তো এই কড়চায় কোথাও শোনাইনি কী হয়েছির বেফায়দা ফিরিস্তি। শুধু শুরুতে বলেছি কী হতে পারতুম তারই উত্তরাশা বৃত্তান্ত। অতএব, সহিষ্ণু পাঠক-পাঠিকা, আপনারা এই কিস্তিতে আশা করবেন না সুকান্ত-প্যাটার্নের আঠারো কাস্তের আস্ফালন। পাবেন শুধু আকন্দ-প্যাটার্নের আঠারো বসন্তের আহ্বান। এবং সে-কারণেই তার আঠারোয় এঁটেল এলার্জি।

প্রথমেই মনে পড়ছে সাহেবকাকা ও মেমকাকীমার কথা। কাকা আজ নেই, কাকীমা আছেন। তাঁর জীবনের আঠারো বছর আজ আশির কোঠায় পেঁৗচেছে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, প্রথম যৌবনের দুঃসাহসের দিনগুলি কি তাঁর মনে আছে? কিন্তু সেই শোনা-কাহিনী চোদ্দ বছর থেকে আকন্দ দাসের মনে জলের মতো ঘুরে ঘুরে কথা কয়।

আজ থেকে পঁয়ষট্টি বছর আগে একটি ভারতীয় যুবক একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় লণ্ডনে গিয়ে পেঁৗছোলো। সে মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট। সম্বল মাত্র ওয়াই. এম. সি. এ-এর পঞ্চাশ টাকার স্কলারশিপ। সে বিলেতে এসেছে ওষুধ তৈরির জ্ঞান অর্জন করতে। তার মা একদিন প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছিলেন। সেদিন সে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, বড়ো হয়ে সে রোগের ওষুধ নিয়ে গবেষণা করবে। দরিদ্র দেশ এই ভারতবর্ষ, এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক ওষুধ না পেয়ে মারা যায়। মৃত্যুর এই অভিশাপ থেকে দেশকে উদ্ধার করার মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে যুবকটি সাত সমুদ্র তের নদীর পারে এসেছে। সে ভর্তি হবে লণ্ডনের পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটে। তাই একদিন সে গিয়ে দেখা করলো ইন্‌স্টিটিউটের ডিরেক্টর মিঃ মাইকেল লরেন্সের সঙ্গে। সব শুনে তিনি বললেন: তা হয় না।

—আমি যে এই স্বপ্ন নিয়ে সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এসেছি।

—তা হোক্। এখানে বিখ্যাত সায়েন্টিস্টদেরই ভর্তি হওয়া কষ্টকর।

তুমি তো একজন অর্ডিনারি মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট। তুমি কি করে আশা করছো যে, আমি তোমাকে ভর্তি করে নেবো ?

কিন্তু ছেলেটি নাছোড়বান্দা। সে প্রতিদিন এসে একবার করে ধর্না দিতে লাগলো। কিন্তু মিঃ লরেন্সের সেই এক কথা : না, না, না।

অগত্যা ছেলেটি অন্যপথ ধরলো। সেই ইন্‌স্টিটিউটেই গবেষণা করতো ডিরেকটারের মেয়ে প্যাথলজিক্যাল রিসার্চার মিস্ লরেন্স। সে প্রতিদিন সকালে গেট দিয়ে ঢুকবার সময়, পাঁচটার পর বেরুবার সময় দেখতে পেতো বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে একটি যুবক—সর্ট ইন্ স্টেচার, ব্ল্যাক ইন্ কালার। ছেলেটি যেন কিছু বলতে চায়। মিস্ লরেন্স খুবই বিরক্ত, কারণ এরকমের উটকো উৎপাত সহ্য করবার মতো মানসিক অবস্থা তার তখন ছিলো না। সে ছিলো ইনস্টিটিউটেরই ক্লিনিক্যাল সায়েন্টিস্ট ডাঃ এস. ল্যাঁব্র্য-এর বাগদত্তা। আসন্ন বিবাহের স্বপ্নে তারা দুজনেই তখন মশগুল।

মিস্ লরেন্স একদিন রেগে গিয়ে গেটের কাছে থামলো। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো : কে তুমি ? কি চাও ?

—আমি একজন ইণ্ডিয়ান্ মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট। ইনস্টিটিউটে অ্যাড্-মিশান্ চাই।

—তা আমাকে রোজ উত্যক্ত করছো কেন ? ড্যাডির কাছে যাও।

—গিয়েছিলুম। কিন্তু তিনি বলেছেন, হবে না।

—তাহলে আমি কি করতে পারি ?

—আপনি একবার আমার হয়ে ডিরেক্টরকে অনুরোধ করুন।

মিস্ লরেন্সের ফিয়াঁসে তার প্রেমিকার সময়ের এমন অপব্যয় সহ্য করতে পারলো না। সে ঠোঁট বাঁকিয়ে মন্তব্য করলো : ন্যুইসেন্স। তুমি চলে এসো, হানি !

যুবকটির চোখে বোধহয় কী এক আশ্চর্য মায়া ছিলো। কিংবা কারুণ্য। মেয়েটি চলে যাওয়ার আগে বললো : আচ্ছা, দেখ্‌ছি।

যুবকটির তখন সাংঘাতিক অবস্থা। লণ্ডনে মাস ছয় কেটে গেছে। ওয়াই এম সি এ-র মাত্র পঞ্চাশ টাকা স্কলারশিপ, তাও বন্ধ হয়ে গেছে। ছাতু খেয়ে থাকতে হচ্ছে, কোনো কোনো দিন শুধু কলের জল। অথচ রোজ ঠিক দশটায় এসে সে গেটের পাশে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু মিস লরেন্সের দেখা নেই। শোনা গেলো, সে তার ফিয়াঁসেকে নিয়ে ফ্রান্সে বেড়াতে গেছে। যুবকটির চোখের আলো ধীরে ধীরে নিভে এলো। আর বুঝি কোনো উপায় নেই !

দিন তিনেক পরে মিস্ লরেন্স গেট দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছে, হঠাৎ গেটের পাশে চোখ গেলো। সেই যুবক দাঁড়িয়ে। মিস্ লরেন্স থম্‌কে দাঁড়ালো। হঠাৎ কী যেন তার মনে পড়লো। তারপর গট্‌গট্ করে চল্‌তে চল্‌তে একেবারে বাবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো।

—ড্যাডি, একটা কথা রাখবে ?

—আরে, পাগলী মেয়ে, বল্‌না কী কথা !

—একজন ইন্ডিয়ান্‌ মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটকে অ্যাড্‌মিশান দিতে হবে।

মিঃ মাইকেল লরেন্সের মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো। পেপার ওয়েটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন: তা হয় না। এমন অনুরোধ তুমি কোরো না। অ্যাড্‌মিশান রুলস অনুযায়ী ওকে নেওয়া যায় না।

—কেন ?

—ভর্তির জন্য রিসার্চ পেপার চাই।

—ও, তাই বুঝি !

মিস্‌ লরেন্স তখনকার মতো চলে এলো। কিন্তু সারাদিন তার দুশ্চিন্তার অন্ত রইলো না। সন্ধ্যের পরে সে চলে গেলো স্টাফ কলোনিতে। তাকে দেখে অবাক হয়ে ফিয়াঁসে বললো: কী গো পিউরিটান মেয়ে, হঠাৎ আমার ঘরে যে! কতবার বলেছি, কিন্তু তোমার মনতো সাড়া দেয়নি!

শোনো, তোমার কাছে কখনো কিছু চাইনি। আজ একটা আর্জি আছে।

—বলো, বর দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত।

- তোমার যে সমস্ত রিসার্চ পেপার তৈরি, অথচ আন্‌পাবলিশড্‌, তার মধ্য থেকে পাঁচটার স্বত্ব তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

ফিয়াঁসে হাস্‌লো। সে হাসিতে কোনো বেদনা নেই। প্রেমের জন্য সে ত্যাগস্বীকারে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

— অয়ি, করুণারূপিণী, তোমার প্রস্তাবে আমি সম্মত। আমিও আজ থেকে চাই সেই ইন্ডিয়ান্‌ ইয়ংম্যানটি মানুষ হোক্‌।

— কিন্তু তুমি কথা দাও, কখনো কারো কাছে এ-সব পেপার তোমার বলে দাবি করবে না।

- তথাস্তু।

সে উঠে গিয়ে অগুনতি কাগজ মিস্‌ লরেন্সের হাতে তুলে দিলো। আনন্দে যুবতী লরেন্স তার ফিয়াঁসেকে নিবেদন করলো জীবনের প্রথম চুম্বন।

পরের দিন সকাল দশটা। গেট থেকে একটু দূরে ভারতীয় যুবকটিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মিস্‌ লরেন্স কাগজগুলি তার হাতে তুলে দিলো। বললো: কাল দশটায় এগুলি নিজের পেপার বলে ড্যাডির কাছে সাবমিট করবে। কেমন ?

—আচ্ছা।

কৃতজ্ঞতায় যুবকটির মন ততক্ষণে ভরপুর। এর বেশি কথা তার মুখ দিয়ে বেরুলো না। সে সটান চলে গেলো নিজের ঘরে। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা ধরে

সেগুলি পড়লো। কিছু বুঝলো, কিছু বুঝলো না। পরের দিন ইনস্টিটিউট খুলতেই সে গিয়ে উপস্থিত হলো মিঃ মাইকেল লরেন্সের ঘরে। বললো : এই পেপারগুলি সাবমিট করলুম। আমাকে অ্যাড্‌মিশান দিন্।

চমকে গেলেন লরেন্স সাহেব। পেপারগুলি উল্টেপাল্টে দেখলেন। তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠলো। যেন কেউ তাঁকে অপমানিত করেছে।

—তুমি আমাকে ঠকাতে এসেছো ?

—যুবকটি নিরুত্তর।

—তুমি এ পেপারগুলো চুরি করেছো ?

—না।

তিনি কিছু কিছু প্রশ্ন করলেন। যুবকটি সাধ্যমতো উত্তর দিলো। কিন্তু মিঃ লরেন্স অনমনীয়।

—একাজ আমার ইনস্টিটিউটেই হয়েছে। পেপারগুলি কার আমি জানি। চুরির অপরাধে তোমাকে আমি পুলিশে দেবো।

তিনি ফোন তুললেন। কী ভাবলেন। তারপর বললেন : এখন যাও। রিসার্চ পেপারগুলি যার তাকে একবার জিজ্ঞেস করবো। তারপর তোমাকে নিশ্চিত হাজতে পাঠাবো।

যুবকটি বেরিয়ে এলো। ঠাণ্ডার দেশেও তার মুখ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে। চোখ ছলো ছলো।

করিডরে দেখা হয়ে গেলো মিস্ লরেন্সের সঙ্গে। বোধহয় কাছেপিঠেই অপেক্ষা করছিলো। যুবকটির মুখচোখের অবস্থা দেখে বুঝলো কিছু একটা হয়েছে। বললো : ড্যাডি অপমান করেছেন ?

—চুরির অপরাধে আমাকে পুলিশে দেবেন বলেছেন।

মিস্ লরেন্স পাঁচ মিনিট নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। দেখতে দেখতে মেয়েটির মুখের কয়েকটি রেখা কঠিন হয়ে উঠলো। তার নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো ঘন ঘন।

—তুমি আজ সন্ধ্যায় গীর্জার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঠিক সাতটায়।

যথাসময়ে অদূরে দেখা গেলো মিস্ লরেন্সকে। কাছে আসতেই যুবকটি বললো : আমাকে অপমান করার কাজ কি এখনো কিছু বাকি আছে ? কেন ডেকেছেন, বলুন ?

—গীর্জার ভেতরে চলো।

—কেন ?

—সাড়ে সাতটায় তোমার আমার বিয়ে হবে।

যুবকটি বজ্রাহত। ঠোঁট নিঃস্পন্দ। পা নিশ্চল। একী দুঃস্বপ্ন। সে কী করবে ? কিন্তু তার বাক্যস্ফূর্তি হলো না।

কখন মিস্ লরেন্স তাকে নিয়ে গিয়ে পাদ্রী সাহেবের সামনে দাঁড় করিয়েছে, টের পায়নি। তারপর যন্ত্রচালিতের মতো একের পর এক অনুষ্ঠানের কাজ করে গিয়েছে। তার খেয়াল হলো, যখন দুটি নরম ঠোঁটের স্পর্শ সে নিজের ঠোঁটে অনুভব করলো যুবকটির দু' চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো জল।

—তুমি এ কী করলে? তোমার ফিয়াঁসের কি হবে?

—তাকে ঈশ্বর রক্ষা করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে সে চলে গেলো পিতৃগৃহে। মিঃ লরেন্স তখন বিশ্রাম করছিলেন। অসময়ে মেয়েকে ঢুকতে দেখে বললেন: কী হয়েছে রে?

—তুমি তোমার সন্-ইন্-ল'কে জেলে দেবে বলেছো?

—সন্-ইন্-ল?

—আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমি ইণ্ডিয়ান মেডিকাল গ্র্যাজুয়েটকে বিয়ে করেছি, ড্যাডি।

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকালেন লরেন্স সাহেব। না, তাঁর কিছু করবার নেই। মেয়ে নিজেই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করে বসে আছে। বললেন: কিছু পরে এসো।

আধ ঘণ্টা পরে তিনি মেয়েকে ডেকে পাঠালেন। একটা কাগজ মেয়ের হাতে তুলে দিয়ে বললেন আমি জীবনে লেখাপড়ার ব্যাপারে কখনো কোনো অন্যায় করিনি। আজ শুধু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে করলুম।

শুরু হলো যুবকটির কাজ। স্ত্রী মাঝে মাঝে কাছে এসে দাঁড়ায়। হাতের কাজ বন্ধ রেখে যুবকটি তার মুখের দিকে তাকায়। বলে, আমার হাতে একবার হাত রাখো। মেয়েটি ঝংকার দিয়ে উঠে: না, এখন নয়। আগে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করো, তারপর আমাকে পাবে। বলে টেস্ট টিউবটা স্বামীর হাতে তুলে দেয়। কখনো কখনো তাড়া দেয়: আর কতো দেরি? দেশে ফিরতে হবে না? অসংখ্য রোগগ্রস্ত মানুষ যে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে?

দীর্ঘ চার বছর পর কাজ শেষ হলো যুবকের। এতদিন সে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে ছিলো। লণ্ডনের রাস্তা সে ভুলে গেছে। এবার দেশে ফেরার পালা। সস্ত্রীক গিয়ে দাঁড়ালো মিঃ মাইকেল লরেন্সের সামনে: গুরুদেব, আশীর্বাদ করুন, আপনার মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরবো।

—বেশ, আশীর্বাদ করছি। তোমার কাজে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। আমার আর কোনো বিবেকদংশন নেই। ঈশ্বরের অনুগ্রহে দুঃস্থ মানুষের সেবায় তোমাদের জীবন নিয়োজিত হোক্।

লণ্ডন থেকে ক্যালে। ক্যালে থেকে প্যারী। প্যারী থেকে আবার ব্রিন্দিসি। ব্রিন্দিসি বন্দর থেকে যখন জাহাজ ছাড়ছে তখন লরেন্সকন্যা দেখতে পেলো

উদ্‌ভ্রান্ত ভঙ্গিতে ছিন্ন বস্ত্রে জাহাজ ঘাটায় দাঁড়িয়ে আছে তার প্রাক্তন ফিয়াঁসে।

সেই বাসন্তীমরণের দিনে আমার মেমকাকীমার বয়স ছিলো আঠারো। সে কী আহ্বান না বিসর্জন! কী জানি! শুধু মনে মনে আজো বলি: ওগো বিদেশিনী কাকী আমার, তোমার আত্মাহুতির কথা চোদ্দ বছর বয়সে যখন প্রথম শুনেছিলুম, তখন তোমাকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছিলো আমার।

মেমকাকী মিস্ লরেন্স ওরফে লিণ্ডা ঘোষকে কলকাতায় গিয়ে দেখলুম ম্যাট্রিকের পরে। কিন্তু বাবুরবাজারে থাকতেই দেখেছিলুম মিস্ মেরী অণিমা বিশ্বাসকে। তাকে নিয়ে যে অবিশ্বাস্য নাটক, তা ঘটেছিলো আমার চোখের সামনেই বাবুরবাজারের ঘরোয়া জলসাঘরে।

এক সারদা আকন্দের বার্ধক্য চেতনায়, আগেই বলেছি, বিদ্যাসুন্দর সংস্কৃতির আলোকসম্পাত করেছিলেন। আর এক সারদা—সারদামোহন রায় – তার কাছে ধরা দিয়েছিলেন কর্মদুরস্ত কৃষ্টির ঝুলি কাঁধে নিয়ে। তিনি হিতকরী সভার বিহিত কাণ্ডে ছিলেন হাটুরে বস্ত্রধারী পরম পুরুষ। উচ্চরুচির শোভনশয্যার বদলে সমাজকল্যাণের শরশয্যায় তিনি পেতেছিলেন আমৃত্যু শয়ন। ঘরে ঘরে ঘুরে পান, সুপুরি, ধান, পাটের মুষ্টিভিক্ষায় তিনি খুলেছিলেন শিক্ষার নতুন মন্দির—বাবুরবাজার গার্লস্ স্কুল। তিরিশের দশকে। আমার দুই সহোদরা—হাসি ও খুশি—সেই প্রথম আমলের দুই ছাত্রী। চোধুরীকাকা ও কনকবৌদি তার আদিগঙ্গায় শিক্ষকতার হাল ধরেছিলেন।

মাঝে মাঝে আসতেন এক ফ্রক-পরিহিতা গাবদা-গোবদা শ্বেতাঙ্গিনী। তাঁর আসল লক্ষ্য ছিলো 'ঈশ্বর আমাদিগের সঙ্গে প্রেম করিলেন' এই তারণ-মন্ত্র প্রচার। তবে শিক্ষাবিস্তারের ভেক নিয়ে প্রথমে রোল কল করতেন-- মাখমবালা খর, বিজলী ডাস, অনীটা ডাট্ ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতিহাসের নামে শোনাতেন ট্রাফালগার যুদ্ধে নেলসনের বীর্যের রোমহর্ষক কাহিনী। তাঁর পড়ানোয় ইস্কুলের ইজ্জত বেড়েছিলো, সেকথা বলেছিলেন ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস গ্রেইজা সেইন। আলোকপ্রাপ্তা হয়ে গিরিজায়া সেন যে গ্রেইজা সেইনে রূপান্তরিতা হয়েছিলেন, তিনি স্বাধিকারবলেই শ্বেতাঙ্গিনীকে সার্টিফিকেট ইস্যু করে দিয়েছিলেন।

বছর দুই পরে এলেন আমাদের অণিমাদি। লম্বাটে গড়ন, মাজাঘষা রং, ছিমছাম সাজ, সাজানো দাঁতের নিঃশব্দ হাসি—সব মিলিয়ে দেখতে বেশ। নাচতে পারেন, গাইতে জানেন। বাংলায় কোনোমতেই হ্যাংলা নন, আর ইংরেজীতে দেখাতেন তুবড়িবাজি। দার্জিলিংয়ে মিশনারি স্কুলে মানুষ। পাঠক-পাঠিকা, গোস্তাকি যদি মাফ করেন, আমি হয়ে পড়েছিলুম

অষ্টাদশবর্ষীয়া অণিমাজলার কাছিম। দিদির আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করতুম, ফাই-ফরমাশ খাটতুম। আমার কসুর ধরবেন না, পুরোদস্তুর জামাকাপড়পরা মহিলা তার আগে আমি কমই দেখেছি।

মহকুমা শহরে যখন আমরা যেতুম তখন পথের পাশে সাহাপুরচণ্ডী গ্রামের খেরেস্তানদের পোড়াবাড়িটা দূর থেকে দেখতুম। হঠাৎ একদিন জঙ্গল সাফ হয়ে গেলো, ঘরদোর সাজানো গোছানো হলো। শুনলুম সেখানে বাস করতে এসেছেন কৈবর্তদুলাল ব্রজদুলালের কন্যা মিস্ মেরী অণিমা বিশ্বাস। তার নাকি পৈতৃক ভিটের জন্য মন কেমন করছিলো। তাই নয়নাভিরাম দার্জিলিঙ্গ ছেড়ে নির্ভয়ে চলে এসেছেন সাহাপুরচণ্ডীর শূন্য ভৃঙ্গারে।

আর দার্জিলিঙ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে এলেন ফাদার ডি'সুজা মহকুমা শহরে সেণ্ট পল্‌স স্কুলে। যুবতী মেরীকে তো আর একা ছেড়ে দেওয়া যায় না! তাতে মেরীমাতা ও তাঁর দিব্যনন্দনের সেবায় ত্রুটি ঘটবে। দীর্ঘ-দেহী গৌরবর্ণ ফ্রেঞ্চকাটদাড়িশোভিত চল্লিশোর্ধ ফাদারকে সাদা আলখাল্লায় পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক বলে মনে হতো আমার। তাঁকে দেখলে সম্ভ্রম জাগতো। তিনি অণিমাদির দেখাশুনো করতেন।

তারপর ঘটলো সেই অকল্পনীয় ঘটনা। টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট নিতে স্কুলে গিয়ে শুনলুম কাল রাত্রে বিষ খেয়ে সুসাইড করেছেন অণিমাদি। বিশ্বাস করুণ, খবরটা শুনে আমার চোখ দুটো শুকনো ছিলো না।

বেলা তিনটে বেজে গেলো রেজাল্ট পেতে। তারপর আমরা কয়েকজন ছুটলুম সাহাপুরচণ্ডীর উদ্দেশে। গিয়ে দেখলুম লোকে লোকারণ্য। লম্বু মহারাজও এসেছেন। পুলিশ আমার অণিমাদিকে উঠোনে শুইয়ে দিয়েছে। হাত পা নীল হয়ে গেছে, ফুলে উঠেছে শরীর। অস্বাভাবিক পুরুঠোঁটের ওপর ভন্‌ভন্ করছে কয়েকটা মাছি। আমার মনটা সর্বহারার মতো হাহাকার করে উঠলো। অণিমাদির অন্তিম যাত্রা আসন্ন। পুলিশ ওকে ময়না তদন্তের জন্য শহরে নিয়ে যাবে।

এমন সময় সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে এলেন ফাদার ডি'সুজা। পুলিশকে বললেন: থামো। পোস্ট মর্টেমের প্রয়োজন নেই। মেরীকে এখানেই গোর দেওয়া হোক্।

দারোগাবাবু বললেন: পুলিশকে তার কর্তব্য করতে দিন্। বাধা দেবেন না।

ঠা-ঠা রোদের মতো হা-হা করে হেসে উঠলেন ফাদার: পোস্ট মর্টেম করবেন কী করতে? খুনী ধরতে তো? কোন্ বিষে মেরী মরলো, তা খুঁজে বার করতে তো?

ফাদার বল্‌ছিলেন ইংরেজীতে। আমার আকন্দদাসী ইংরেজী-জ্ঞান নিয়ে যতটা বুঝেছিলুম ততটাই বল্‌ছি।

দারোগাবাবু বললেন : হ্যাঁ।

শেষ বিকেলের পড়ন্ত রোদের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে ফাদার বললেন : আমি কনফেস করছি, আমিই মেরীকে খুন করেছি। কাল রাত্রিতে এসেছিলুম, ডিনারের সঙ্গে মিশিয়ে রেখে গিয়েছিলুম আর্সেনিক। প্লীজ অ্যারেস্ট মী।

অকস্মাৎ বজ্রপাত!

দারোগাবাবু হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : কেন খুন করলেন?

ফাদার রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। তারপর বললেন : এক উইক আগে এসেছিলুম। মেরী তখন বাড়ী ছিলো না। দেখলুম ওর বিছানার উপরে পড়ে আছে একটা বেঙ্গলী নভেল। তার ভেতরে এক টুকরো কাগজ। পড়ে আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো—Deokinandan,

Blow gently over my garden
Wind of the southern sea
In the hour of my love cometh
And calleth me.

পুলিশের জেরা কেন আপনার রাগ হলো?

—রাগ হবে না? আমি খুঁজছি মেরীনন্দন আর ও খুঁজছে ক্লাশমেট দেওকীনন্দন! ওকে নান করার স্বপ্ন দেখছি আমি, ও স্বপ্ন দেখছে ঘর বাঁধার।

ফাদার আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন চিরশায়িতা অণিমাদির শিয়রের কাছে। মাথা নিচু করে ক্রশ করলেন। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট্ট বই বার করলেন। ধীরে ধীরে পড়লেন :

Unto thee will I cry. O Lord my rock;
be not silent to me: lest, if thou be
silent to me, I become like them that
go down into pit.

একটু নীরবে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন। আবার পড়তে শুরু করলেন :

Plead my cause. O Lord, with them
that strive with me; fight against them
that fight against me. Take hold of
shield and buckler; and stand
up for mine help.

লম্বু মহারাজকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলুম বইটার নাম 'বুক অব সামস'। তিনি মোটামুটি মানে বুঝিয়ে দিলেন। ততক্ষণে পুলিশ ফাদারকে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে।

ওদিকে ঘরের পাশে মাটি খোঁড়া হচ্ছে। আমি অনুভব করলুম আসলে খোঁড়া হচ্ছে আমার মনের মাটি। আমি আর দাঁড়ালুম না। ফেরার আগে শুনে এলুম মৃত্যুর আগে সব বুঝতে পেরেছিলেন অণিমাদি। কাঁপা-কাঁপা হাতে লিখে রেখে গেছেন একটা চিরকুট : আমার মৃত্যুর ন্য আর কেউ দায়ী নয়। দায়ী শুধু আমার আঠারো বছর বয়স।

এর পরের ঘটনা ইচ্ছে করলে রটনা বলে ধরে নি পারেন। কারণ যা রটে তা সত্যও বটে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, অগাধ জলে সাঁতার। তার নায়ক খুদে হাঁস আকন্দদাস। সাঁতার আমি জানতুম না। ডুবে ডুবে জল খাওয়াও রপ্ত করতে পারিনি। কিন্তু আমার সমবয়সী অনেকে এই ব্যান ও বন্যায় ছিলেন পরমহংস। দেহে তাদের নতুন বায়ুর প্রকোপ ও জলোচ্ছ্বাসের ধোপ শুরু হয়েছিলো কৈশোরের উপান্ত থেকেই। কিন্তু আকন্দদাস 'গহীন গাঙে ডুইব্যা মরার' কায়দা কানুন জানতো না—সে ছিলো সেকালের বালবিধবাদের মতোই হাবাগোবা। কী, পাঠক, অবিশ্বাস করছেন? করলে কী করতে পারি? আকৈশোর লাব্‌ড়া যে খেয়েছে, সে কাবাব খাওয়ার রসনা পাবে কোথায়! তবু অসঙ্কোচে কবুলিয়ত লিখে দিচ্ছি, আমার কাছেও কমকন্যারা আসতেন—তবে বাস্তবিনীর বেশে নয়, স্বপ্নধনীর বেশে। যেন নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল-খসা। আমি মনে মনে তাদের নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, তাদের উষ্ণ সান্নিধ্য উপভোগ করেছি। ভেবেছি মানুষ হয়ে যদি গিনির সুখ পাই, তবে স্বপ্নধনীর মুখ একদিন দেখবোই!

ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। এবার আমি যাবো ভাবী ভর্ত্রী কলকাতার সঙ্গে সপ্তপদী করতে। এমন সময় আমার চোখ উঠলো। যাকে হালের ভাষায় বলে কন্‌জাংটিভাইটিস্‌। অসহ্য যন্ত্রণা! স্বস্তি পাচ্ছি না কোথাও।

বরুণের সঙ্গে দেখা হলো। ও বললো: হ্যাঁরে হাঁদারাম, চোখে হাত দিয়ে বেড়াচ্ছিস্‌ কেন? এবার কী কানা বানরসৈন্যের পার্ট নিবি?

আমি নিরুপায় ভঙ্গিতে বল্‌লুম: বাজে বকছিস্‌, কেন? চোখ উঠেছে। কী করি, বল্‌তো?

—বুকের দুধ দে। একদম সেরে যাবে।

মনে পড়লো অনেক দিন আগে আর একবার আমার চোখ উঠেছিলো। তখন ছোট বোন বুলুর বয়স মাস আষ্টেক। মা ফোঁটা ফোঁটা বুকের দুধ দিয়ে চোখ সারিয়ে দিয়েছিলেন। এখন বোনের বয়স নয়। এখন ও মায়ের বুকের দুধ খায় না। তবে কার কাছে যাই? বৌদিদির মহলে?

সেকথা বরুণকে বলতেই ও হেসে কুট্‌পাট্‌। হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে চৌধুরীদের গোয়াল ঘরে নিয়ে গেলো। তখন ধলী গাইয়ের বাচ্চাটা বাঁটে মুখ ধাম্‌সাচ্ছে।

—এর মানে কি, বল?

—বাছুরটা দুধ খাচ্ছে।

বরুণ এগিয়ে গিয়ে কালী গাইয়ের বাঁট ধরে টানাটানি করলো খানিকক্ষণ। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো : কী বুঝলি ?

—এর মানে বাঁটে দুধ নেই।

—আর কিছু ?

আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলুম। আকাশ পাতাল ভেবেও কিছু হদিশ পেলুম না।

বরুণ তার নিজস্ব মাপের একটা চড় কষিয়ে আমার চিবুক নেড়ে বললো : খোকাবাবু, ডুডু খাবে ? শুনে রাখ্, এর মানে হচ্ছে বাচ্চা না হলে বাঁটে দুধ আসে না। বাচ্চা বড়ো হয়ে গেলেও দুধ চলে যায়।

আমার ছোট ভাইয়ের শক্ ট্রিটমেন্ট ও বাক্যবল্লমে আমার সমুচিত জ্ঞানোদয় হলো। বুঝলুম আমার চোখের চিকিৎসা আর যে মহলেই চলুক, নতুন বৌদিদের মহলে চল্‌বে না।

বরুণ রণজয়ী ভঙ্গিতে চল্‌তে চল্‌তে বললো : বিনে পয়সায় অনেক জ্ঞান দিলুম। কিন্তু আমার শিঞ্জিনীর দিকে দৃষ্টি দিলে হনুমান, তোর হনু উড়িয়ে দেবো।

আমি চলে এলুম নতুন বিয়ের বৌ সেজবৌদির ঘরে। ড্রেসিং টেবিলে পাউডারের কৌটো খুলে পাফ্‌টা তুলে নিয়ে চোখের ওপর বুলাতে লাগলুম। পেছন থেকে ছোড়দি খেঁকিয়ে উঠলো : চোখের ওপর পাফ্ বুলোচ্ছিস্। বাড়িসুদ্ধ লোকের চোখ না উঠিয়ে ছাড়বি না দেখ্‌ছি।

অতএব পাফের আরাম উবে গেলো ফোমের মতো।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। চৌধুরীদের আছে সারি সারি কবুতরের খোপ। তাতে দেখেছি কয়েকটা নতুন বাচ্চা হয়েছে। চলে গেলুম খোপের সারিতে। খুঁজে খুঁজে বার করলুম একটা ছোট্ট সাদা লোমওয়ালা পায়রার বাচ্চা। চোখে বুলিয়ে চললুম। আঃ, কী আরাম !

—কী করছিস্ রে, আকন্দ ?

তাকিয়ে দেখি আঠারো বসন্তের শিঞ্জিনী।

—চোখ উঠেছে। পায়রার নরম লোম বুলিয়ে আরাম খাচ্ছি। বুকের দুধ পাবো কোথায়, বল !

তাকিয়ে দেখি ওর মুখটা একটু লাল হয়ে উঠেছে। আমি ভাবলুম, রোদে তেতেপুড়ে এসেছে, তাই। আমি আবার পায়রালোমের পাফ বুলোতে শুরু করলুম।

—আহা রে, খোকাবাবুর কী কষ্ট ! বুকের দুধ পাচ্ছে না !

বলে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। তাকিয়ে দেখি, ওর গ্রীবার ভঙ্গিতে ও টানা টানা চোখের ঝিলিকে একটা তেজী ঘোটকীর চাল।

আমার কেমন সন্দেহ হলো। বরুণের সঙ্গে বোধহয় ওর দেখা হয়েছে। দু'জনের ভাষায় কোথায় যেন মিল! বুঝি বুঝি করেও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না।

আমি আবার তাকালুম শিঞ্জিনীর দিকে। ও দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ও মাঝে মাঝেই আসে যায়, কিন্তু এমন অদ্ভুত ঘাড়-বাঁকানো ঠাট আর কখনো দেখিনি।

--চল্, আমার সঙ্গে। কচি নাল্‌তে পাতা বুলিয়ে দিলে আরাম পাবি। শুনেছি ওতে অনেকের সেরেও গেছে।

আমার চোখের তখন এমন অবস্থা যে, সমুদ্রে ডুবতে বল্‌লেও রাজি আছি।

শিঞ্জিনীর পেছনে পেছনে চললুম। ওর চলার ভঙ্গির মধ্যে কোনো তাড়া নেই। হেলতে দুলতে যাচ্ছে! গাছের পাতা ছিঁড়ছে, লাফিয়ে গাবের নিচু ডাল থেকে গাব পাড়ছে। তারপর ছুঁড়ে মারছে শেওড়া বনে।

কলা গাছের ঝাড়ের সামনে থমকে দাঁড়ালো। মোচড় দিয়ে ছিঁড়ে নিলো একটা লম্বা কচিপাতা। তারপর পাতাটা হাওয়ায় দোলাতে দোলাতে পেরিয়ে গেলো খিড়কি পুকুরের পশ্চিম পাড়ের সুপুরি বাগান।

আমি পেছনে যেতে যেতে দেখলুম শিঞ্জিনী পরেছে ময়নামতীর ডুরে শাড়ি। চিরাগের মতো লালে লাল। ও শহুরে মেয়ে হলেও আজ গাঁয়ের মেয়েদের মতো গায়ে জামা পরেনি। দোম পিঠে মসৃণ কচি ঘাসের রং। ওর মধ্যে আজ যেন দেখতে পাচ্ছি এক ক্রীড়াময়ী মরালীকে।

দিগন্তপ্রসারী পাটখেত। মাঝে মাঝে আল। কচি কচি নাল্‌তে পাতা হাওয়ায় দুলছে একটু একটু। চাষ যেখানে ঘন হয়ে এসেছে সেখানে আল ধরলো শিঞ্জিনী। বেশ খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। কলাপাতাটা বিছিয়ে দিলে আলের ওপর। ছিঁড়তে শুরু করলো নাল্‌তে পাতার গুচ্ছ। ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিলো কলাপাতার ওপর। তারপর হাতে জড়ো করলো এক আঁটি ডাঁটাসহ পাতা। তারপর সেগুলি দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বল্‌লো: শুয়ে পড়্।

আলে থাকে জাত-কেউটে। কিন্তু আজ চোখের ব্যথায় সেই ভয়ের কথা মনে পড়লো না। পাতা-বিছানো কলাপাতার ওপর শুয়ে পড়লুম। চোখ বুজে অপেক্ষা করছি কচি পাতার নরম-নরম স্পর্শের জন্য।

শিঞ্জিনী আমার ওপর উপুড় হয়ে বাঁ-হাতে শরীরের ভার ঠেকিয়ে রাখলো। তারপর ডান হাতে আমার বন্ধ চোখের ওপর নরম পত্রগুচ্ছ বুলোতে লাগলো। আরাম! কী আরাম!

কতক্ষণ পত্রব্যজন চলেছিলো খেয়াল করিনি। আরামের ধারাস্নানে সিক্ত হয়ে চলেছি আমি। হঠাৎ অনুভব করলুম, শিঞ্জিনী দুহাতে আমাকে জড়িয়ে

ধরেছে। আমার কপালে কপোলে চিবুকে গ্রীবায় কাঁচ আমের দুটি ফালির আস্বাদ। দুটি ছোট্ট পশম-নরম কপোত ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার সারা শরীরে।

হঠাৎ মনে হলো আলের অজানা কিনারা থেকে উঠে এসে একটা জাত-কেউটে আমাকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরেছে। আর রক্ষে নেই। আমি শিউরে উঠলুম। দুহাতে সজোরে বিস্রস্তবসনা শিঞ্জিনীকে সরিয়ে দিয়ে আমি প্রাণপণে ছুটতে লাগলুম—যেন তাড়া করছে এক কালনাগিনী!

পেছনে শুনলুম ক্ষুব্ধ কণ্ঠের ব্যঙ্গধ্বনি: ভীরু! ভীরু! ভীরু!

সামনের দিকে তাকিয়ে মনে হলো সেই অপরাহ্ণে এক অজানা রাজপুরীর সিংহদ্বার আমার সামনে খুলে গেছে। তাতে জ্বলছে হাজার ঝাড়লণ্ঠন।

বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকাকে বলতে হবে না, সেইদিন—

পদার্পণ করিলাম প্রথম যৌবনে।

●●

আজকের বিপন্ন ও বিষণ্ণ সময়ের সন্তান নয় আকন্দদাস। সে কোনো বিচ্ছিন্নতাবোধের শাবক ছিলো না তার বাল্য ও কৈশোরের নানা রঙের দিন-গুলিতে। চার-পাঁচ দশক আগে, যখন জীবন ছিলো দ্রৌপদীর শাড়ির মতোই লাঞ্ছনাসহ ও আশ্বাসবহ এবং মানুষ ছিলো ভালো-মন্দের মোটা দাগের চিত্রকল্প তখনকার এক বালককিশোরের দিনযাপনের বিবরণ মৌমাছিতন্ত্র—আকন্দদাসের কড়চার প্রথম ভাগ।

ছ'মাসের আকন্দদাসকে তেল মাখিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছিলো পশ্চিমের ঘরের দাওয়ায় শীতের রোদে। সেই ঘরের চালে ছিলো একটা মৌচাক। তাতে ঢিল ছুঁড়ে মেরেছিলো কোনো মধুরসিক আত্মীয়পুত্র। আক্রান্ত মৌমাছির দল শিশুকে অরক্ষিত পেয়ে হুল ফুটিয়ে তার আপাদমস্তক ফুলিয়ে দিয়েছিলো। তার চেহারা গিয়েছিলো বদলে। তেমনি আকন্দদাস নামক একটি ধোয়ামোছা শিশুকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেছিলেন সৃষ্টিরসিক ভগবান। তারপর তাকে ক্রমাগত হুল ফুটিয়ে চলেছে মাটি মানুষ আকাশ বাতাস। জীবনতন্ত্রের নানা চক্রান্ত ও বুদ্ধিমন্ত্রের বিচিত্র সিদ্ধান্ত তার দেহমনের আদল দিচ্ছে ক্রমাগত বদলে। সেই পালাবদলের পয়লা বৃত্তান্ত এই আকন্দদাসের কড়চা—মৌমাছিতন্ত্র।

না, আর প্রথম পুরুষে নয়, এবার উত্তম পুরুষে বলি। শুধু কি হুলের যন্ত্রণা পেয়েছি জীবনভর—তার আদি অধ্যায়ে? মধু কি আহরণ করিনি একটুও? আমার ছেলেবেলার পৃথিবী ছিলো শাদাকালো নকশাকাটা মেঘনা ডাকাতিয়ার হাঁসুলিবাঁক। নারকেল-সুপুরি গাব-হিজল নালুতে-কলমীর সবুজ সমারোহে ছিলো আমার জীবনের আশ্বাস। গাছভরা কদমকুঁড়ি ও মাঠভরা সোনাধান মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে দিতো বাতাসে। এই নাট্যমঞ্চে দেখেছি অনেক মানুষের আনাগোনা। কারো গায়ে পশুর রোঁয়া, কারো গায়ে আল্লার দোয়া। আমার দুনিয়াদারিতে ভুখার ভোগানি থেকে কালনাগিনীর শিঞ্জিনীধ্বনি পর্যন্ত কত স্তর পেরিয়ে এসেছি অন্যলগ্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। দুঃখ ছিলো অনেক, কিন্তু তার চেয়ে কম ছিলো না সহজ সরল সুখ। তাই ম্যাট্রিক পাশের আট বছর পরে ফেলে-আসা দিনের মধুস্মৃতি ধরে রেখেছিলুম একটি কবিতায়—

থেকে থেকে ফিরে যাই গভীর
প্রাণের স্রোতে। কলকণ্ঠ হংসমালা
সফেন ঢেউয়ের মতো ভোরে
পুকুরের ঘাটে এসে নামে, বিরল বসতি
গ্রামে। উজ্জ্বল স্নেহের বৃত্তে
কৃষ্ণকায় শিশু কারো চঞ্চল
উদ্দাম; হরিৎ তিসির মাঠ, একাগ্র তপস্বী
বক; প্রচুর শালের বন রৌদ্রবিদ্ধ
পাতার আড়ালে ছায়াস্পর্শ রাখে।
লুণ্ঠিত জ্যোৎস্নার রাতে অকস্মাৎ
তোমার বিহ্বল মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস।

সংগ্রামের সূচনায় এ-প্রাণ
স্মরণীয়॥

—::—